ফিয়েস্তা'। তার মানে আকারে আমাদের দেশের 'স্ট্যাণ্ডার্ড-টেন'। এই আয়তনের গাড়িতে এদেশে পাঁচজনের বেশি চড়তে পারে না। এবং জর্মন পুলিশের হিসেবে শঙ্করের শিশুপুত্র অমৃত একজন পূর্ণ-যাত্রী। তাই অহীনকে বন্ ফেলে রেখে আমাকে রওনা হতে হল বাভেরিয়ার পথে।

অহীন আজ এখানে থাকবে। আগামীকাল সে পারি রওনা হবে। সেখানে কয়েকদিন থেকে চলে যাবে লণ্ডন।

সবার শেষে অহীনের সঙ্গে করমর্দন করে উঠে আসি গাড়িতে। আজও শঙ্কর গাড়ি চালাবে। আমি তার পাশে বসি। জয়া ও অমৃতের সঙ্গে গৌর ম্যাপ হাতে নিয়ে পেছনে বসেছে। সে আমাদের 'নেভিগেটর'। য়ুরোপে রাস্তার সংখ্যা বেশি বলে দূর যাত্রায় সর্বদা ম্যাপ খুলে গাড়ি চালাতে হয়। কিন্তু চালকের পক্ষে ম্যাপ খুলে খুলে পথ দেখে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই আরেকজনকে ম্যাপ দেখে পথ বলে দিতে হয়। গৌর এখন সেই কাজটি করবে।

গাড়ির ইঞ্জিন গর্জে ওঠে। আমরা চলতে শুরু করি, ওরা দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা হাত নাড়ে, আমরা হাত নাড়ি। জানি না বাপি এখনো 'পাখি পাখি' বলে চলেছে কিনা?

আজ আর শঙ্কর পথ ভুল করে না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা বন্ শহর ছাড়িয়ে আসি। গাড়ি এগিয়ে চলে দক্ষিণ-পূর্বে, কোব্লেঞ্জ শহরের দিকে।

পথের দু-পাশেই সবুজ জর্মনী। দিগন্ত প্রসারী ক্ষেত। এক দিকে ক্ষেতের মাঝে য়ুরোপের প্রাণধারা রাইন। তারপরে ধূসর পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রেখা, যেখানে দিগন্ত এসে পাহাড়ে মিশেছে। আরেকদিকে ক্ষেত, শুধুই সবুজ ক্ষেত।

কে বলবে, আমরা শিল্প-সমৃদ্ধ পশ্চিম-জর্মনীর ভেতর দিয়ে চলেছি। কল-কারখানা গড়তে গিয়ে এরা কৃষিসম্পদ কিম্বা বন-সম্পদকে অবহেলা করে নি। নষ্ট করে নি প্রাকৃতিক পরিবেশ।

সহসা শঙ্কর অন্য কথা বলে—এটা কিন্তু অটোবান নয়, ন্যাশনাল

বেলজিয়াম থেকে বাভেরিয়া

দে'জ পাবলিশিং॥ কলিকাতা-৭০০০৭৩

BELGIUM THEKEY BAVARIA
A Bengali Travelogue

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৫৯

প্রকাশক
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট
সামনে—ব্রাসেলস এবং আইবজে হ্রদ ও সুগিম্পিৎসে শিখর
পেছনে—মোজেলের তীরে ভাইনস্ট্রাসে ও বেথোফেনের বাড়ির সামনে লেখক,
আলপ্‌স এবং রাইন ও মোজেলের সঙ্গম, কোবলেঞ্জ

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য আলোকচিত্র
গৌরাঙ্গ বসুরায়
শঙ্কর রায়
ও
জয়া রায়

মুদ্রাকর
বিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

বেলজিয়াম থেকে বাভেরিয়া

শৈশবস্মৃতি সারা জীবনের সঙ্গী। সে সতত সুখ-সঞ্চারী।

সব স্মৃতি হয়তো নয়। কিন্তু কিছু শৈশবস্মৃতি আজও আমার প্রাণে পরমসুখের পরশ দেয় বুলিয়ে, বিস্মৃত অতীতকে নিয়ে আসে চোখের সামনে।

ঘটনার বিচারে এদের অনেকেই হয়তো এমন কিছু অসাধারণ নয়। এদের চেয়ে বহু বড়-বড় ঘটনা বেমালুম ভুলে বসে আছি। কেন এমন হয়?

জানি না। কেবল জানি, কিছু শৈশবস্মৃতি আজও আমার সঙ্গী হয়ে আমার সঙ্গে জীবনের পথ পরিক্রমা করে চলেছে।

সেদিন কথায় কথায় ডাক্তার সেন আমাকে তেমনি একটি শৈশবস্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—আবার যখন জর্মনী যাচ্ছেন, ব্ল্যাক-ফরেস্ট বেরিয়ে আসবেন।

—ব্ল্যাক-ফরেস্ট!

—হ্যাঁ। দক্ষিণ-পশ্চিম জর্মনীর রাইন উপত্যকা ও বাভেরিয়া সংলগ্ন বনাঞ্চল।

—বাভেরিয়া!

ডাক্তার সেন মাথা নেড়েছেন। এবং সেই সঙ্গে আমার মনের শৈশবস্মৃতিটি সজাগ হয়ে উঠেছে। মনে পড়েছে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। পূর্ববঙ্গের এক মফস্বল শহরে সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছি। লেখার জন্য পাড়ার মুদি দোকানে যে কাঠ-পেন্সিল পাওয়া যেত, তার গায়ে লেখা থাকত 'Made in Bavaria.'

বাভেরিয়া কোথায়, তা তখনও জানতাম না। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবাব কিছুদিন পরে যখন সে পেন্সিল আর পাওয়া গেল না, তখন একদিন দাদুকে কারণ জিজ্ঞেস করলাম। দাদু বললেন—বাভেরিয়া জর্মনীতে। জর্মনীর সঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধ বেঁধেছে।

তাই সে পেন্সিল এখন পাওয়া যাবে না আমাদের দেশে।

যুদ্ধের সঙ্গে পেন্সিলের কি সম্পর্ক, সেকথা সেদিন জানতে চেয়েছিলাম কিনা মনে নেই আমার। কেবল মনে আছে 'মেড ইন বাভেরিয়া' পেন্সিলের কথা।

অগ্রজপ্রতিম বন্ধু ও হিমালয়সাথী ডাক্তার অমিতাভ সেন তাই সেদিন যখন বাভেরিয়ার নাম করলেন, তখন শৈশবস্মৃতিটি সজাগ হয়ে উঠল, সেই পেন্সিলের দেশ দেখাব বড়ই বাসনা হল। বার্লিন-প্রবাসী অনুজপ্রতিম বন্ধু গৌরাঙ্গ বসু রায়-কে চিঠি লিখলাম—আমি ব্ল্যাক-ফরেস্ট ও বাভেরিয়া দেখতে চাই।

ব্যাস, গৌর একেবারে রাজসিক ব্যবস্থা করে ফেলেছে। আর সেকথা আমি য়ুরোপে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দিয়েছে।

এবারে আমি প্রায় মাসখানেক হল য়ুরোপে এসেছি। এতদিন ফ্রান্সের স্ত্রাসবুর্গে আমার ফরাসী বোন গাব্রিয়েল রিফস্তালের কাছে ছিলাম। *সেখানেই গৌর ফোনে আমাকে ব্ল্যাক-ফরেস্ট ও বাভেরিয়া ভ্রমণের রাজসিক ভ্রমণসূচী জানিয়েছে। সেই অনুযায়ী পরশু বিকেলে আমি স্ত্রাসবুর্গ থেকে পশ্চিম-জর্মনীর রাজধানী এই 'বন' শহরে এসেছি। উঠেছি তৃণাদির বাড়িতে। ডঃ মিসেস তৃণা পুরোহিত রায়, স্থানীয় টেগোর ইন্‌স্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা ও ভারত-জর্মন সাংস্কৃতিক মিলনের পথিকৃৎ। দু'বছর আগে য়ুরোপ ভ্রমণের সময়ও আমি কয়েকদিন কাটিয়ে গিয়েছি এখানে।

গতকাল গৌরের গাড়ি নিয়ে আমার আরেক বন্ধু শঙ্কর রায় বার্লিন থেকে বন্‌ এসেছে। শঙ্কর প্রায় বিশ বছর বার্লিনে বাস করছে। সে চমৎকার জর্মন বলতে পারে। শঙ্করের সঙ্গে এসেছে তার স্ত্রী জয়া এবং ছ'বছরের ছেলে অমৃত। ওরাও আমাদের সঙ্গে ব্ল্যাক-ফরেস্ট ও বাভেরিয়া বেড়াতে যাবে।

গতকাল আমার আরেকজন বন্ধুও বন্‌ এসেছে। ডায়মণ্ডহারবার

* লেখকের 'এক ফরাসী নগরে' দ্রষ্টব্য।

ফকিরচাঁদ কলেজে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ডঃ অহীন মণ্ডল। অহীন আমার ছোট ভাইয়ের মতো। তাই য়ুরোপ বেড়াতে আসছে শুনে আমি ওকে বন্ আসতে বলে এসেছিলাম। সেইমত রোম ভ্রমণ শেষ করেই সে বন্ চলে এসেছে। সেও তৃণাদির বাড়িতেই উঠেছে। কলকাতা থেকে···আর শুধু কলকাতাই বা বলি কেন, শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত যেসব ভারতীয় বন্ আসেন, তাঁদের অধিকাংশকেই তৃণাদির আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়। অথচ ভদ্রমহিলা তাঁর রুগ্ন পুত্রকে নিয়ে একা এখানে থাকেন। এদেশে কাজের লোক পাওয়া যায় না। রান্না থেকে ছেলের সেবা পর্যন্ত সবই তাঁকে একা করতে হয়। তার ওপরে রয়েছে ইন্স্টিটিউটের যাবতীয় কাজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী কাজকর্ম। অথচ তাঁর এখন বয়স হয়েছে পাঁচের ঘরে তো বটেই। কিন্তু কাঁর সম্পর্কে এসব কথা লেখা। গতবারে তো তিনি লণ্ডন ও বার্লিনে ফোন করে প্রায় জোর করেই আমাকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছিলেন। আর আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য কম করেও ডজনখানেক লোককে নেমন্তন্ন করেছিলেন।

কিন্তু এখন তৃণাদির কথা থাক, অহীনের কথায় ফিরে আসা যাক। অহীনের সম্মানে শঙ্কর এখন আমাদের ব্রাসেলস ও লুক্সেমবুর্গ বেড়াতে নিয়ে চলেছে। আমি ও অহীন কলকাতা থেকে বেনেলুক্স ভিসা নিয়ে এসেছি শুনেই শঙ্কর এই বাড়তি ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছে। ওরা ভারতীয় হলেও পশ্চিম-জর্মনীর অধিবাসী। পশ্চিম-য়ুরোপের কোন দেশে বেড়াতে যাবার জন্য ওদের ভিসার প্রয়োজন নেই।

শুনেছি, ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে আর দেখেছি, বাঙালী বিলেতে বাস করেও টক ঝাল চচ্চড়ি খায়। এবং প্রচুর লেখাপড়া ও গানবাজনা জেনে আর স্থায়ীভাবে জর্মনীতে বসবাস করেও তৃণাদি এর ব্যতিক্রম নন। নিজে অত্যন্ত স্বল্পাহারী হয়েও, তিনি রাঁধতে এবং খাওয়াতে খুবই ভালোবাসেন। ফলে কিছুতেই বেলা

সাড়ে এগারোটার আগে আমরা বাড়ি থেকে বের হতে পারলাম না।

শঙ্কর গাড়ি চালাচ্ছে, আমি তার পাশে। পেছনে জয়া অমৃত আর অহীন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা পেট্রোল পাম্পে এলাম। তেল নেওয়া হল, বিশ লিটার। দাম আঠাশ মার্ক। শস্তা বলতে হবে। কারণ আমাদের দেশে পশ্চিম-জর্মন মার্কের দাম যাই হোক, এদেশে মার্কের মূল্য একটাকা।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বন্ ছাড়িয়ে এলাম। কোলন (Cologne) শহরকে বাঁয়ে রেখে আমাদের গাড়ি বেলজিয়াম সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। বন্ রাজধানী হলেও এখানে কোন বিমানবন্দর নেই। বনের বিমান বন্দর এই কোলনে। গতবারে আমি বার্লিন থেকে বিমানে কোলন এসেছিলাম। আগামীকাল গৌর-ও তাই আসবে। কোলন বড় শহর এবং 'ও্য-দ্য-কোলন'-য়ের (কোলনের জল) দৌলতে বহুকাল ধরে বিশ্ববিখ্যাত।

তৃণাদির বাড়ি থেকে রওনা হবার সওয়া একঘণ্টা পরে অর্থাৎ বেলা পৌনে একটার সময় আমরা জর্মন সীমান্তে এলাম। এ জায়গাটার নাম আখেন (Aachen)।

কাস্টমস চেক-পোস্টের সামনে এসে গাড়ি থামালো শঙ্কর। জানলা খুলে হাত বাড়িয়ে পাসপোর্টগুলো অফিসারের হাতে দিল। একবার দেখে নিয়ে আমার ও অহীনের পাসপোর্টে দুটি ছাপ মেরে তিনি সবগুলো শঙ্করকে ফেরৎ দিলেন। ভদ্রলোককে ডাংক (ধন্যবাদ) দিয়ে শঙ্কর গাড়ি ছেড়ে দিল।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে "নো-ম্যান্'স ল্যাণ্ড" পেরিয়ে আমরা বেলজিয়াম সীমান্তে এলাম। না, এবারেও গাড়ি থেকে নামতে হল না। একজন অফিসার এসে গাড়ির পাশে দাঁড়ালেন। শঙ্কর পাসপোর্টগুলো তাঁর হাতে দিল। তেমনি একবার দেখে নিয়ে তিনি ওদের পাসপোর্ট ফেরৎ দিয়ে আমাদের দুখানি নিয়ে অফিসে চলে গেলেন।

এই রে সেরেছে! না জানি, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে!

তারপরে বোধকরি খানাতল্লাসী। সঙ্গে অবশ্য আমাদের কোন মালপত্র নেই। তাহলেও কিছু হাঙ্গামা পোহাতে হবে বৈকি।

না। আমার সকল আশঙ্কা মিথ্যে হল। মাত্র মিনিটপাঁচেক পরেই ভদ্রলোক ফিরে এলেন। আমাব ও অহীনের পাসপোর্ট ফেরৎ দিয়ে তিনি আমাদের ধন্যবাদ দিলেন। তারপরে হাত নেড়ে সহাস্যে বলে উঠলেন—ম্যের্সি বোকু (অনেক ধন্যবাদ) মসিয়র। বোঁভ্যন্যু অঁ বেলজিক্ (বেলজিয়ামে স্বাগত)।

গেট খুলে গেল। শঙ্কর গাড়ি ছেড়ে দিল। আমরা বেলজিয়ামে প্রবেশ করলাম। আশ্চর্য! কেউ কোন প্রশ্ন করল না, তল্লাসী হল না, ঘুষ লাগল না। মনে পড়ছে বেনাপোল-দর্শনা সীমান্তের কথা। দক্ষিণা না দিয়ে সেখানে সীমান্ত অতিক্রম করা অসম্ভব। গায়ে ভাল জামা থাকলে সেটা পর্যন্ত খুলে নিতে চায়। সমস্ত রকম বৈধ কাগজপত্র সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও চূড়ান্ত হয়রান করা হয়। পর্যটকেরা নাকাল হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। অথচ দেশটি তাঁদের অনেকেবই জননী জন্মভূমি।

কিন্তু থাকগে, বিদেশে বেড়াতে এসে এসব কথা ভেবে অযথা কষ্ট পাওয়া কেন? তার চেয়ে বেলজিয়ামকে দেখা যাক। তার কথা ভাবা যাক।

জর্মনীর সঙ্গে বেলজিয়ামের কোন প্রাকৃতিক পার্থক্য বুঝতে পারছি না। এখানেও পথের পাশে গাছের সারি আর তারপরে দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেত। ক্ষেতের মাঝে বৈদ্যুতিক লাইন, কোথাও কোথাও বাড়ি-ঘর কিম্বা কল-কারখানা। জর্মনীর মতই মসৃণ ও ও প্রশস্ত পথ—অটোবান, মানে সুপাব হাইওয়ে।

শঙ্কর বলে—এ অটোবানের নম্বর E-5 অর্থাৎ য়ুরোপ পাঁচ। অটোবানে সাধারণত আলো থাকে না কিন্তু এদেশের অটোবানে দেখুন, কি রকম পর্যাপ্ত আলোর .ব্যবস্থা।

ঝড়ের বেগে গাড়ি চলছে। কথাটা আমরা আমাদের দেশেও ব্যবহার করি। কিন্তু সে ঝড় কালবৈশাখী নয়, নিতান্তই হেমন্তের

হাওয়া। কারণ আমাদের স্বদেশী পথ দিয়ে জোরে গাড়ি চলা সম্ভব নয়। য়ুরোপে কিন্তু সত্যই ঝড়ের বেগে গাড়ি চলে। কারণ এখানে পথ যেমন মসৃণ, তেমনি প্রশস্ত এবং সোজা। তা ছাড়া এপথে গাড়ি জোরে না চালিয়ে উপায় নেই।

এ পথের নাম অটোবান (Autobahn)। জর্মন ভাষায় bahn শব্দের অর্থ পথ। অটোবানে যাওয়া ও আসার অংশদুটি সম্পূর্ণ পৃথক। দুটি অংশের মাঝখানে বেশ চওড়া ও ঘন গাছপালার সারি, প্রায় জঙ্গল বলা যেতে পারে। কারণ রাতে যেন ওপাশের গাড়ির আলো এপাশের চালকের চোখে না পড়ে।

সাদা দাগ দিয়ে পথের প্রতি অংশকে তিনটি ভাগ করা হয়েছে। ডানদিকের অংশটি বড় ও ভারী গাড়ির জন্য। এই অংশের গতি-বেগ ঘণ্টায় অন্তত ৮০ কিলোমিটার। পরের অংশটির অর্থাৎ যে অংশ দিয়ে আমাদের গাড়ি চলেছে, গতিবেগ অন্তত ১২০ কিলো-মিটার। এর বাঁদিকের অর্থাৎ শেষ অংশটির গতিবেগ অন্তত ১৫০ কিলোমিটার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে য়ুরোপের প্রত্যেক দেশে এইরকম আন্তঃ-রাষ্ট্র রাজপথ নির্মিত হয়েছে। বিশ্ব-ইতিহাসের ধিকৃততম মানুষটি কিন্তু প্রথম এই পথ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর নাম হের্ হিটলার। তিনি জর্মনীর 'ফুয়েহ্‌রার' হলেও তাঁর আদিনিবাস ছিল অস্ট্রিয়া। তিনি মাঝে মাঝে অস্ট্রিয়া বেড়াতে যেতেন। তাই তিনি বার্লিন থেকে জাল্‌সবুর্গ (অস্ট্রিয়া) পর্যন্ত একটি পথ নির্মাণ করেন, তার নাম দেন 'অটোবান।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে য়ুরোপের দেশে দেশে অটোবান নির্মিত হয়েছে।

সেই পথ দিয়ে আমরা এখন পশ্চিম-জর্মনীর রাজধানী বন্ থেকে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেল্‌স চলেছি। চলেছি ঝড়ের বেগে। আর এটি পথের জন্যই সম্ভব হচ্ছে।

কিন্তু পথের কথা আর নয়। এবারে অন্যকথা ভাবা যাক। আগেই বলেছি আমি ও অহীন কলকাতা থেকেই 'বেনেলুক্স' ভিসা

নিয়ে এসেছি। বেনেলুক্সমানে বেলজিয়াম নেদারল্যাণ্ডস ও লুক্সেমবুর্গ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত এই তিনটি দেশ ঐক্যবদ্ধ উন্নয়নেব প্রয়োজনে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুলাই বেনেলুক্স ইউনিয়ান প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিরক্ষা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নই এই সংযুক্তিকরণের প্রধান উদ্দেশ্য। পরের বছর গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স ব্রাসেল্‌স চুক্তি সম্পাদন করে বেনেলুক্স ইউনিয়ানের সহায় হতে সম্মত হন। ১৯৪৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল বেলজিয়াম উত্তর আতলান্তিক চুক্তি (ন্যাটো) সম্পাদন কবে। এবং সে বছর থেকেই বেলজিয়ামের মেয়েরা ভোট-দানের অধিকার লাভ করেন।

যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম। আমি আর অহীন কলকাতা থেকেই বেনেলুক্স ভিসা নিয়ে এসেছি। ফলে এই তিনটি দেশে যেতে আমাদের কোন অসুবিধে নেই। আজই অবশ্যি তার ছুটি দেশ দেখব। ব্রাসেলস্ থেকে ফেরার পথে আমরা লুক্সেমবুর্গ হয়ে আসব।

বেলা দেড়টার সময় শঙ্কর রাস্তা থেকে নেমে এসে একটা পেট্রোল পাম্পের সামনে গাড়ি 'পার্ক' করল। না, তেল নিতে নয়। অটোবানে পেট্রোল পাম্পের পাশে রেস্তোরাঁ থাকে। আমরা গাড়ি রেখে রেস্তোরাঁয় আসি। আমি অহীন ও জয়া চা নিলাম আর শঙ্কর ব্ল্যাক কফি। বলা বাহুল্য চা ও কফির সঙ্গে পেস্ট্রি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু শ্রীমান অমৃতের পেস্ট্রিতে অরুচি। তাই চা শেষ হবার আগেই অহীনকে উঠতে হল। সে একটা আইসক্রিম নিয়ে এলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমান সোজা হয়ে বসল।

আধঘণ্টা বিরতিব পরে আবার গাড়ি ব্রাসেলস্-এর পথে এগিয়ে চলল। সেই একই পথ। পথের পাশে কোথাও দিগন্তপ্রসারী সবুজ ক্ষেত, কোথাও বাড়ি-ঘর কিম্বা কলকারখানা। ছোট হলেও বেলজিয়াম পৃথিবীর একটি সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প-সমৃদ্ধ দেশ। এঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে কাঁচামাল আমদানী করে উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভার আবার সেইসব দেশে রপ্তানী করেন। এই কাজে তাঁদের

প্রধান সহায় নিজের দেশের কয়লা, দক্ষ শ্রমিক ও চমৎকার পরিবহন ব্যবস্থা। কয়লা-শিল্প, কাচশিল্প, বস্ত্রশিল্প, চর্মশিল্প, রসায়নশিল্প ও বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের জন্যই বেলজিয়াম এমন সম্পদশালী দেশ হতে পেরেছে।

যন্ত্রশিল্পে যতই উন্নত হয়ে উঠুক, বেলজিয়াম কিন্তু এখনও একটি কৃষিসমৃদ্ধ দেশ। জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই কৃষিনির্ভর। কারণ দেশের মাটিও বেশ উর্বর। সেন্ (Senne), দিল্ (Dyle), জিতা (Geeta) এবং ডমের (Demer) প্রভৃতি বেশ কয়েকটি নদী প্রবাহিত হয়ে দেশটিকে সুজলা ও সুফলা করে তুলেছে। গম, চিনি ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন এবং উদ্যানপালন-শিল্পে বেলজিয়াম খুবই সমৃদ্ধ। য়ুরোপের অন্যান্য দেশের মতো এখানেও চাষাবাদ একটি শ্রদ্ধেয় পেশা। আর তাই এদেশের সবুজ ক্ষেত দেখে আমারও প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে।

দেশটি কিন্তু খুবই ছোট। আয়তন মাত্র ৩০, ৫১৩ বর্গকিলোমিটার। অবস্থান ৪৯° ৩০´ ও ৫১° ৩০´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ২° ৩২´ ও ৬°২৪´ পূর্ব দ্রাঘিমায়। এই দেশের উত্তরে নেদারল্যাণ্ডস ও উত্তর পূর্বে পশ্চিম জর্মনী। পুবে ও দক্ষিণ-পুর্বে লুক্সেমবুর্গ, দক্ষিণে ও পশ্চিমে ফ্রান্স এবং উত্তর-পশ্চিমে উত্তর মহাসাগর। বেলজিয়ামের প্রায় ৬৭ কিলোমিটার উপকূল-রেখা রয়েছে।

সমুদ্রসৈকত থেকে স্থলভাগ ক্রমে উঁচু হয়ে দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে দেশের মধ্যাঞ্চলে একটি মালভূমির সৃষ্টি করেছে। মালভূমির উচ্চতা প্রায় ৭০০ ফুট। এই মালভূমির একাংশের নাম ব্রাবঁ (Brabant)। ব্রাসেলস এই ব্রাবঁ প্রদেশে অবস্থিত। ব্রাবঁ ছাড়া আরও আটটি প্রদেশ রয়েছে এদেশে।

বেলজিয়ামের রাজধানী ও প্রধান নগর ব্রাসেল্স। দেশের শিল্প বাণিজ্য রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রধান কর্মকেন্দ্র। জনসংখ্যা প্রায় দু লক্ষের মতো। কেবল নিজের নয়, বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থারও প্রধান কর্মকেন্দ্র ব্রাসেল্স। যেমন ন্যাটো, ই. ই. সি. এবং

কমিশন অব্ য়ুরোপীয়ান কমিটি।

খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ব্রাসেল্‌স রোমান অধ্যুষিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে ফ্রাঙ্করা জনপদটির ওপরে নিজেদের অধিকার কায়েম করেন। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ব্রাসেল্‌স বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে গড়ে উঠতে শুরু করে। পঞ্চদশ শতকে বহু বড় বড় বাড়ি তৈরি হয়! তখন বেলজিয়াম নেদারল্যাণ্ডস্-এর অন্তর্গত। ১৪৭৭ সালে ব্রাসেল্‌স নেদারল্যাণ্ডস্-এর রাজ্যপালের কর্মকেন্দ্রে উন্নীত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই জনপদটি বিলাসবহুল শহর রূপে খ্যাতিলাভ করে। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ব্রাসেল্‌স নানা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফরাসী বিপ্লবের সময়ও এই শহরের উপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপটা বয়ে যায়। বিপ্লবের পরে বার বার হাত-বদল হয়। আর সেই জের চলে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। ১৮১৫ সালে ওয়াটারলু যুদ্ধের সময় ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের প্রধান ঘাঁটি ছিল এখানে। তারপর থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত ব্রাসেল্‌স নগরেই নেদারল্যাণ্ডস পার্লামেন্টের অধিবেশন বসত। ১৮৩১ সালে নেদার-ল্যাণ্ডস বেলজিয়ামকে স্বাধীনতা দান করে। তখন থেকেই ব্রাসেল্‌স বেলজিয়ামের রাজধানী ও প্রধান নগর।

অবস্থানের জন্য দুটি বিশ্বযুদ্ধেই বেলজিয়াম ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর ব্রাসেলস-কে সেই ক্ষতির সিংহভাগ সহ্য করতে হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় দশলক্ষ বেলজিয়ান দেশত্যাগী হয়েছিলেন। সাত লক্ষ নেদারল্যাণ্ডসে, দু লক্ষ ফ্রান্সে ও এক লক্ষ গ্রেট বৃটেনে পালিয়ে গিয়েছিলেন। অথচ ১৯২৫ সাল থেকে বেলজিয়াম নিরপেক্ষ দেশ এবং তাঁদের এই নিরপেক্ষতা, নেদারল্যাণ্ডস, গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের মতো জর্মনীও মেনে নিয়েছিলেন।

বেলজিয়াম য়ুরোপের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। আয়তনের তুলনায় য়ুরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে জনসংখ্যা বেশ বেশি। বর্তমান বেলজিয়ামের জনসংখ্যা এককোটির ওপরে আর ব্রাসেলস্ শহরে বাস করেন প্রায় বিশ লক্ষ মানুষ।

বেলা পৌনে তিনটার সময় আমরা ব্রাসেল্‌স পৌছলাম। তার মানে জর্মন সীমান্ত আখেন থেকে ব্রাসেলস আসতে আমাদের ছু'ঘণ্টা সময় লাগল। তার মধ্যে অবশ্য পথে আমরা আধঘণ্টার ওপরে বিশ্রাম নিয়েছি।

শঙ্কর একেবারে রাজপ্রাসাদের সামনে এসে গাড়ি থামিয়েছে! রাজদর্শন না হোক রাজবাড়ি দেখে শহরদর্শন শুরু হবে।

পথের একটি দিক জুড়ে সুদীর্ঘ প্রাসাদ। গড়ন অনেকটা আমাদের রাইটার্স বিল্ডিংস-য়ের মতো। তবে আরও উঁচু, আরও লম্বা, আরও সুন্দর। নিচের ছুটি তলায় টানা গড়ন হলেও তিনতলা আর চারতলায় সারা প্রাসাদ জুড়ে গোল গম্বুজের সারি। মাঝখানের মূল-তোরণটিও অনেকটা রাইটার্সের মতো। প্রাসাদের সামনে পথের পাশে বাঁধানো কোমর-সমান রেলিং, অনেকটা আমাদের রেড রোডের মতো।

পথটি কিন্তু এখানে রেড রোডের চাইতে চওড়া। পাথর বাঁধানো পথ। প্রাসাদের উল্টোদিক জুড়ে গাড়ি দাঁড়াবার জায়গা। সাদা দাগ দিয়ে গাড়ির গণ্ডী এঁকে দেওয়া হয়েছে। তার পরেই তিনটি স্তরে অনেকখানি বাঁধানো অঙ্গন। বোধকরি সভা সমাবেশের সময় শ্রোতাদের বসবার জন্য। নানা উপলক্ষে এখানে নিশ্চয়ই সমাবেশ হয়।

প্রাসাদের সামনে ছু'জন বন্দুকধারী প্রহরী। তাঁরা 'এ্যাটেনশন' হয়ে প্রায় অপলক নয়নে সামনে তাকিয়ে আছেন। তাঁরা থাকায় কারও অসুবিধে হয় কিনা জানা নেই আমার। তবে আমাদের ভারী সুবিধে হল। কারণ শ্রীমান অমৃত এতক্ষণ বাদে গাড়ি থেকে নামার সুযোগ পেয়ে সমানে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছিল। বন্দুকধারী প্রহরীদের দেখিয়ে তাকে খানিকটা শান্ত করা গেছে।

বেলজিয়াম রাজতন্ত্রের দেশ। পুরুষানুক্রমে রাজা দেশের প্রধান। প্রতি চারবছর অন্তর নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্ট গঠিত হয়। রাজা নির্বাচিত সাংসদদের মধ্য থেকে মন্ত্রীমণ্ডলী মনোনীত করেন। রাজপ্রতিনিধি রূপে মন্ত্রীমণ্ডলী শাসনকার্য পরিচালনা

করেন। রাজা সেনাবাহিনীরও প্রধান। তাঁর অনুমোদন ছাড়া দেশের কোন আইন কিম্বা আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না।

আগেই বলেছি, রাজপ্রাসাদটি যেমন সুন্দর ও সুবিশাল, তেমনি এই পথ ও স্কোয়ার সত্যই দর্শনীয়। অথচ দর্শনার্থী বলতে শুধুই আমরা। আর কোন গাড়ি নেই। মনে পড়ছে বাকিংহ্যাম প্যালেসের কথা। লণ্ডনপ্রবাসী বন্ধু দিলীপ বসু আমাকে একদিন দুপুরে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে। শত শত গাড়ির অবিরত আসা-যাওয়া আর অগণিত পর্যটকের পদচারণা। মনে হয় যেন মেলা মিলেছে। আর এখানে? মনটা খারাপ হয়ে যায়।

শঙ্কর আর অহীনের ছবি নেওয়া শেষ হল। আবার গাড়িতে এসে উঠি। গাড়ি চলতে শুরু করে। শঙ্কর বলে—এখানে কোন টুরিস্ট দেখলেন না বলে ভাববেন না ব্রাসেল্‌স পর্যটকদের প্রিয় নয়। প্রচুর টুরিস্ট আসেন এ শহরে। এখন আমরা যেখানে চলেছি, সেই গ্রঁদ প্লাস-এ গেলেই বুঝতে পারবেন। আসলে পর্যটকরা কেউ বড় একটা রাজপ্রাসাদ দেখতে আসেন না।

—কিন্তু আমি শুনেছি, য়ুরোপের মূল ভূখণ্ডে ব্রাসেল্‌স হচ্ছে সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর, তাই নাকি এখানে পর্যটকদের সংখ্যা কম? অহীন জিজ্ঞেস করে।

একটু হেসে শঙ্কর বলেন—দেখুন ডক্টর মণ্ডল, এই ব্যয়বহুল শব্দটা পাশ্চাত্য পর্যটকদের কাছে খুব অর্থবহ নয়। কারণ তাঁরা ডলার মার্ক পাউণ্ড অথবা ফ্রাঁ আয় করেন। তাই একটু ব্যয়বহুল হলেও তাঁরা ব্রাসেল্‌স ভ্রমণে আসেন। গ্রঁদ প্লাস গেলেই বুঝতে পারবেন। তাছাড়া সেখানে পৌঁছলে আপনারা এই ব্রাসেল্‌স নগরীর চরিত্র সম্পর্কেও একটা সম্যক ধারণা করতে পারবেন।

—কি রকম? আমি প্রশ্ন করি।

শঙ্কর উত্তর দেয়—সত্যি বলতে কি এমন একটা স্কোয়ার আপনি কোথাও দেখেন নি। লণ্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ার বলুন, প্যারির কনকর্ড বলুন আর রোমের ভিয়া ভিনেতো বলুন, কোনটির সঙ্গেই এর

তুলনা হয় না। অথচ পারির মতো উত্তম ভোজ্য ও পানীয় আপনি এখানে পাবেন না, রোমের মতো জাঁকজমক নেই এ শহরের, ম্যুনিখের মতো কর্মবহুল ও কলকোলাহল মুখরিত নয় ব্রাসেল্‌স।

একবার থামে শঙ্কর। গাড়ির গতিবেগ খানিকটা কমিয়ে আবার বলতে থাকে—গ্রঁদ প্লাসে দাঁড়িয়ে আপনারা দেখতে পাবেন সরু পাথর বাঁধানো সেই পথ, যে পথে একদা কেবল ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ি চলত। দেখবেন সেই পথের পাশে প্রায় প্রতিটি বাড়ির মধ্যযুগীয় গড়ন আর মাথায় সেযুগের পতাকা উড়ছে। বাড়িগুলোর গায়ে আপনি সোনার জলের অলঙ্করণ দেখে পুলকিত হয়ে উঠবেন।...

তবে হ্যাঁ। আপনাদের হৃদয়ে যদি সে হারিয়ে যাওয়া মধ্যযুগের প্রতি মমতা থাকে, মনে যদি সেই যুগকে জানার আকুলতা থাকে, তাহলেই কেবল আপনারা ব্রাসেল্‌সকে ভালোবাসতে পারবেন।

আমার বুকের ভেতরে মধ্যযুগের প্রতি কতখানি মমতা জমা রয়েছে, জানা নেই। আমি কেবল বলতে পারি ব্রাসেল্‌সকে ভালো লাগছে, দেখতে দেখতে পথ চলেছি।

পথের পাশে আধুনিক বাড়ি নেই, তা নয়। তবে পুরনো যুগের বাড়ির সংখ্যাই যেন বেশি। তার মানে ফ্ল্যাট বাড়ি বানাবার প্রবণতা এখনও এখানে তেমন প্রবল হয়ে উঠতে পারে নি। ফলে শহরটি বৈচিত্র্যময় রয়ে গিয়েছে। পুরনো বাড়িগুলো সবই পাথরের, তাদের সারা গায়ে নানা রকমের কারুকার্য। বাড়িগুলো কিন্তু সবই ঝকঝকে। মনে হচ্ছে যেন হালে তৈরি হয়েছে। আর পথ? খুব প্রশস্ত নয়, কিন্তু যেমন মসৃণ তেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পথের পাশে কিছু দূরে দূরেই পার্কিং। শত শত গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

আবার কোথাও পথের পাশে টিলার মতো উঁচু জায়গা, সেখানে বাড়ি-ঘর। পথ থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে।

কর্মবহুল ব্যস্ত শহর। ছুটোছুটি প্রচুর রয়েছে কিন্তু হৈচৈ একেবারে নেই। ভারী শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশ। য়ুরোপের অন্যান্য

বড় শহরের মতো এখানেও গাড়ির হর্নের শব্দ নেই। মানুষজনের কথাবার্তাও কানে আসছে না। শব্দ-দূষণ সম্পর্কে পাশ্চাত্য জগৎ এখন অত্যন্ত সচেতন। তাই য়ুরোপের প্রায় ডজনখানেক দেশ ভ্রমণ করেও আমি মাইকের শব্দ শুনতে পাই নি। তার মানে অবশ্য এই নয় যে য়ুরোপীয়রা সঙ্গীতবিমুখ। বরং ঠিক উল্টো। এঁরা গান শুনতে খুবই ভালোবাসেন। তবে ঘরে বসে গান শোনেন। আর পথে বেরিয়ে গান শোনার ইচ্ছে হলে 'ওয়াক-ম্যান' কানে লাগিয়ে চলাফেরা করেন। অপরেব কানে তালা লাগিয়ে এঁরা কখনই সঙ্গীতসুধা পান করেন না।

শঙ্করের কথায় আমার ভাবনা থেমে যায়। শঙ্কর বলছে—ব্রাসেলস শহরটি দু-ভাগে বিভক্ত 'লোয়ার টাউন' এবং 'আপার টাউন।' একাদশ শতকে দুটি অঞ্চলে একই সময় জনবসতির পত্তন হয়—সেন্ নদীর উপত্যকায় এবং ক্লুদঁব্যের্গ (Cloudenberg) পাহাড়ে। জনবসতি বাড়তে বাড়তে দুটি অঞ্চল মিলে গিয়ে এক শহর হয়েছে। কিন্তু এখনও উপত্যকার অংশকে লোয়ার টাউন আর পাহাড়ী অংশকে আপার টাউন বলা হয়।

—আমরা কোন্ টাউনে রয়েছি? অহীন জিজ্ঞেস করে।

—লোয়ার টাউনে। শঙ্কর উত্তর দেয়। বলে—এখনও লোয়ার টাউন প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। গ্রঁদ্ প্লাস' (Grand' Place) টাউন হল প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানগুলিও সবই প্রায় এই অংশে। তবে তুলনায় এই অংশের রাস্তাগুলি সঙ্কীর্ণ কারণ এগুলি সেই প্রাচীন জনপদের জনপথ। আর এই অংশেই য়ুরোপের কয়েকটি বিখ্যাত রেস্তোরাঁ অবস্থিত। আপনারা আশা করি জানেন বেলজিয়ামের রান্না খুবই বিখ্যাত।

একবার থামে শঙ্কর। তারপরেই ডানদিকের একটা পুরনো বাড়ি দেখিয়ে বলে ওঠে—টাউন হল।

আমরা দেখি। ভারী সুন্দর বাড়িটি। পাথরে তৈরি। মাঝখানে মাঝারী আকারের তোরণ। তার দুপাশে দোকান-পাট নিচের

তলায়, সামনের দিক জুড়ে।

গাড়িতে বসে দেখা। ভাল করে দেখবার আগেই টাউন হল হারিয়ে যায়। কিন্তু চোখ ফেরাতে পারি না। এবারে সামনে একটি গির্জা। আয়তনে ছোট কিন্তু বেশ উঁচু, বোধকরি দশ-বারো তলা বাড়ির সমান।

উচ্চতা নয়, গড়ন। সত্যই অপরূপ। ওপরের দিকটা আমাদের দেশের মন্দিরের মতো। স্তম্ভ-পরিবেষ্টিত মোচাকৃতি শিখরটি আস্তে আস্তে সরু হয়ে ওপরে উঠে গিয়েছে। শিখরে পতাকা উড়ছে। আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। ভারী ভাল লাগছে।

তবে সেই একই ব্যাপার। চলমান গাড়িতে বসে দেখা। একটু বাদে গির্জাটি যায় হারিয়ে।

—পশ্চিম য়ুরোপের স্থাপত্যশিল্পে ব্রাসেল্‌স একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। শঙ্কর বলে—এখানে আপনারা ফরাসী ও ফ্লেমিশ শিল্পকলার এক বিস্ময়কর সহাবস্থান দেখতে পাবেন।

একটু বাদেই আমরা গ্রঁদ্ প্লাসে আসি। তিনদিকে বাড়ি, মাঝ-খানে সুপ্রশস্ত পথ। অবশ্য পথ না বলে বাঁধানো ময়দান বলাই উচিত হবে। তারই একপাশে গাড়ি রেখে দিয়ে পথচলা শুরু কবি। পথের পাশে প্রায় সব বাড়ি মধ্যযুগীয় স্থাপত্যকলায় সমৃদ্ধ। পাথর বাঁধানো নাতিপ্রশস্ত পথ। চওড়া ফুটপাথ, মাঝে মাঝে রেলিং ঘেরা ছোট-ছোট বাগান। বাগানে নানা রঙের ফুলের মেলা। তারই মাঝে বসবার জায়গা। দলে দলে মানুষ ভেতরে বসে আছেন। কিন্তু কেউ ফুল ছিঁড়ে খোঁপায় কিম্বা বোতামে গুঁজছেন না।

পথের এই অংশটিতে গাড়ি প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে পথের মাঝেও প্রচুর জটলা। চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে মানুষগুলো। কিন্তু পথ অবরোধ করে নয়। বরং আড্ডার মাঝেও লক্ষ্য রেখেছেন তাঁদের জন্য যেন পথচারীদের অসুবিধে না হয়। হচ্ছেও না। আমরা অক্লেশে এগিয়ে চলেছি।

পথের দু'পাশেই বেশ চওড়া ফুটপাথ। না, কোন হকার নেই।

রয়েছেন একজন শিল্পী।। একটা দোকানের দেওয়ালে মাঝারী আকারের পাঁচ-ছ'খানি অয়েল পেন্টিং ঝুলিয়ে তিনি ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। শিল্পী বয়সে তরুণ কিন্তু ছবিগুলি বেশ পরিণত। সবই প্রাকৃতিক দৃশ্য—সূর্য আকাশ মেঘ পাহাড় নদী গাছ ফুল পাখি ইত্যাদির রঙীন চিত্র। ভারী সুন্দর।

আমরা দেখি। শিল্পী খুশি হন। হাসিমুখে শঙ্করের প্রশ্নের জবাব দেন। তারপরে দেখা শেষ করে যখন আমরা বিদায় চাই, তিনি হাসিমুখেই আমাদের ধন্যবাদ জানালেন। ছবি না কেনার জন্য কোনরকম বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। শুধু তাই নয় ছবিগুলো বিক্রি করার জন্য ওঁর যে বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে, তা পর্যন্ত বোঝা গেল না। কি জানি, পার্থিব প্রয়োজনের প্রতি এমন নির্বিকার না হতে পারলে বোধকরি সত্যিকারের শিল্পী হওয়া যায় না।

খানিকটা হেঁটে একটি বিচিত্র পথে এসে পড়ি। পাথর বাঁধানো মসৃণ পথ। খুব চওড়া নয়, খানতিনেক গাড়ি পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে। কিন্তু একখানিও গাড়ি নেই। গাড়ি আসতে পারে না এ পথে।

পথের দু'পাশে তেতলা বাড়ি। দু'দিকের বাড়ির ছাদে লোহার 'বিম্' বা কড়ি লাগিয়ে পথের ওপরে স্বচ্ছ ফাইবার গ্লাসের ছাউনী। আর পথের বুকে কার্পেট বিছিয়ে চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে 'বার' রেস্তোরাঁ ও ফুলের দোকানই বেশি। দোকান না বলে মেলা বলাই ভাল, ফুলের মেলা।

শঙ্করও তাই বলে—এটা ফুলের বাজার।

ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী জয়া বলে বসে—আমাকে ভাল দেখে একটা বুকে (bouquet) কিনে দাও, মাসির জন্য নিয়ে যাবো।

মাসি মানে তৃণাদি। সুতরাং শ্রীমান শঙ্করকে পকেটে হাত দিতে হয়।

ফুলের তোড়া নিয়ে বেরিয়ে আসি ফুলের বাজার থেকে। আসতে অবশ্য ইচ্ছে করছিল না। কত রঙের কত রকমের ফুল।

কি বিপুল ভাণ্ডার। আর কত মানুষের কেনাকাটা। কিন্তু আমরা যে ব্যস্ত পর্যটক। ফুলের শোভা উপভোগ করার সময় কোথায় আমাদের?

আমরা তাই ফুলের বাজার থেকে বেরিয়ে কর্কটের বাজারে এলাম। কর্কট, হ্যাঁ চলতি ভাষায় আমরা যাকে কাঁকড়া বলি। আর ইংরেজীতে বলে Crab. জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্বাদশ রাশির এই চতুর্থ রাশি-রূপ উভচরটি যে এঁদের এত প্রিয়, তা জেনে বিস্মিত বোধ করছি। আমাদের বাজারেও উভচরটি পাওয়া যায়। কিন্তু তার প্রতি আমিষাশীদের আসক্তি সামান্যই। কিন্তু এখানে দেখছি দোকানে দোকানে কাচের শো-কেসে কাঁকড়াগুলি সযত্নে সাজিয়ে রেখেছে। ছোট বড় মাঝারী নানা আকারের কাঁকড়া। কোনটি লাল, কোনটি বাদামী কোনটি বা নিকষ কালো। দেখে ভয় করে।

অথচ শঙ্কর বলে—ব্রাসেল্‌স রান্নার জন্য বিখ্যাত। ভোজন-রসিকদের কাছে ব্রাসেল্‌সের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এই কাঁকড়ার মাংস। এর কোন রেস্তোরাঁয় গিয়ে শো-কেসে পছন্দমত কাঁকড়াটি দেখিয়ে দিলে কয়েক মিনিটের মধ্যে সেটি রান্না করে আপনার সামনে পরিবেশিত হবে।

একবার থামে শঙ্কর। তারপরে চলতে চলতে আবার বলে—আমি ষোলো বছর আগে বন্ধুদের সঙ্গে ব্রাসেল্‌স এসেছিলাম। সেবারে কাঁকড়া খেয়েছি। খেতে কিন্তু খুবই ভাল।

—তা হোক গে। এবারে তুমি সে সুযোগ পাচ্ছ না। জয়া গম্ভীর স্বরে ফতোয়া জারি করে।

—কারণ? শঙ্কর সবিনয়ে প্রশ্ন করে।

—কারণ, তখন তুমি স্বাধীন ছিলে, যা ইচ্ছে করে বেরিয়েছো। এখন যখন আর তা নও, তখন আর সে সুযোগ পাচ্ছ না।

—তুমি তো জানো, আপ রুচি খানা।

—কিন্তু তোমার সে রুচি আমি ঠিক করে দেব। অতএব এখন, চলো কর্কট মার্কেট থেকে বেরিয়ে পড়া যাক।

বেচারী শঙ্কর নিঃশব্দে সে নির্দেশ পালন করে! কারণ কথাটা তো মিথ্যে নয়। ষোলো বছর আগে সে বিয়ে করে নি, সুতরাং স্বাধীন ছিল। এখন তো আর তা নয়। এখন তার কাজকর্ম চলা-ফেরা খাওয়া-দাওয়া, এককথায় ভাল-মন্দ সবকিছুর একমাত্র নির্দেশিকা শ্রীমতী জয়া রায়।

কাঁকড়ার কালিয়া না খেলেও শ্রীমতী জয়ার কৃপায় কফি আর পেস্ট্রি পাওয়া গেল। খেয়ে নিয়ে আবার পথচলা শুরু করি। পাথর বাঁধানো অপ্রশস্ত পথ। পথের পাশে সারি সারি দোকান। বেল-জিয়ামের বিশ্ববিখ্যাত কাচের দোকান থেকে হীরার দোকান। পোশাক থেকে ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্র, চামড়া থেকে শয্যাদ্রব্য, খেলাধূলার সামগ্রী থেকে আধুনিকতম রেস্তোরাঁ, সব রকমের দোকান রয়েছে। খদ্দেরও প্রচুর, গাড়ির সংখ্যাও যথেষ্ট। কিন্তু কোথাও যানজট নেই। থাকবে কেমন করে? এখানে যে ফুটপাথে হকার নেই আর রাস্তায় নেই কোন গর্ত।

হাঁটতে হাঁটতে আবার গ্রঁদ্ প্লাসে ফিরে আসি। গ্রঁদ প্লাস ফরাসী নাম, ইংরেজীতে বলে 'Market Place' আর জর্মনে 'Grote Markt'।

তখন দেখি নি, এখন চোখে পড়ল। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর একটি ব্রোঞ্জমূর্তি। প্রাণময় প্রশান্ত প্রতিমূর্তি। পর্যটকরা প্রত্যেকেই মূর্তিটিকে স্পর্শ করছেন। ফলে ওখানে একটু ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে।

এমন ঘটনা য়ুরোপে এসে আর দেখি নি। তাই তাড়াতাড়ি শঙ্করের দিকে তাকাই। আরে এযে দেখছি সে-ও মূর্তিটিকে স্পর্শ করার জন্য ভিড় ঠেলতে শুরু করেছে!

অতএব আর বাক্যব্যয় না করে শঙ্করের অনুগামী হই। এবং যেহেতু ধাক্কাধাক্কি ব্যাপারটায় আমরা জগতের যে কোন জাতির চেয়ে দক্ষ, সেইহেতু কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঈশ্বরপুত্রকে স্পর্শ করে ভিড়ের বাইরে বেরিয়ে আসি।

এবারে কথাটা জিজ্ঞেস করি শঙ্করকে—এই মূর্তি স্পর্শ করলে কি হয়?

—আবার ব্রাসেল্‌স আসার সুযোগ পাওয়া যায়।

সেই একই ব্যাপার। রোম শহরে সবাইকে বলতে শুনেছি, সেখানকার ত্রেভি ফাউণ্টেনে লিরা ফেললে আবার রোমে ফিরে আসতে পারা যায়। *তার মানে বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও য়ুরোপের মানুষ অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাসী এবং তাঁরা কুসংস্কার-মুক্ত নন।

কিন্তু থাক্ গে এসব কথা, ব্রাসেল্‌স ভ্রমণের কথায় ফিরে আসা যাক। ঈশ্বরপুত্রকে স্পর্শ করার পরে আবার পথচলা শুরু করি। পথের পাশে তেমনি কারুকার্যময় পাথরের পুরনো বাড়ি। পুরনো বলে মোটেই ম্লান নয়। বরং বেশ ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে। সবই প্রায় তিনতলা। নিচের তলায় দোকান-পাট।

সামনে আবার একটা জটলা দেখতে পাচ্ছি। ফুটপাথ ও পথের একাংশে বেশ কিছু নারীপুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কি যেন দেখছেন তাঁরা। কেউবা ছবি আঁকছেন।

আমি শঙ্করের দিকে তাকাই। সে বলে—মানেক্যাঁ পি (Mannequin Pis) ব্রাসেল্‌স শহরে পর্যটকদের একটি প্রধান আকর্ষণ।

অতএব পা চালাই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অকুস্থলে উপস্থিত হই। ফুটপাথের শেষে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা একফালি জায়গা সেখানে কোমর সমান উঁচুতে একটা পাথরের চৌবাচ্চা। তার ওপরে চার-পাঁচ ফুট চওড়া ও সাত-আট ফুট উঁচু একখানি পাথরের ঘর। ঘরের তিনদিকে দেওয়াল, সামনের দিকটা খোলা। চৌবাচ্চার ওপরে একটা সুদৃশ্য পাথরের বেদি। সবই শ্বেতপাথরে তৈরি।

বেদির ওপরে একটি মূর্তি—লিট্‌ল বয়। তার পরনে প্যাণ্ট-শার্ট। পায়ে জুতো। মাথায় টুপি। সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছে আর সেই মূত্র চৌবাচ্চায় এসে পড়ছে।

* লেখকের 'রমণীয় রোম' দ্রষ্টব্য।

সত্যি বলতে কি তখন শঙ্করের কথা শুনে খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম ব্রাসেলস শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ এই আকর্ষণটি না জানি কেমন হবে? কিন্তু এ যে দেখছি একটা অশ্লীল ব্যাপাব! এই দৃশ্য দেখার জন্য এত মানুষ ছুটে এসেছেন।

—হ্যাঁ। শঙ্কর বলে—কাবণ ব্যাপারটা মোটেই অশ্লীল নয়।

—সে কী! অহীন বিস্মিত।

শঙ্কর জবাব দেয়—এই ছোট ছেলেটির প্রস্রাব কবার সঙ্গে ব্রাসেলস শহরের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গী হয়ে রয়েছে।

—কি রকম? অহীন আবার জিজ্ঞেস করে!

—বলছি। কিন্তু তার আগে ছেলেটাকে একটা লিট্‌ল বয় কিনে দেওয়া যাক।

তাকিয়ে দেখি পথের পাশে হকাররা প্লাস্টিকের লিট্‌ল বয় বিক্রি করছে। পুতুলগুলিতে জল ভরে পেটে চাপ দিলেই প্রস্রাব পড়ে। সুতরাং শ্রীমান অমৃত বায়না ধরেছে।

লিট্‌ল বয় কিনে বাপ-বেটা ফিরে আসে। আমরা গ্রঁদ্ প্লাসের দিকে ফিরে চলি। চলতে চলতে শঙ্কর সেই ইতিহাস শুরু করে —জর্মনী পরাজিত। য়ুরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ। কিন্তু যুদ্ধে বিধ্বস্ত ব্রাসেল্‌স শহরে তখনও অশান্তি আর অরাজকতা। ভাই বোনকে হারিয়েছে, মেয়ে বাপকে হারিয়েছে, মা ছেলেকে হারিয়েছে। তারই মাঝে সবাই নতুন করে ঘর বাঁধবার চেষ্টা করছে। এই সময় একদিন বিকেলে এক মায়ের আর্তচিৎকারে প্রতিবেশীরা চমকে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতে মা বলছেন, তিনি তাঁর ছোট ছেলেটাকে খুঁজে পাচ্ছেন না। সকালেও সে মায়ের কাছে ছিল।

প্রতিবেশীরা চারিদিকে ছুটলেন। পুলিশে খবর দেওয়া হল। শুরু হল খোঁজাখুঁজি। দুপুর গড়িয়ে বিকেল এলো, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। সারা শহর তোলপাড় হল। কিন্তু মায়ের ছেলেকে পাওয়া গেল না।

সবাই যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছেন, তখন হঠাৎ খবর পাওয়া

গেল। খানিকটা দূরে একটা পার্কে ঐ রকম একটি ছেলেকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীদের নিয়ে মা ছুটলেন সেখানে। দেখলেন বেশ ভিড়। ভিড় ঠেলে কোনমতে ভেতরে গিয়ে বুঝতে পারলেন, তাঁর ছেলেকে ঘিরেই ভিড়। ছেলেটি প্রস্রাব করছে। আর সবাই তা দেখছেন। সবার মতো মা-ও ছেলের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। কারণ ছেলে প্রস্রাব করছে তো করছেই। জায়গাটা তখন রীতিমত ভিজে গিয়েছে, তবু তার প্রস্রাব বন্ধ হচ্ছে না। অতটুকু ছেলে এত জল ঢালছে কেমন করে? ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে অলৌকিক। তাই সবার সঙ্গে মা-ও নীরব দর্শক।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে ছেলের প্রস্রাব শেষ হল। সারা জায়গাটায় তখন জল জমে গিয়েছে। সেই জল থেকে মা ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন। তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

পরদিন দুপুর থেকে দলে দলে শহরবাসী তাঁর বাড়ির সামনে এসে ভিড় করলেন। সবাই তাঁর ছোট ছেলেটিকে একবার দেখতে চান। কারণ সে তাঁদের রক্ষা করেছে। গতকাল সে প্রস্রাব করে যে জায়গাটা ভাসিয়েছে, নাৎসী সৈন্যরা শহর ছেড়ে চলে যাবার সময় সেখানে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী টাইম-বোমা পুঁতে রেখে গিয়েছিল। তার প্রস্রাবের জলে সেটি অকেজো হয়ে পড়ে, আর ফাটতে পারে নি। ফলে তাঁরা বেঁচে গিয়েছেন।

সেই থেকে লিট্‌ল বয় ব্রাসেল্‌স শহরে ত্রাণকর্তার স্থান লাভ করেছে। তার স্মৃতিতে স্মারক নির্মিত হয়েছে। এবং এটি এখানে পর্যটকদের একটি শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। কারণ ব্যাপারটি অলৌকিক।

একবার থামে শঙ্কর। তারপরে জিজ্ঞেস করে—ঠিক কথা, আপনারা রেলিংটা ছুঁয়েছেন তো?

মাথা নেড়ে বলি—হ্যাঁ।

—ব্যস্‌ তাহলে আবার এ শহরে আসতে পারবেন।

আবার সেই কুসংস্কারের কথায় আসতে হয়। কিন্তু থাক গে,

তার চেয়ে আশায় থাকা ভাল যে, এ বিদায় শেষ বিদায় নয় আবাব আমি ফিরে আসব এই সুন্দর শহরে।

॥ দুই ॥

অবশেষে বিদায় নিলাম। বিদায় নিলাম গ্রঁদ প্লাসের কাছ থেকে। গ্রঁদ প্লাসের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া আর ব্রাসেল্‌স থেকে বিদায় নেওয়া একই কথা। অথচ আমরা এখনও শহরের ভেতর দিয়েই এগিয়ে চলেছি শহরতলীর দিকে। আমরা ওয়াটারলু যাচ্ছি।

নিজেদের গাড়িতে আমরা ব্রাসেল্‌স বেড়িয়ে গেলাম। কিন্তু বন্ থেকে রেল কিম্বা বাসে করেও অক্লেশে ব্রাসেল্‌স আসতে পারতাম। ব্রাসেল্‌স শহরে প্রধান রেলস্টেশন তিনটি—নর্থ, সেণ্ট্রাল, ও সাউথ। এঁরা বলেন—নোর (Nord), মিদি (Midi) ও স্যুদ্ (Sud)।

নেদারল্যাণ্ডস অর্থাৎ আমস্টারডাম থেকে ট্রেনগুলো তিনটি স্টেশনেই আসে। ফ্রান্সের ট্রেনগুলি আসে নর্থ এবং সাউথ স্টেশনে আর জর্মনীর ট্রেন আসে সেণ্ট্রাল স্টেশনে।

ব্রাসেল্‌স বিমানবন্দর শহর থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার। নর্থ ও সেণ্ট্রাল রেলস্টেশন থেকে সারাদিন বিশ মিনিট অন্তর বিমানবন্দরে ট্রেন যাতায়াত করে। ভাড়া ৫০ বেলজিয়াম ক্রঁা তার মানে ১.১১ আমেরিকান ডলার। খুবই শস্তা। কারণ ট্যাক্সি নিলে অন্তত ২২/২৩ ডলার লেগে যাবে।

ব্রাসেল্‌স শহরে ঘুরে বেড়াবার জন্য রয়েছে চমৎকার মেট্রো, বাস এবং স্ট্রীট-কার (অনেকটা ট্রামের মতো)। এইসব গাড়িতে শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে ২৮ ক্রঁা ভাড়া লাগে। দশবার এইরকম যাতায়াতের জন্য একটি কার্ড পাওয়া যায়, দাম ১৫৫ ক্রঁা মানে ৩.৪৪ ডলার।

শঙ্কর বলে চলে—আমি আপনাদের বলেছি যে য়ুরোপে ব্রাসেল্‌স সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর। তাহলেও কিন্তু এখানে অপেক্ষাকৃত শস্তায় থাকা-খাওয়ার কিছু ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে ইউথ হস্টেলের চারটি পর্যটক নিবাস। নামে ইউথ হস্টেল হলেও সব বয়সের নারী-পুরুষই সেখানে বাস করতে পারেন। চারটি নিবাসেই রেস্তরাঁ রয়েছে। দৈনিক ১০ ডলারে ডরমিটারী ও ২০ ডলারে সিঙ্গল-রুম পাওয়া যায়। ৩ ডলারে ব্রেকফাস্ট ও ৬ ডলারে ভরপেট লাঞ্চ কিম্বা ডিনার করা যায়।

শঙ্কর চুপ করে। মনে মনে তাকে ধন্যবাদ দিই। ওর সঙ্গে না এলে এত অল্প সময়ে দেখা হত না ব্রাসেল্‌স, জানা যেত না এসব কথা। যদিও শস্তায় থাকা-খাওয়ার খবর পেয়ে আমাদের কোন লাভ হল না। আমরা তো এখন ব্রাসেলস ছেড়ে চলে যাচ্ছি। যাচ্ছি ওয়াটারলু।

ওয়াটারলু! হ্যাঁ, য়ুরোপের কুরুক্ষেত্র। যেখানে য়ুরোপের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে, সেই ঐতিহাসিক স্থানটি দর্শন করতে যাচ্ছি। বৃটিশ বেলজিয়াম ও প্রুশিয় বাহিনীর সঙ্গে নেপোলিয়ান বোনাপার্তের সেই যুদ্ধক্ষেত্রটি ব্রাসেল্‌স শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। শঙ্কর এখন আমাদের সেখানেই নিয়ে চলেছে।

১৮১৩ সালে লাইপজিগের (পূর্ব জর্মনী) যুদ্ধে ফরাসী বাহিনীর পরাজয়ের পর থেকে নেপোলিয়ানের জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করে। তিনি ১৮১৪ সালের এপ্রিলে পারি (Paris) ছেড়ে এলবা দ্বীপে চলে যান। সবাই ভাবলেন, তিনি পার্থিব জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। কিন্তু রক্তে যাঁর সাম্রাজ্যলিপ্সা, তাঁর পক্ষে কি বানপ্রস্থ অবলম্বন করা সম্ভব? পরের বছর অর্থাৎ ১৮১৫ সালের ২০শে মার্চ তিনি আবার পারি ফিরে এলেন। গ্রেট বৃটেন, প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া প্রভৃতি বিরোধী দেশের শাসকগণ প্রমাদ গণলেন। ১৮১৫ সালের ২৫শে মার্চ তাঁদের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হল। স্থির হল তাঁরা প্রত্যেকে দেড়লক্ষ সৈন্য দিয়ে এক যুক্তবাহিনী গড়ে

তুলবেন। এই যুক্তবাহিনীর কাজ হবে নেপোলিয়ানকে ক্ষমতাচ্যুত করা। বেলজিয়ামও (তখন নেদারল্যাণ্ডস) এই যুক্তবাহিনীকে সাধ্যমত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করলেন।

অবশেষে চুক্তি অনুযায়ী বৃটিশ ও বেলজিয়াম সৈন্যরা ফ্রান্স—বেলজিয়াম সীমান্তে সমবেত হতে শুরু করলেন! তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রুশিয়ান, অস্ট্রিয়ান ও রাশিয়ান বাহিনী এসে পড়লেই তাঁরা একসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন পথে প্যারি অভিযান করবেন। বেলজিয়াম বাহিনীর নেতৃত্ব করছিলেন জেনারেল কুলচার আর বৃটিশ বাহিনীর নেতা ছিলেন আর্থার ওয়েলেসলী বা প্রথম ডিউক অব্ ওয়েলিংটন।

খবরটা যথাসময়ে নেপোলিয়ানের কানে এলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলেন অস্ট্রিয়ান এবং রাশিয়ান বাহিনী এসে পৌঁছবার আগেই তিনি বৃটিশ, বেলজিয়াম ও প্রুশিয়ান বাহিনীকে নির্মূল করে দেবেন। এপ্রিল মাসের মধ্যেই তিনি প্রায় পাঁচলক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করে সীমান্তে পৌঁছে গেলেন। অপরপক্ষ কিন্তু তখন পর্যন্ত খুবই হীনবল। কারণ বেলজিয়ামের এক লক্ষ বিশ হাজার, চুরানব্বই হাজার বৃটিশ ও পনেরো হাজার প্রুশিয়ান অর্থাৎ সব মিলিয়ে তাঁদের সৈন্য সংখ্যা অর্ধেকও নয়। তাছাড়া তুলনায় নেপোলিয়ানের সৈন্যরা ছিলেন যেমন যুদ্ধ-পটু তেমনি তাঁদের অস্ত্র-শস্ত্রও ছিলো অনেক ভাল।

তাহলেও ডিউক অব্ ওয়েলিংটন ওয়াটারলু প্রান্তরে নির্ভয়ে নেপোলিয়ানের মুখোমুখি হলেন। ১৮১৫ সালের ১৫ই জুন যুদ্ধ বেঁধে গেল। এই সময় অবশ্য আরও কিছু প্রুশিয়ান সৈন্য তাঁদের সঙ্গে যোগদান করলেন। কিন্তু তাতে উভয়পক্ষের শক্তির পার্থক্য সামান্যই ঘুচল।

যুদ্ধের প্রথম দিকে নেপোলিয়ান বেশ কিছু সুবিধে অর্জন করে ফেললেন। তিনি তিনদিকে তিন বাহিনী রেখে ওয়েলিংটনকে আক্রমণ করতে থাকলেন।

তিনদিন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে এলো ১৮ই জুন। সেদিন

সকাল সাড়ে এগারোটায় যুদ্ধ আরম্ভ হল। আর সেই যুদ্ধে ডিউক অব্ ওয়েলিংটন তাঁর অসাধারণ কৌশল ও নৈপুণ্যের প্রমাণ রাখলেন। অপরদিকে নেপোলিয়ান একটার পর একটা ভুল করতে থাকলেন। ডিউকের সুনিপুণ সৈন্য পরিচালনায় নেপোলিয়ানের তিন বাহিনী পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। ডিউক তাঁর সীমিত শক্তি দিয়ে পালাক্রমে তাঁদের ওপর আঘাত হানতে থাকলেন। বিকেল সাতটায় ফরাসী বাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল, তাঁদের পতন শুরু হল। এবং সন্ধ্যা সওয়া ন'টার সময় পরাজিত ফরাসী বাহিনী পালাতে শুরু করলেন। ডিউক এবং কুলচার বিজয় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন।

এই যুদ্ধে বৃটিশ ও বেলজিয়ামের পনেরো হাজার ও প্রুশিয়াব সাত হাজার সৈন্য মারা যান। অপর পক্ষে ফরাসীরা নিহত হয় পঁচিশ হাজার। আট হাজার ফরাসী সৈন্য বন্দী হলেন। তাঁদের ছ'শ বিশটি কামান বৃটিশ বাহিনীর হস্তগত হয়।

ওয়াটারলু যুদ্ধে পরাজিত হবার পরে নেপোলিয়ান একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়লেন। তিনি ক্ষমতাচ্যুত হলেন। তাঁকে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করা হল। সেখানে ছ' বছর দুঃসহ জীবন-যন্ত্রণা ভোগ করার পরে ১৮২১ সালে বাষট্টি বছর বয়সে নেপোলিয়ান দেহরক্ষা করেন। একনায়কের সেই শেষ পরিণতি দেখে নিশ্চয়ই সেদিন ফরাসী দেশের কিছু মানুষ অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি। কিন্তু য়ুরোপের ইতিহাস সেই বিয়োগব্যথা থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারে নি। পারলে নিশ্চয়ই বেনেদিতো মুসোলিনী এবং এডলফ্ হিটলারের অভ্যুত্থান ও পতন অনিবার্য হয়ে দেখা দিত না।

তাহলেও ওয়াটারলুর যুদ্ধ ইতিহাস রচনা করেছে। এবং সে ইতিহাস শুধু য়ুরোপের ইতিহাস নয়, সেই সঙ্গে এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার ইতিহাসও বটে। সেদিন ওয়াটারলু যুদ্ধের ফলাফল অন্যরকম হলে পরবর্তীকালে বৃটিশ সাম্রাজ্য এত বিস্তৃতি লাভ করতে পারত না। ফলে বিশ্ব ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত।

সেই ওয়াটারলু প্রান্তরের সামনে এসে আমাদের গাড়ি থামল। পথের পাশে একটি ছোট সাইনবোর্ড—'1815'। সামনেই কয়েক বর্গ কিলোমিটার প্রায় সমতল কৃষিক্ষেত্র। মাঝখানে একটি উঁচু ঢিবি।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে ঢিবির দিকে এগিয়ে চলি। আমার সারা শরীর শিহরিত হয়ে উঠছে। ঠিক যেমন শিহরণ অনুভব করেছিলাম কুরুক্ষেত্র কিম্বা হলদিঘাটে পদার্পণ করে। কিন্তু সে তো আমার স্বদেশ। এই বিদেশ-বিভূঁয়ে কেন আমার সেই একই অনুভূতি হচ্ছে?

ইতিহাস যে বড়ই অনুভূতিপ্রবণ। কার ইতিহাস, কোন দেশের ইতিহাস, সেটা বড় কথা নয়। ইতিহাস সর্বদাই ইতিহাস। জুলিয়াস সীজার আর পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরিণতি আমাকে সমব্যথী করে তোলে।

ভাবতে ভাবতে কখন সেই ঢিবির ওপরে উঠে এসেছি, খেয়াল করি নি। খেয়াল হল শঙ্করের কথায়। সে বলে—এই ঢিবিটার নাম Lion's Mound.

সেই সিংহের ঢিবির ওপরে দাঁড়িয়ে আমরা চারিদিকে বিস্তীর্ণ সমতলকে দেখি। আর ভাবি সেদিনের কথা। ১৮১৫ সালের ১৮ই জুন। প্রায় পৌনে দু'শ বছর আগে একদিন যেখানে সেই ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়েছিল, আজ সেটি নিতান্তই শান্ত সবুজ সমতল। কেবল একখানি মাঝারী আকারের বাড়ি রয়েছে দাঁড়িয়ে। সেখানি দেখিয়ে শঙ্কর বলে—মিউজিয়াম। কিন্তু এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

—কি আছে ওখানে? অহীন জিজ্ঞেস করে।

—পঞ্চাশ ফ্রাঁ প্রবেশমূল্য দিয়ে ঢুকতে হয় ওখানে। দেখা যায় ওয়াটারলু যুদ্ধকে অবলম্বন করে নির্মিত একটা ফিল্ম। আর যুদ্ধের ওপরে অঙ্কিত কয়েকখানি রঙীন দেওয়ালচিত্র।

জয়া ঘড়ি দেখে। বলে—চারটে বাজে। এখন চলো যাওয়া যাক, পথে লুক্সেমবুর্গে থামতে হবে।

—হ্যাঁ, চলো। শঙ্কর নামতে শুরু করে। আমরা ওকে অনুসরণ করি।

চলতে চলতে ভেবে চলি সেই কথা। সেদিনের সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামক্ষেত্রটি আজ নিতান্তই শান্ত সবুজ একটি সমতল। বিচ্ছিন্ন ভাবে নির্মিত কয়েকটি স্মৃতি-ফলক এবং একটা ভেঙে-পড়া খামারবাড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। না, আছে। আছে দমকা বাতাস। হাজার হাজার মানুষের অতৃপ্ত আত্মার দীর্ঘশ্বাস রূপে সে আমাকে অবিরত আঘাত করছে আর আমি কেবলি কেঁপে কেঁপে উঠছি। সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচরে এ এক বিচিত্র ও সূক্ষ্ম শিহরণ। চোখ বুজলেই আমি এই শব্দহীন সমতলে সংখ্যাতীত অশ্বারোহী সৈনিকের অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি হাজার হাজার বন্দুকের শব্দ আর শত শত কামানের গর্জন। শুনতে পাচ্ছি নেপোলিয়ান কিম্বা ডিউকের গুরুগম্ভীর আদেশ।

—শঙ্কুদা, বই কিনবেন নাকি? জয়ার কথায় বাস্তবে ফিরে আসি। দেখি, আমরা বড় রাস্তায় ফিরে এসেছি। ফিরে এসেছি পেট্রোল পাম্পের সামনে, আমাদের গাড়ির কাছে। এখানে রয়েছে রেস্তরাঁ আর গুটিকয়েক ছোট ছোট দোকান। সেখানে বই খেলনা ও নানা রকম ছোট-বড় স্মারক পাওয়া যাচ্ছে। তারই একটি দোকান দেখিয়ে জয়া কথাটা বলেছে।

জিজ্ঞেস করি—ইংরেজী বই পাওয়া যাবে?

—নিশ্চয়ই। শঙ্কর উত্তর দেয়—বেলজিয়ামে বেশ ইংরেজীর প্রচলন আছে। তাছাড়া আমেরিকান পর্যটকদের কল্যাণে এখন সব দেশে ইংলিশ টুরিস্ট-লিটারেচার পাওয়া যায়।

অতএব ওদের সঙ্গে একটা দোকানে আসি। দোকানের সামনে সাজিয়ে রাখা একখানি ছোট বই শঙ্কর আমার হাতে দেয়। বই-খানি বেলজিয়ামের ওপরে লেখা। আমি পাতা ওলটাতে থাকি। এক জায়গায় দেখছি লেখা রয়েছে—

'...You too will share the sentiments of Victor

Hugo, who lived near here to gather battle data for scenes in his "Les Miserables" and then wrote :

"Forty years have passed, and this corner of earth,
Waterloo, this solitary and funebral plain,
This sinister field—
Still trembles from having seen the fall of giants.!"

তাবপরে আরও একশ' তিরিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু আজও এখানে এসে আমি সেই একই কম্পন অনুভব করে গেলাম।

গাড়ি আবার ছুটে চলেছে। তবে এতক্ষণ চলছিল উত্তর-পশ্চিমে এখন দক্ষিণ-পূর্বে। অর্থাৎ এবারে আমরা ফিবে চলেছি জর্মনী। পথে পড়বে লুক্সেমবুর্গ।

তিনটি লুক্সেমবার্গকে জানি। পারি শহরের একটি অঞ্চলের নাম লুক্সেমবুর্গ। সেখানে মেট্রোবেলের স্টেশন রয়েছে। বেলজিয়ামের দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশটির নামও লুক্সেমবুর্গ। এটি বেলজিয়ামের বৃহত্তম প্রদেশ। তারই পশ্চিমে জর্মন ও ফরাসী সীমান্তে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র লুক্সেমবুর্গ। এখন আমরা সেই স্বাধীন রাষ্ট্র লুক্সেমবুর্গে চলেছি।

শঙ্কর সংক্ষেপে সেই দেশের কথাই বলে চলেছে—দেশটির আয়তন মাত্র ২৫৮৬ বর্গ কিলোমিটার। দেশে সবচেয়ে লম্বা অংশটি ৯০ কিলোমিটার আর সবচেয়ে চওড়া অংশটি ৫৮ কিলোমিটার। তার মানে দেশটি লম্বায় হাওড়া থেকে বালিচক আর চওড়ায় মেচেদা।

বেশ উর্বর দেশ। কারণ স্যুর (Sure) ও তার শাখানদী-সমূহ সারা দেশটিকে সুজলা করে তুলেছে। নদীগুলি সবই পূর্ব-বাহিনী হয়ে মোজেল নদীতে (Moselle) গিয়ে পড়েছে। পরশু এই মোজেলের তীরভূমি ধরে শুরু হবে আমাদের ব্ল্যাক-ফরেস্ট মানে কৃষ্ণারণ্যে যাত্রা।

লুক্সেমবুর্গ দেশটির এক-তৃতীয়াংশ মালভূমি, উচ্চতা ১৩০০ থেকে

১৫০০ ফুট। এই অংশে ১৮০০ ফুট উঁচু পর্যন্ত কয়েকটি শিখর রয়েছে। রয়েছে ঘন জঙ্গলে ছাওয়া উপত্যকার খাড়া ঢাল। মাল-ভূমির সমতল অংশে বেশ ভাল চাষ হয়। ফলে বহু গ্রাম রয়েছে।

মালভূমির নিচু অংশের গড় উচ্চতা ৯০০ ফুটের মতো। এই অংশে বৃষ্টি হয় এবং প্রচুর ফসল ফলে। সারা দেশেই মোটামুটি ভাল বৃষ্টি হয়। কোন কোন অংশে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০ ইঞ্চি। মোজেল উপত্যকায় বছরে ২৭ ইঞ্চির মতো বৃষ্টি হয়। দেশের একাংশে খুবই শীত পড়ে।

লুক্সেমবুর্গ ছিল নেদারল্যাণ্ডসের একটি বেশ বড় প্রদেশ। ১৮৩১ সালে প্রদেশটি ভাগ করে বৃহত্তর অংশটি স্বাধীন বেলজিয়ামকে দিয়ে দেওয়া হয়, ক্ষুদ্রতর অংশটুকুও লুক্সেমবুর্গ নামেই নেদারল্যাণ্ডসে থেকে যায়। ১৮৩৯ সালে নেদারল্যাণ্ডস এই অংশেরও সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়। ফলে লুক্সেমবুর্গ এই অঞ্চলের ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র রূপে আত্ম-প্রকাশ করে। ১৮৬৭ সালের লণ্ডন চুক্তিতে বেলজিয়ামের মতো লুক্সেমবুর্গকেও নিরপেক্ষ দেশ বলে মেনে নেওয়া হয়।

সুদীর্ঘ সাতান্ন বছর ধরে নিরপেক্ষ দেশ রূপে স্বীকৃতি পাবার পরেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকেই জর্মনী লুক্সেমবুর্গ অধিকার করে নেয়। ১৯১৯ সালে লুক্সেমবুর্গ স্বাধীনতা ফিরে পায়। ১৯২২ সালে সে বেলজিয়ামের সঙ্গে একটি শুল্কচুক্তি সম্পন্ন করে। এবং আগের মতই তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখে। তবু দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় জর্মনী আবার দেশটি দখল করে। কিন্তু এই যুদ্ধে লুক্সেমবুর্গ খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যুদ্ধের পরে কয়েক বছরের মধ্যেই লুক্সেমবুর্গ আবার সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হয়।

ছুটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পরে বেলজিয়ামের মতো লুক্সেমবুর্গও বুঝতে পারে, নিরপেক্ষ দেশ রূপে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই বেলজিয়ামের মতো সে-ও উত্তর আতলান্তিক চুক্তির সামিল হয়। পরবর্তীকালে নেদারল্যাণ্ডস ও বেলজিয়ামের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লুক্সেমবুর্গ বেনেলুক্স য়ুনিয়ন গঠন করেছে। বলা বাহুল্য এই দেশটি

য়ুরোপীয়ান ইকনোমিক কমিউনিটি (ই. ই. সি) এবং কাউন্সিল অব্ য়ুরোপের সদস্য।

আমি মাথা নাড়ি। কারণ স্ত্রাসবুর্গে, কাউন্সিল অব্ য়ুরোপের সদর দপ্তরে আমি লুক্সেমবুর্গের নাম ও পতাকা দেখেছি।

শঙ্কর থামতেই অহীন প্রশ্ন করে—লুক্সেমবুর্গের জনসংখ্যা কত?

—লাখ পাঁচেকের মতো।

—পাঁচ লক্ষের বেশি ভোটার নিয়ে তো আমাদের দেশে একটা পার্লামেণ্টারী নির্বাচন কেন্দ্র।

—আর এদেশের মানুষ ছাপান্ন জন পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত করেন। প্রতি কেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা মাত্র চার থেকে পাঁচ হাজার। অর্থাৎ দেশের মোট ভোটার সংখ্যা মাত্র আড়াই লক্ষের মতো।

একবার থামে শঙ্কর। কিন্তু আমরা কেউ কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই আবার বলতে শুরু করে—দেশের পাঁচ লক্ষ মানুষের মধ্যে এক লক্ষই বাস করেন রাজধানী লুক্সেমবুর্গ শহরে।

—কটা শহর আছে এদেশে? অহীন জিজ্ঞেস করে।

—লুক্সেমবুর্গ ছাড়া আরও ন'টি ছোট শহর।

—অধিবাসীদের প্রধান বৃত্তি কি?

—কৃষিকার্য।

—এ দেশের ভাষা কি?

—এ দেশের প্রায় সকলেই ফরাসী অথবা জর্মন জানেন। ১৮৩০ সাল থেকেই এই দুটি বিদেশী ভাষা এঁদের সরকারী ভাষা। তবে এদের একটি নিজস্ব ভাষাও আছে, নাম লেৎসেবুর্গেশ (Letzebur-gesch) ১৯৩৯ সাল থেকে এই স্থানীয় ভাষাটিও সরকারী ভাষা রূপে স্বীকৃত। এদেশে ভাষা নিয়ে কোন বিরোধ নেই।

মনে মনে ভাবি, 'অংরেজী হটাও' না করে আমরাও যদি প্রথমেই আন্তরিক ভাবে 'ত্রিভাষা' সূত্র মেনে নিতাম, তাহলে আমাদের দেশেও কোন ভাষা বিরোধের জন্ম হত না এবং আমাদের জাতীয় সংহতি অক্ষুণ্ণ থাকত।

শঙ্করও সেই কথা বলে—ভারতেও ভাষা নিয়ে কোন বিরোধ থাকত না যদি ইংরেজী, হিন্দী ও স্থানীয় ভাষাকে সমান মর্যাদা দান করা হ'ত।

আমরা মাথা নাড়ি। শঙ্কর বলতে থাকে—ধর্ম নিয়েও এদেশে কোন বিরোধ নেই। এঁদের শতকরা ৯৭ জনই রোমান ক্যাথোলিক বাকি তিনজন প্রোটেস্ট্যান্ট, অথবা ইহুদি। ধর্ম এদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ধর্ম নিয়ে এঁরা কখনও রাজনীতি করেন না এবং রাজনীতিকে এঁরা কখনই দেশের চেয়ে বড় করে তোলেন না।

বেলজিয়ামের মতো এখানেও রাজা আছেন। এখানকার সংবিধানও বেলজিয়ামের মতো। দেশের সার্বভৌমত্ব দেশবাসীর সম্পদ। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও আইনের সমান অধিকার এবং কাজের অধিকার সংবিধানের মূলকথা। পার্লামেন্ট নেতা নির্বাচন করেন। রাজা নেতাকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করেন। এবং রাজার অনুমতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী দশজনের মন্ত্রীসভা গঠন করে থাকেন।

ছ' বছর বয়সে প্রত্যেকটি শিশুকে স্কুলে ভর্তি হতে হয়। স্কুলের শিক্ষা বাধ্যতামূলক। উচ্চতর শিক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণত বেলজিয়ামে যেতে হয়। অনেকে নেদারল্যাণ্ডস, ফ্রান্স অথবা জর্মনীতেও যায়।

দেশের প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য ইস্পাত। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা আশি ভাগই ইস্পাত। প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ এঁরা নিজেরাই উৎপাদন করেন। তাহলেও দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। আর তাই বেশ কয়েকটি সার-কারখানাও রয়েছে এদেশে।

—আচ্ছা, এদেশের টাকার নাম কি ?

ফ্রাঁ। মূল্যমান বেলজিয়ামের ফ্রাঁ-এর সমান। জয়া জবাব দেয়।

অহীন আবার প্রশ্ন করে—এদেশের পরিবহন ব্যবস্থা কি নিজেদের ?

শঙ্কর উত্তর দেয়—হ্যাঁ। নিজস্ব রেল, বাস ও বিমানসংস্থা

রয়েছে। আপনি রেলযোগে লুক্সেমবুর্গ থেকে বেলজিয়াম নেদারল্যাণ্ডস, ফ্রান্স ও জর্মনী যেতে পারেন। বিমানে ব্রাসেল্‌স, আমস্টারডাম, ফ্রাঙ্কফুর্ট, পারি ও লণ্ডন। রাজপথ তো দেখতেই পাচ্ছেন। এদেরও অটোবান রয়েছে। রাজপথগুলির অধিকাংশই হাইওয়ে। রয়েছে নদীপথে পরিবহনের চমৎকার ব্যবস্থা। সরকার ডাক-তার ও টেলিফোন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। কিন্তু রেডিও এবং টেলিভিশন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বেসরকারী কম্পেনীকে।

আরও বোধকরি কিছু বলতে যাচ্ছিল শঙ্কর। কিন্তু সহসা চুপ করে যায় সে। না করেই বা উপায় কি? কোন রকম সঙ্কেত ছাড়াই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বৃষ্টি! না, বৃষ্টি নয়, ঝড়। একেবারে আমাদের দেশের কালবৈশাখীর মতো! বিদ্যুতের ঝিলিক আর মেঘের গর্জন, প্রবল বর্ষণ আর প্রচণ্ড বাতাস! গাড়ির সব জানলা বন্ধ। তবু বাতাসের গতিবেগ বেশ বোঝা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে গাড়িখানাকে উল্টে ফেলে দেবে।

গ্রীষ্মের উত্তর য়ুরোপ। এখনও সন্ধ্যে হতে অনেক দেরি। কিন্তু চারিদিকে যেন গোধূলি ঘনিয়ে এসেছে। শঙ্কর গাড়ির সব আলো জ্বেলে দিয়েছে। এদের গাড়ির আলো আমাদের দেশের গাড়ির আলোর চেয়ে অনেক শক্তিশালী। তবু সামনে সামান্যই দেখা যাচ্ছে। দেখব কেমন করে? বৃষ্টির জন্য যে দৃষ্টিগ্রাহ্যতা প্রায় শূন্যে পর্যবসিত। অথচ এখানকার অটোবানেও বেলজিয়ামের মতো শক্তিশালী আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। এবং বৃষ্টি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে পথের সব আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে।

তবু পথের সামান্য অংশই দেখা যাচ্ছে। তাই শঙ্কর তাড়াতাড়ি গাড়ি ডানদিকের লাইনে নিয়ে আসে। গতিবেগ কমিয়ে দেয়। এই সারির গতিবেগ ঘণ্টায় আশি কিলোমিটার। আরেকটু কমে চালালেও ক্ষতি হবে না। কারণ এখন সকলেই সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে।

এটি আমার দ্বিতীয় য়ুরোপ ভ্রমণ। দু' বছর আগে ছ'টি দেশে

ভ্রমণ করে গিয়েছি। এবারেও প্রায় একমাস হল ঘুরে বেড়াচ্ছি। কখনও বিমানে, কখনও রেলে, কখনও বা গাড়িতে। আমার ফরাসী বোন গাব্রিয়েলের মা মিসেস রিফ্‌স্তাল আমাকে নিয়ে গাড়িতে করে কয়েকদিন ধরে ফ্রান্সের পার্বত্য-বনভূমি এ্যাল্‌জাস অঞ্চলে প্রচুর ঘুরে বেরিয়েছেন। পথে একাধিক দিন বৃষ্টি পেয়েছি।* লণ্ডনেও তো মাঝে মাঝেই বৃষ্টির মধ্যে পড়ে গিয়েছি। জর্মনীতেও বৃষ্টি পেয়েছি। কিন্তু সেসব বৃষ্টির সঙ্গে এর কোন তুলনাই হয় না। এতো বৃষ্টি নয়, প্রলয়। প্রলয় শুরু হয়ে গেছে। মহাপ্রলয়।

অপরিচিত পথ। দ্রুতগামী পথ। এ পথে দুর্ঘটনার অপর নাম মৃত্যু। আমার জন্য চিন্তা করি না। জীবনের কাজ বলতে যতটুকু, তার প্রায় সবটুকুই হয়ে গেছে। এখন বেঁচে থাকা আর জীবন-যন্ত্রণা ভোগ করা প্রায় একই কথা। কিন্তু অহীন? সে বেচারী বেড়াতে এসেছে। বাড়িতে তার স্ত্রী ও ছোট-ছোট দুটি ছেলে-মেয়ে। শঙ্কর আর জয়া? ওরা শিশুপুত্রকে নিয়ে বেড়াতে এসেছে। আমার জন্যই এসেছে। যদি কিছু হয়, তাহলে আমিই তার জন্য দায়ী হব।

শঙ্কর কোন কথা বলছে না। একেবারে চুপ করে গেছে। একমনে গাড়ি চালাচ্ছে।

অহীন আর জয়াও নীরব। ওরাও নিশ্চয়ই জীবনদেবতাকে ডাকছে। হ্যাঁ, একমাত্র তিনিই আমাদের প্রকৃতির এই রুদ্ররোষের কবল থেকে রক্ষা করতে পারেন। নির্বিঘ্নে বন্‌ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। সেখানে তৃণাদি আমাদের পথ চেয়ে বসে রয়েছেন।

আমাদের মনের অবস্থা যা-ই হোক, গাড়িটা কিন্তু অবিচলিত। অনুগত শিষ্যের মতো সে শঙ্করের নির্দেশে ঝড়ের বাধা উপেক্ষা করে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চলেছে। সে যেন বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়।

না, শেষ পর্যন্ত জীবনদেবতারই জয় হল। প্রকৃতি হার মানলেন।

* লেখকের 'এক ফরাসী নগরে' বইখানি দ্রষ্টব্য।

ঝড় থামল, বৃষ্টি কমে গেল। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। শঙ্করের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

একটু বাদেই শঙ্কর সরব হল। স্বাভাবিক স্বরে বলতে শুরু করল— এসব দেশের ঝড়-বৃষ্টি এমনই। জর্মনীতেও হামেশাই এরকম হয়।

একবার থামে সে। তারপরে আবার বলে এ রাস্তাটার নাম E 40 মানে য়ুরোপ 80 এটা ব্রাসেল্‌স থেকে নামুরের (Namur) পথ। এই পথ থেকে E 23 মানে লুক্সেমবুর্গের পথ বের হয়েছে।

বৃষ্টি কমে যেতেই আবার দিনের আলো উঁকি দিয়েছে। এখন বিকেল সাড়ে ছটা। গ্রীষ্মের য়ুরোপে এসময় কড়া রোদ থাকার কথা। কিন্তু আকাশ মেঘলা বলে রোদ উঠতে পারে নি। তবে যথেষ্ট আলো রয়েছে। দৃষ্টিগ্রাহ্যতা স্বাভাবিক হয়েছে। আর তাই পথের আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব দেশের 'পাব্‌লিক ওয়ার্কস' দপ্তর দেখছি সর্বদা পাবলিকের সুখ-সুবিধার প্রতি নজর রাখেন।

পথের দুপাশে তেমনি বড় বড় গাছের সারি। এতক্ষণ বৃষ্টির জন্য বুঝতে পারি নি। এখন দেখছি পথে প্রচুর গাড়ি। আগামী কাল সোমবার। এঁরা বোধকরি 'উইক-এণ্ড' ভ্রমণ সেরে ঘরে ফিরছেন। য়ুরোপে জীবনের সংজ্ঞা ভিন্ন। আমাদের মতো তাঁদের জীবন চাকরি-বাজার-রান্না-খাওয়া আর সন্তান পালন নিয়ে নয়। ভোগ আর আনন্দ নিয়ে এদের জীবন এবং এঁরা বড়ই ভ্রমণ বিলাসী।

নামুরের পথ ছেড়ে আমরা E 23 ধরে এগিয়ে চললাম। লুক্সেমবুর্গ থেকে আবার আমাদের ফিরে আসতে হবে এখানে। এখান থেকে ঐ চল্লিশ নম্বর পথ ধরে জর্মনী যাবো।

নতুন পথে বেশিক্ষণ চলতে হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম ক্ষুদ্ররাষ্ট্র লুক্সেমবুর্গের রাজধানী লুক্সেমবুর্গ শহরে। ছবির মতো সুন্দর শহর। ঐশ্বর্যশালী শহর। মসৃণ ও ঝক্‌ঝকে প্রশস্ত পথ। পথের পাশে প্রাসাদের সারি। কোথাও স্তম্ভ-সুসজ্জিত সুপ্রাচীন অট্টালিকা আবার কোথাও গগনচুম্বী স্কাইস্ক্র্যাপার। মাঝে

মাঝে সবুজ পার্ক আর আলো ঝলমল মার্কেটিং কমপ্লেক্স।

এখানেও বেশ বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কাদা তো দূরের কথা, পথে কোথাও একটু জল পর্যন্ত জমে নেই। বরং বৃষ্টিস্নাত শহরটিকে ভারী সুন্দর লাগছে।

সদ্যস্নাতা কুমারীর মতই সে পবিত্র আর আকর্ষণীয়া।

বৃষ্টি বন্ধ হলেও আকাশ মেঘলা। এখানেও রোদ ওঠে নি। দিনের ম্লান আলোয় আমরা অম্লান লুক্সেমবুর্গে উপস্থিত হলাম। একদা এই শহরকে য়ুরোপের একটি সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গনগরী বলা হত। বলা হত 'জিব্রালটার অব্ দা নর্থ।'

—আজ আর সে দুর্গ নেই। ১৮৬৭ থেকে ১৮৮৩ সাল, এই দীর্ঘ ষোল বছর ধরে দুর্গটিকে ভেঙে ফেলা হয়েছে। সেই জায়গায় এখন এই সুবিশাল ও সুন্দর পার্ক আর সুপ্রশস্ত রাজপথ।

পথের পাশে গাড়ি থামিয়ে শঙ্কর বলছে কথাগুলো। আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। জয়া ছবি নেয়।

একটু বাদে শঙ্কর আবার বলে—আপনারা জানেন দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধেও এই ছোট দেশটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই শহরে অনতিদূরে অবস্থিত বাল্জ (Bulge) নামে একটা জায়গায় জেনারেল জর্জ প্যাটন ও তাঁর তৃতীয় বাহিনী নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে নাৎসি বাহিনীকে নির্মূল করে দিয়ে হিটলারের শেষ পরিণতির পথ বেঁধে দিয়েছিলেন। লুক্সেমবুর্গের কবরস্থানে তাঁর প্রিয় সৈন্যদের সমাধি দিয়ে পরিবেষ্টিত জেনারেল প্যাটনের সমাধি মন্দিরটি আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে সুরক্ষিত।

শঙ্কর গাড়ি ছাড়ে। অহীন বলে—শুনেছি, ১৯৬৩ সালে এই শহরের হাজার বছর পূর্ণ হয়েছে?

—হ্যাঁ। শঙ্কর উত্তর দেয়। তারপরে যোগ করে—অথচ দেখুন, কত সুন্দর সুন্দর বিশাল সব আধুনিক বাড়ি। এই যে ডানদিকের বড় বাড়িটা দেখছেন, এটা হল 'কোর্ট অব্ জাস্টিস অব্ দা য়ুরোপীয়ান কমিউনিটি'।

আমরা দেখি। সত্যই বাড়ি তো নয়, যেন একখানি রঙীন তৈলচিত্র।

—এ রকম আরও বহু বাড়ি রয়েছে এ শহরে।

—যেমন ?

—যেমন 'জেনারেল সেক্রেটারিয়েট অব্ য়ুরোপীয়ান পার্লামেণ্ট,' 'দা য়ুরোপীয়ান ইন্‌ভেস্টমেণ্ট্ ব্যাঙ্ক', 'অফিস অব্ দা' স্ট্যাটিসটিক্স এ্যাণ্ড দা য়ুরোপীয়ান মনেটারী ফাণ্ড' ইত্যাদি।

এতটুকু দেশ। অথচ দেশবাসীর বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা বলে দেশটি কতবড় আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের অধিকারী !

—এখন আমরা কোথায় চলেছি ? জয়া জিজ্ঞেস করে।

শঙ্কর উত্তর দেয়—প্রথমে ক্যাথিড্র্যাল অব্ নোত্র-দাম্। সেখান থেকে কিরসবার্গ।

—কি আছে সেখানে ? অহীন জিজ্ঞেস করে।

—ক্যাথিড্র্যালের ভেতরে একটি সমাধি মন্দির আছে। আমরা সেটি দর্শন করব।

—কাঁর সমাধি ?

—জাতীয় বীর জন ব্লাইণ্ড—এর। ১৩৪৬ সালে তিনি ক্রেসির (Cresy) যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।

—কিরসবার্গে কি আছে ?

—সেখানে ঠিক কিছু নেই। তবে সেখানকার মালভূমির ওপরে অবস্থিত য়ুরোপীয়ান সেণ্টার থেকে সারা শহরের অনিন্দ্যসুন্দর রূপটি দর্শন করা যাবে। দেখা যাবে শহরতলীর অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য।

একবার থামে শঙ্কর। তারপরে আবার বলে—অবশ্য জর্মনী যাবার পথেও আপনারা লুক্সেমবুর্গের অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পাবেন। এই শহরের সৌন্দর্যে আপনারা যেমন মুগ্ধ হয়েছেন, তেমনি এই ছোট দেশটির বনময় পাহাড়ের নির্জনতা, শান্ত-সুন্দর তৃণভূমির সবুজ সৌন্দর্য ও দুরারোহ পর্বতসঙ্কুল গিরিসঙ্কটের ধ্যানগম্ভীর রূপ আপনাদের মোহিত করবে।

—দেশ পরে দেখা যাবে, এখন শহর লুক্সেমবুর্গের কথা বলুন। অহীন অনুরোধ করে।

শঙ্কর শুরু করে—মাত্র লাখ খানেক মানুষের শহর। কিন্তু বহু-ভাবে এটি এক বিস্ময়কর মহানগরী। শহর থেকেই আপনি যেমন শহরতলীর পাথুরে পর্বতশিখর দেখতে পাচ্ছেন, তেমনি দেখতে পাচ্ছেন মধ্যযুগীয় দুর্গসমূহের ভগ্নাবশেষ। দেখছেন গথিক আর রনেসাঁস যুগের শিল্প-স্থাপত্যে সমৃদ্ধ এই অবিস্মরণীয় গির্জা। আর দেখতে পাচ্ছেন একটার পর একটা পুল পার হয়ে আমরা পথ চলেছি।

—সত্যই তাই। কত পুল আছে এ শহরে?

—পঁয়ষট্টিটি। শঙ্কর উত্তর দেয়।

একটা শহরে পঁয়ষট্টিটি সেতু! বিস্ময়কর ব্যাপার।

শঙ্কর বলে—এখনও দিনের আলো রয়েছে। সন্ধের পরে এই পুলগুলি আলো দিয়ে ভারী সুন্দর করে সাজানো হবে।

—শুধু পুলগুলো নয়, সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক অট্টালিকাগুলিও। প্রতি পর্যটন ঋতুতেই এমন করা হয়। জয়া যোগ করে।

শঙ্কর মাথা নাড়ে। তারপরে বলে—ঐতিহাসিক অট্টালিকা বলতে এখানে প্রধানত বোঝায় ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতকে নির্মিত 'গ্র্যাণ্ড ডুক্যাল প্যালেস' (Grand Ducal), সপ্তদশ শতকে নির্মিত 'দা কলেজ অব্ জেস্যুইটস' (Jesuits) ও 'দা ক্যাথিড্র্যাল অব্ নোত্র্-দাম্' (Notre Dame) এবং ১৭৫১ সালে নির্মিত বৈদেশিক দপ্তরের বাড়িটি। আর আছে রনেসাঁস যুগের কিছু মূর্তি।

—এগুলো কি আমরা দেখতে পাবো? অহীন প্রশ্ন করে।

শঙ্কর উত্তর দেয়—বাড়িগুলো সব দেখিয়ে দেব, কিন্তু মূর্তিগুলো দেখা যাবে না।

—কেন?

—সেগুলো দেখতে হলে গাড়ি থেকে নামতে হবে। কার-পার্কিং অনেক দূরে দূরে। অতখানি হেঁটে মূর্তি দেখার মতো সময় নেই আমাদের হাতে।

অতএব আমরা গাড়িতে বসেই লুক্সেমবুর্গকে দেখি আর শঙ্করের কাছে শুনি—লুক্সেমবুর্গের অপর নাম 'লিট্‌ল্ সুইজারল্যাণ্ড।' কিন্তু এ শহর দেখে আপনারা সে নামের সার্থকতা বুঝতে পারবেন না। ছোট সুইজারল্যাণ্ডকে জানতে হলে আপনাদের যেতে হবে স্যুর্ (Sure) উপত্যকায়। সেখানে আপনারা অপরূপ বনময় পাহাড় দেখতে পাবেন। দেখতে পাবেন একাদশ শতকের মঠ ও ত্রয়োদশ শতকের গির্জা। আর বহু দুর্গের ভগ্নাবশেষ। এগুলোর বয়স চার শ' থেকে হাজার বছর। দেখতে পাবেন একটি ছোট যাদুঘর, যে বাড়িতে একদা ফরাসী সাহিত্যের বেদব্যাস ভিক্তর উ্যাগো বাস করেছেন।

—আচ্ছা, ব্রাসেলস থেকে তো কেবল 'লিট্‌ল্ বয়' কিনেই কর্তব্য শেষ করলে। এখান থেকে অন্তত একটা ভাল স্মৃতিচিহ্ন নাও। এতক্ষণে জয়া মনের ভাব প্রকাশ করে।

শঙ্কর যেন বিপদে পড়ে। থতমত খেয়ে জবাব দেয়—কি কিনবে বলো ?

—এখানকার কোন বিখ্যাত জিনিস। যেমন চীনামাটির বাসন কিংবা কাঠের ওপরে খোদাই করা কোন সৌখীন জিনিস আর চকোলেট।

—আমি চকোলেট খাবো বাবা! শ্রীমান অমৃতও মায়ের দলে।

পিতা চুপ করে থাকতে চায়। কিন্তু পুত্র তাকে মৌনব্রত অবলম্বনের সুযোগ দেয় না। সে সিট থেকে নেমে শঙ্করের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার কাঁধে একখানি হাত দিয়ে বলে ওঠে—ও বাবা! গাড়ি থামাও না। আমি চকোলেট খাবো।

—হ্যাঁ, থামাচ্ছি বাবা! চকোলেটের দোকান দেখতে পেলেই গাড়ি থামাবো। তুমি এখন মায়ের পাশে গিয়ে বসো, নইলে পড়ে যাবে।

বয়স যা-ই হোক, চলতি গাড়িতে যে দাঁড়িয়ে থাকতে নেই, এ কথাটি ওর অজানা নয়। তাই সে পিতার আদেশ পালন করে।

মায়ের পাশে গিয়ে বসে আনন্দে বলে ওঠে—কি মজা, লুক্স-চকোলেট খাবো।

তার মানে লুক্সেমবুর্গের চকোলেট যে ভাল. এ খবরটা তার অজানা নেই। কেনই বা থাকবে? একে তো এযুগের ছেলে, তার ওপরে জন্মেছে জর্মনীতে।

সুতরাং শঙ্কর গাড়ি পার্ক করে। আমরা একটা বাজারে আসি। জয়া একজোড়া কাঠের ঘোড়া কেনে। খোদাই কাজটি ভারী সুন্দর। আখরোট কাঠের কাশ্মীরী জিনিসপত্রের কথা মনে পড়ছে আমার।

কেনাকাটার পরে আমরা একটা রেস্তরাঁয় আসি। চা ও পেস্ট্রি খেয়ে নিয়ে আবার গাড়িতে এসে বসি। বলা বাহুল্য তার আগে অহীন শ্রীমান অমৃতকে লুক্স-চকোলেট এনে দিয়েছে। তাই সে আর কিছুই মুখে দিল না। কারণ সে চা খায় না এবং পেস্ট্রি নাকি তার ভালো লাগে না। আর চকোলেট হাতে পেলে কারই বা তা লাগে?

রাত এগারোটায় আমরা কোব্‌লেঞ্জ (Koblenz) এলাম। রাইন আর মোজেল নদীর সঙ্গমে সমৃদ্ধ জর্মন শহর কোব্‌লেঞ্জ।...

কিন্তু কোব্‌লেঞ্জের কথা আজ নয়। পরশু কৃষ্ণারণ্যে যাবার পথে আমরা আবার এখানে আসব। তখন ভাল করে দেখে নেওয়া যাবে পশ্চিম-জর্মনীর এই জেলাসদরটিকে। এখন যে জন্য এখানে যাত্রা বিরতি, সেই কাজটুকু করে নেওয়া যাক।

প্রধান কাজ তেল নেওয়া। তারপরে ডিনার করা। কারণ এখান থেকে বন্ যেতে একঘণ্টার ওপরে লাগবে। অত রাতে তৃণাদিকে কষ্ট দেওয়া উচিত হবে না।

তেল নেওয়া হলে গাড়ি রেখে আমরা রেস্তরাঁয় আসি। আমাদের একটা টেবিল্ দখল করতে বলে শঙ্কর তৃণাদিকে টেলিফোন করতে যায়।

একটু বাদে ফিরে এসে বলে—মাসি এখানে ডিনার করতে বারণ

করলেন। বললেন, হালকা কিছু খেয়ে নিয়ে আমরা যেন তাড়াতাড়ি চলে যাই, তিনি আমাদের রান্না করে রাখবেন।

—মাসির কষ্ট হবে। জয়া বলে—তবে আমাদের ভালই হল।

—কেন বলো তো? বুঝতে পারি না ওর কথা।

জয়া জবাব দেয়—এখানে খেলে তো সেই স্যুপ স্যাণ্ডুইচ কিম্বা হ্যামবার্গার আর পুডিং ইত্যাদি অখাদ্যগুলো খেতে হত। আর মাসি আমাদের জন্য ডাল-ভাত আলুসিদ্ধ রান্না করে রাখবেন।

অগত্যা কোল্ড ড্রিংকস আর কেক খেয়েই কোব্‌লেঞ্জ থেকে বিদায় নিতে হল। গাড়ি ছাড়ার আগে ঘড়ি দেখে শঙ্কর। বলে —বারোটা বাজতে দশ, তার মানে আমরা রাত একটা নাগাদ বন্‌ পৌঁছে যাবো।

—তার মধ্যে মাসিরও রান্না শেষ। গিয়েই গরম ভাত পাওয়া যাবে।

শ্রীমতী জয়া বাঙাল হলেও বছর দশেক জর্মনীর স্থায়ী বাসিন্দা। তবু আলুসিদ্ধ সহযোগে গরম ডাল-ভাতের প্রতি আকর্ষণ তার কিছুমাত্র কমে নি। ভেতো বাঙালী আর কাকে বলে?'

রাতে অটোবান থেকে শহরগুলি ভারী সুন্দর দেখায়। সর্বত্রই অটোবান শহরের বাইরে দিয়ে গিয়েছে। উঁচু পথ থেকে আলো ঝলমল নগরগুলিকে স্বপ্নপুরী বলে মনে হয়। মনে হয় মাটির পৃথিবী নয়, সেখানে লক্ষ তারার দেয়ালী।

তাই দেখতে দেখতে আমরা রাত একটার একটু আগেই বন্‌ শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেলাম। সত্যই শঙ্করকে সাবাস দিতে হবে শ' সাতেক কিলোমিটার গাড়ি চালিয়েছে। মাঝখানে ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। তবু সে ঠিক সময়ে আমাদের বন্‌ নিয়ে এসেছে।

অটোবান ছেড়ে গাড়ি শহরের পথ ধরে। আমরা সেই লক্ষ তারার দেয়ালীর দিকে এগিয়ে চলেছি।

অবশেষে বন্‌ শহরে প্রবেশ করি। শঙ্কর আবার ঘড়ি দেখে। বলে—এখনো একটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি আছে। আমরা

তারই মধ্যে মাসির বাড়ি পৌঁছে যাবো।

—আর গিয়েই গরম ভাত পেয়ে যাবো।

জয়া সেই একই কথা বলে। বেচারীর বোধকরি খুবই খিদে পেয়েছে। আর শুধু ওকে বলেই বা কি হবে? সবারই খিদে পেয়েছে। এবং গরম ভাত পেলে প্রত্যেকেই খুশি হব।

কিন্তু যিনি আজ বেলজিয়ামের ঝড়ে আমাদের রক্ষা করেছেন, সেই কৌতুকপ্রিয় দুষ্টু দেবতাটি তখন বোধকরি অলক্ষ্যে বসে হেসে নিচ্ছিলেন। কারণ গাড়ি চলছে তো চলছেই। শঙ্কর গাড়ি থামাবার নামটি করছে না। পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট করে আধঘণ্টা কেটে গেল। আমার ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। বলে ফেলি—এখনও তৃণাদির বাড়ি আসছে না কেন?

—আমার মনে হচ্ছে, তুমি পথ ভুল করেছো। জয়াও বলে ওঠে।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে। এতক্ষণে কথা বলে শঙ্কব।

পথ ভুল হয়েছে। এত রাতে অচেনা শহরে পথ ভুল! আমি প্রমাদ গণি। কিন্তু কোন কথা বলি না। অহীনও নীরব থাকে। এ অবস্থায় আমাদের কোন কথা বলা ভাল দেখাবে না।

শঙ্কর কি যেন একটু ভাবে। তারপরে গাড়ি থামিয়ে আলো জ্বালে। একখানি ম্যাপ বের করে কিছুক্ষণ ধরে দেখে। তারপরে জয়াকে বলে—দেখো তো, এই ফ্রিয়েড্‌স্‌ডরফ্যের্‌ স্ট্রাসে যেতে হলে কোনদিকে যাওয়া উচিত হবে।

জয়া উঠে দাঁড়িয়ে মানচিত্রখানি দেখে। তারপরে বলে—কিন্তু আমরা এখন কোথায় আছি?

—তাই তো বুঝতে পারছি না।

—তাহলে তুমি পথ খুঁজে পাবে কেমন করে?

—কাউকে জিজ্ঞেস করলে হয় না। অহীন সবিনয়ে প্রস্তাব করে।

কথাটা আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু আমি বলতে পারি নি। কারণ য়ুরোপে আমি কাউকে বড় একটা পথের কথা জিজ্ঞেস করতে

দেখি নি। য়ুরোপের প্রত্যেক দেশেই পথে পথে পথচলার চমৎকার নির্দেশিকা থাকে। আর সর্বত্র বিনামূল্যে স্থানীয় মানচিত্র পাওয়া যায়। সবাই তারই সাহায্যে দেখে-শুনে বুদ্ধি খাটিয়ে চলা-ফেরা করেন।

আর তাই বোধকরি শঙ্কর বলে ওঠে—না না, জিজ্ঞেস করার দরকার হবে না। আমি তো আজ বন্ শহরে নতুন আসি নি। মাসি এই বাড়ি নেবার পরেও, দুবার এসে গিয়েছি। পথে কোথাও একটা গাইড-ম্যাপ পেলেই মাসির বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে।

সে আবার গাড়ি ছাড়ে। গাড়ি চলতে থাকে, কখনো সোজা, কখনো বাঁয়ে, কখনো বা ডাইনে। কিন্তু কোথায় গাইড-ম্যাপ?

শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল একটা। পথের ধারে সাইনবোর্ডের আকারে বেশ বড় একখানি মানচিত্র। ইঞ্জিন বন্ধ করে শঙ্কর নেমে যায় গাড়ি থেকে। জয়াও তার সঙ্গে যায়। আমি ঘড়ি দেখি। সে কী! এ যে আড়াইটে বাজে! তার মানে আমরা দেড় ঘণ্টা ধরে বন্ শহরের পথে বনবন করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আচ্ছা, এটা কি বন্ শহর, কোলন নয় তো?

ওরা ফিরে আসে। দুজনে জায়গায় বসে। তারপরে শঙ্কর বলে —না! কোন লাভ হল না। ম্যাপটায় শহরের যে অংশ রয়েছে, তার মধ্যে ফ্রিয়েডস্ডরফ্যের্ স্ট্রাসে দেখতে পেলাম না।

শঙ্কর গাড়ি ছাড়ে, গাড়ি চলতে থাকে। আমরা চুপ করে থাকি। ওরা আমাদের বেড়াতে নিয়ে এসেছে। আমাদের পক্ষে কোন আকুলতা প্রকাশ করা উচিত হবে না।

একটু বাদে জয়া কথা বলে—কাউকে একবার জিজ্ঞেস করে নিলে পারতে।

কথাটা বোধকরি এখন আর শঙ্করের অপছন্দ নয়। তবু সে বলে—কাকে জিজ্ঞেস করব বল? পথে যে লোকজন নেই। যদি দুয়েকজনকে পাওয়াও যায়, তারা তো স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে না। হয় ভুল পথ দেখাবে, নয় অন্য ঝামেলা বাঁধাবে।

জয়া আর কিছু বলতে পারে না। গাড়ি চলতে থাকে। গাড়ি তো চলছে প্রায় দু-ঘন্টা ধরেই, কিন্তু পথ যে ফুরোচ্ছে না।

কিছুক্ষণ বাদে শঙ্কর নিজেই বলে ওঠে—একমাত্র একটা পোলিৎসাইভাখে (Polizeiwache), নিদেনপক্ষে একজন পোলিৎসিষ্ট (Polizist)-এর দেখা পেলে মাসির বাড়ির পথটা জেনে নেওয়া যেত।

—তাঁরা কাঁরা। আমি প্রশ্ন করি।

শঙ্কর অথবা জয়া কিছু বলতে পারার আগেই অহীন বলে ওঠে—পুলিশ চৌকি কিম্বা পুলিশ কনস্টেবল।

অহীন কেমিস্ট্রীর ডক্টরেট। যে কোন বিজ্ঞানীরা কাছে জর্মনী তীর্থভূমি। তাই সে জর্মনীতে বেড়াতে আসার আগে প্রয়োজনীয় জর্মন শিখে এসেছে।

কিন্তু জর্মনীর বাসিন্দা শঙ্কর রায় যে জর্মনীর রাজধানীতে তার মাসির বাড়ি খুঁজতে গিয়ে রাত কাবার করে ফেলল। রাত তিনটে বাজে।

ব্যাপারটা বড়ই বিস্ময়কর। শঙ্কর বহুবার বন্ এসেছে। আমাদের চোখে য়ুরোপের শহরগুলিতে সব রাস্তাই মোটামুটি একরকম। এক একটি পথের বাড়িগুলিও তাই। কিন্তু শঙ্করের চোখে তো তা নয়। শঙ্কর কেন সারারাত ধরে এমন দিশাহারা পথিকের মতো ঘুরপাঁক খাচ্ছে?

অদৃষ্ট খারাপ হলে যা হয়, আধঘন্টা ঘুরেও কোন পুলিশচৌকি চোখে পড়ল না। এমন কি কোন পুলিশ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না। এদেশ থেকে কি চুরি ডাকাতি রাহাজানি বলাৎকার ইত্যাদি যাবতীয় অপরাধ অদৃশ্য হয়েছে!

বোধকরি হয় নি। কারণ শেষ পর্যন্ত দুজন পুলিশের দেখা পাওয়া গেল। আর তাঁদের দেখতে পেল জয়া। পেয়ে চিৎকার করে উঠল। অনেকটা স্বর্গ হাতে পাবার মতো। তবে ততক্ষণে রাত সাড়ে তিনটা বেজে গিয়েছে।

তা যাক্ গে। শেষ পর্যন্ত সেই যুগল-পুলিশের পাশে এসে গাড়ি থামায় শঙ্কর। ওঁরাই এগিয়ে আসেন আমাদের কাছে। বোধ করি বুঝতে পেরেছেন, আমরা বিপদে পড়েছি।

শঙ্কর ও জয়া জানলা খোলে। তারা আমাদের বিপদের কথা বলে। কোন্ পথে তৃণাদির বাড়িতে যাবো, জিজ্ঞেস করে।

না, বলতে পারেন না ওরা। শঙ্কর ও জয়া যথাসাধ্য জায়গাটার পরিচয় দেবার চেষ্টা করে। পুলিশ দুজন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। কিন্তু কোন হদিশ দিতে পারেন না। অর্থাৎ আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম।

অসহায় শঙ্কর গাড়ির জানালা বন্ধ করতে যায়। বাধা দেয় জয়া। সে বাংলায় বলে ওঠে—আচ্ছা আমরা এখন কোথায় আছি, একটু জেনে নিলে হত না?

—তাতে কি লাভ হবে?

আমরা কোথায় আছি জেনে নিয়ে মাসিকে ফোন করলে, তিনি আমাদের পথ বলে দিতে পারতেন। মাসি যে বহুকাল এই শহরে আছেন।

প্রস্তাবটা পছন্দ হয় শঙ্করের। সে পুলিশ যুগলের কাছে সেই কথাই জানতে চায়। ওরা বলেন, আমরা এখন Friedric Strasse নামে একটা রাস্তার ওপরে রয়েছি। এই রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে গেলেই পথের বাঁদিকে Friedens Platz দেখতে পাবো।

ওঁদের দুজনকে ধন্যবাদ দিয়ে শঙ্কর আবার গাড়ি ছাড়ে। ওঁরা ঠিকই বলেছেন। খানিকটা এগিয়েই Friedens Platz. আর তার সামনেই একটা টেলিফোন বুথ পেয়ে যাই।

য়ুরোপের সব দেশে সর্বত্র এইরকম পাবলিক টেলিফোন বুথ রয়েছে। পথের পাশে সুন্দর কাচের ঘর। পয়সা দিয়ে সেখান থেকে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় ফোন করা যায়। এবং ফোনগুলি কখনই অসুস্থ হয়ে পড়ে না। আর কেউ কখনো এই বুথগুলি থেকে কোন জিনিস বাড়ি নিয়ে যায় না। কারণ টেলিফোন জনজীবনের

একটি অত্যাবশ্যক বস্তু। এদেশে প্রত্যেক পরিবারের ফোন থাকে এবং ফোন নম্বর ছাড়া কারও ঠিকানা সম্পূর্ণ নয়।

ফোন পেয়ে তৃণাদি যেন আকাশ হাতে পেলেন। খুবই স্বাভাবিক। তিনি আশা করেছিলেন, আমরা রাত একটা নাগাদ বাড়ি পৌঁছে যাবো আর এখন ভোর চারটে। দেরি হলেই দুর্ঘটনার আশঙ্কা আর অটোবানে দুর্ঘটনা মানেই মৃত্যু।

যাক গে, তৃণাদি নিশ্চিন্ত হলেন। শঙ্কর ও জয়া দুজনকেই তিনি ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন, কোন্ পথে কিভাবে আমরা তাঁর বাড়ি পৌঁছব? শঙ্কর ম্যাপ খুলে বুঝে নিল।

না, এবারে আর কোন ভুল হল না। এবং অপেক্ষাকৃত আস্তে গাড়ি চালিয়েও শঙ্কব আমাদের বিশ মিনিটের মধ্যে টেগোর ইন্স্টিটিউটের সামনে পৌঁছে দিল।

তৃণাদি ড্রয়িংরুমে বসেছিলেন। তাব মানে আমাদের মতো তিনিও সারারাত জেগে রয়েছেন।

গাড়ির শব্দ পেয়েই তিনি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। জয়ার কাছ থেকে অমৃতকে কোলে তুলে নিলেন। তারপরে সহাস্যে জানালেন—যদিও এখন ভোর 'ফোর-টুয়েন্টি', তাহলেও ভাত গবম রেখেছি।

জয়ার সঙ্গে আমরাও খুশি হয়ে উঠি। গরম ভাতের খবর পেয়ে সব যাত্রা-যন্ত্রণা জল হয়ে গেল। ভেতো বাঙালী আর কাকে বলে?

॥ তিন ॥

"পশ্চিম-জর্মনীর রাজধানী বনবাসী হতে চললেন শুনে পাঠক যেন বিচলিত না হন। এ 'বনে'র উচ্চারণ 'ঘরে'র মত। বাংলা উচ্চারণের অলিখিত আইন অনুযায়ী 'ন' অথবা 'ণ' পরে থাকিলে একমাত্রিক শব্দে 'অ' কারটি 'ও' কারে পরিণত হয়। যথা—মন, বন, উচ্চারিত হয় মোন, বোন,—ইত্যাদিরূপে। কিন্তু এই জর্মন Bonn শব্দের উচ্চারণে 'ব'য়ের স্বরবর্ণটি 'ঘরে'র অ-কারের মত উচ্চারিত হয়। তাই পরাধীন জর্মনী আজ বনে রাজধানী পেয়ে যেন ঘর পেয়েছে একথা অনায়াসে বলা যায়।

কাগজে বেরিয়েছে বনের লোকসংখ্যা এক লক্ষ। আমাদের দেশে যেমন বলা হয়, পাঁচ বৎসর লালনা করবে, দশ বৎসর তাড়না করবে এবং ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করলে পুত্রের সঙ্গে মিত্রের ন্যায় আচরণ করবে, জর্মনীতে ঠিক তেমনি আইন, কোনো শহরের লোকসংখ্যা যদি এক লক্ষে পৌঁছে যায় তবে তিনি সাবালক হয়ে গেলেন, তাঁকে তখন 'গ্রোস-স্টাট্' বা বিরাট নগররূপে আদরকদর করে বার্লিন ম্যুনিক কলোন হামবুর্গের সঙ্গে একাসনে বসাতে হবে। অর্থাৎ মার্কিন ইংরেজ কর্তাদের মতে বন বিরাট নগর এবং জর্মনীর রাজধানী তাঁরা বিরাট নগরেই স্থাপনা করেছেন।

কিন্তু এই কেঁদে কুকিয়ে টায়ে-টায়ে এক লক্ষী শহরেই রাজধানী কেন করতে হল? আমি বন শহরে বহু কর্মক্লান্ত দিবস এবং ততোধিক বিনিদ্র যামিনী যাপন করেছি। বনের হাড়হদ্দ আমি বিলক্ষণ জানি। তার লোকসংখ্যা কি কৌশলে ১৯৩৮ সালে এক লক্ষ করা হয়েছিল সেও আমার অজানা নয়। এক-লক্ষী হয়ে সাবালকত্ব পাবার জন্য বন কায়দা করে পাশের একখানা গ্রামকে আদমশুমারীর সময় আপন কণ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছিল—যদিও সে গ্রামটি বনের উপকণ্ঠে অবস্থিত

নয়, দু'য়ের মাঝখানে বিস্তর যব-গমের তেপান্তরী ক্ষেত।

আসল তত্ত্ব হচ্ছে বন রুশ সীমান্ত থেকে অনেক দূরে। মার্কিন ইংরেজ ধরে নিয়েছে আসছে লড়াইএ জর্মনী রুশের বিরুদ্ধে লড়বে এবং তখন রাজধানী যদি রুশ সীমান্তের কাছে থাকে, তবে তাতে মেলা অসুবিধা—প্যারিশ ফ্রান্সের উত্তর সীমান্তে থাকায় তাকে যেমন প্রতিবারেই মার খেতে হয়, বেড়ালের মত রাজধানীর বাচ্চা নিয়ে কখনো লিয়ে"। কখনো ভিশিময় ঘুরে বেড়াতে হয়।

কিন্তু বনে রাজধানী নির্মাণে আরেকটি মারাত্মক তথ্য আবিষ্কৃত হয়ে গেল। বেলজিয়ম যে রকম প্রতিবার জর্মনীকে ঠেকাতে গিয়ে বেধড়ক মার খেয়েছে, এবার জর্মনী রুশকে ঠেকাতে গিয়ে সেইরকম ধারাই মার খাবে। বার্লিন গেছে, ফ্রাঙ্কফুর্ট যাবে, বনও বাঁচবে না।

কিন্তু থাক এসব রসকষহীন রাজনীতি চর্চা। বরঞ্চ এসো সহৃদয় পাঠক, তোমাকে বনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

এপারে বন, ওপারে 'সিবেন গেবির্গে' অর্থাৎ সপ্তশ্রীলাচল। মাঝখানে রাইন নদী। সে নদীর বুকের উপর দিয়ে জাহাজ চড়ার জন্য প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক তামাম ইউরোপ আমেরিকা থেকে জড়ো হয়। নদীটি এঁকে-বেঁকে গিয়েছে, দুদিকে সমতল জমির উপর গম-যবের ক্ষেত, মাঝে মাঝে ছবির মত ঝকঝকে তকতকে ছোট্ট ছোট্ট ঘরবাড়ি, সমতল জমির পিছনে দু সারি পাহাড় নদীর সঙ্গে সঙ্গে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে—মেঘমাশ্লিষ্টসানুং।..."

ওপরের এই লেখাটি যে আমার নয়, এটি বুঝতে বোধ করি কোন অসুবিধে হয় নি। লেখাটি সুপণ্ডিত ও সুরসিক সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের। তিনি কয়েক বছর এই বন্ শহরে বাস করেছেন এবং এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ডক্টরেট হয়েছেন। তার চাইতেও বড় কথা তিনি আমার মতো বহু বাঙালের সঙ্গে বন্ শহরের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

সকাল ন'টায় ঘুম ভেঙেছে। ঘুমের কোন দোষ নেই। কারণ ভোর 'ফোর টুয়েন্টি'-তে বাড়ি পৌঁছে গরম ভাত খেয়ে শুয়ে পড়তে

সকাল 'ফাইভ টুয়েন্টি' বেজে গিয়েছিল। তার মানে নিদ্রাদেবী চার-ঘণ্টাও আমার দখল পান নি।

কিন্তু ঘুম ভাঙার পরে আমি ঘুমের কথা ভাববার অবকাশ পাই নি। ঘুম চোখে আলী সাহেবের কথা ভাবছিলাম। তিনিই যে তাঁর অমর লেখনীর মাধ্যমে আমার সঙ্গে এই বন্ শহরের প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

তাহলেও আর তাঁর কথা ভাবা গেল না। উঠে পড়তে হল। অহীনকেও জাগাতে হল। দিলওয়ার এসে গিয়েছে।

বাংলাদেশের ছেলে দিলওয়ার। বয়স বছর ত্রিশ। প্রায় বছর দশেক হ'ল এখানে বাস করছে। রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছে। আরও বেশ কিছু বাংলাদেশী যুবক তার মতো এখানে বসবাস করছে। কেউ কেউ জর্মন মেয়ে বিয়ে করে স্থায়ী হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের কি অভিযোগ জানা নেই আমার। তবে এদের আমি কিছুতেই সন্ত্রাসবাদী বলে ভাবতে পারি না। দু'বছর আগেও ওদের দেখে গিয়েছি! এবারেও দেখছি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এরা সমান শ্রদ্ধাশীল রয়েছে। এদেশে বঙ্গসংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার সাধনায় তারা তৃণাদির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায়।

মুখ-হাত ধুয়ে আমি ও অহীন ভেতর বাড়িতে আসি। কিন্তু তার আগে তৃণাদির বাড়ির একটু বর্ণনা দেওয়া দরকার। আগেই বলেছি, বাড়ির সামনে রাস্তাটির নাম ফ্রিয়েসডরফ্যের স্ট্রাসে। স্ট্রাসে মানে স্ট্রীট বা পথ। বানান 'strasse'.

তৃণাদির বাড়ির রাস্তাটা প্রকাণ্ড কিছু না হলেও মোটামুটি চওড়া পথ। পথের ধারে নেমপ্লেট—'Tagore Institut' পথের পাশে বড় বাড়িটার ঠিক পেছনে তৃণাদির বাড়ি। একটা গলি পার হয়ে পৌঁছতে হয়। গলিতে গাড়ি চলতে পারে। বাড়ির সামনে এক-ফালি অঙ্গন। আঙ্গিনার দুপাশ জুড়ে ইংরেজি 'এল' অক্ষরের আকারে একখানি একতলা বাড়ি। অপর দুটি পাশে সবুজ গাছের বেড়া। আঙ্গিনাটুকু তৃণাদির গ্যারেজ-কাম্-গার্ডেন। প্রচুর ফুলগাছ

লাগিয়েছেন। তাতে নানা রঙের ফুল ফুটেছে। অর্থাৎ বন্ শহরের টেগোর ইন্‌স্টিটিউটের পরিবেশটি মোটামুটি শান্তিনিকেতনী।

বাড়িখানি দুটি অংশে বিভক্ত। সামনের অংশটিতে বড় দুখানি বেডরুম, একখানি ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং রুম, রান্নাঘর ও বাথরুম। এই অংশই তৃণাদির বাসগৃহ। অপরাংশ বাথরুম-সংলগ্ন প্রকাণ্ড একখানি হলঘর। ঘরের দুপাশে দুখানি ডিভান ও কয়েকখানি চেয়ার এবং একখানি টেব্‌ল। অপর দুপাশে দেওয়াল ঘেঁষে দুটি লম্বা বুক্‌-শেলফ্‌। প্রায় সবই রবীন্দ্রনাথের বাংলা ইংরেজী ও জর্মন বই। ঘরের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ ও বেথোফেন সহ কয়েকজন জর্মন ও ভারতীয় মনীষীর ছবি।

ঘরের মাঝখানে কার্পেট পাতা। সেখানে নানা রকমের ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র—বীণা এস্রাজ সরোদ সেতার তানপুরা ঢোল খোল করতাল বাঁশি ও তবলা ইত্যাদি।

বেশ কয়েকজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির পদধূলিতে ধন্য হয়েছে এই ইন্‌স্টিটিউট। এখানে এসেছেন সুসাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল, অধ্যাপক ড. সোমেন্দ্রনাথ বসু ও তাঁর স্ত্রী অধ্যাপক ড. মঞ্জুলা বসু, বাউল পূর্ণচন্দ্রদাস, সেতারবাদক নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত রবিশঙ্কর প্রমুখ।

ইন্‌স্টিটিউটের এই ঘরখানিতেই আমার এবং অহীনের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া সবই বাড়ির অপর অংশে। শঙ্কর আর জয়াও সেই অংশে রয়েছে। ওরা এখনও ঘুমুচ্ছে। ঘুমুক গে। গৌরের ফ্লাইট পৌঁছবে সেই দুপুর বারোটায়। তাকে কোলন বিমানবন্দর থেকে নিয়ে আসা ছাড়া শঙ্করের আজ আর কোন কাজ নেই। ওরা আমাদের সঙ্গে বন-ভ্রমণে বের হচ্ছে না। কেনই বা হবে? ওরা যে বহুবার বন্ এসেছে।

আমরা ডাইনিংরুমে এসে বসি। তৃণাদি কিচেনে কাজ করছেন আর দিলওয়ার বাপির কাছে। এই দেখো! বাপিকে সুপ্রভাত জানানো হয় নি। তাড়াতাড়ি উঠে তৃণাদির ঘরে আসি। দিলওয়ার

বাপির পাশে বসে তার সঙ্গে খেলা করছে।

তৃণাদির একমাত্র সন্তান বাপি। বয়স বছর পঁচিশ। দুধে-আলতায় গায়ের রঙ। মুখখানি যেমন সুন্দর, তেমনি মিষ্টি। একবার তাকালেই কেমন একটা মায়া পড়ে যায়। অথচ ভগবানের অকারণ নিষ্ঠুরতায় সে অবোধ অচল ও মুক। হাতদুটি বাদ দিলে শরীরের উর্ধ্বাংশ সম্পুর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু নিম্নাঙ্গ বড়ই ক্ষীণ। হাতে সামান্য শক্তি থাকলেও পা-দুটি একেবারে শক্তিহীন। ফলে সে দাঁড়াতেই পারে না। তাকে সর্বদা বসে কিম্বা শুয়ে থাকতে হয়। আর হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয়।

আমরা ওকে অবোধ আব মুক মনে করলেও, বাপি কিন্তু ঠিক তা নয়। ওর আচরণ দেখে মাঝে মাঝে মনে হয়, সবই বুঝতে পারে এবং সে কথাও বলে। কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারি না, বুঝতে পারে তার স্নেহময়ী মা আর দিলওয়ার ও বাবলুর মতো কয়েকজন আপনজন। এখনও দিলওয়ার খেলা করতে করতে বাপির সঙ্গে কথা বলছে।

জন্মের অনতিকাল পরে এক আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে বাপি এমনি হয়ে গেছে। চিকিৎসা বিদ্যার স্বর্গ জর্মনীতে যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়েও তৃণাদি তাকে যখন ভাল করে তুলতে পারলেন না, তখন বাপির বাবা ডক্টর পুরোহিত সহ সকল শুভানুধ্যায়ী বাপিকে কোন প্রতিবন্ধী-আশ্রমে দিয়ে দেবার পরামর্শ দিলেন। তাঁদের পরামর্শের যৌক্তিকতা স্বীকার করেও স্নেহান্ধ মা তাঁর একমাত্র সন্তানকে অপরের হাতে সঁপে দিতে পারলেন না। পঁচিশ বছর ধরে শুকতারার মতো শিয়রে জেগে থেকে তিনি তাঁর অসহায় পুত্রের সেবা করে চলেছেন। মল-মূত্র ত্যাগ করানো থেকে দাড়ি কামিয়ে দেওয়া পর্যন্ত অক্ষম সন্তানের সব কাজ তাঁকে নিজের হাতে করতে হয়। সন্তান সেবার এমন স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত আর জানা নেই আমার। এবং তৃণাদির মতো মমতাময়ী মা আমি খুব কমই দেখেছি।

তাহলেও এ বাড়িতে এলে কিন্তু তৃণাদির চেয়ে বাপির জন্যই বেশি

কষ্ট হয়। মায়ের মমতাটুকু যে পুরোপুরি পেয়েছে সে। বাড়িতে কেউ এলে সে যেমন খুশি হয়, বাড়ি থেকে চলে যেতে দেখলে তেমনি দুঃখ পায়। তাই যাবার সময় যেতে হয় পালিয়ে। গতকাল রাতে আমাদের দেরি হওয়ায় সে নাকি কেবলি ছটফট করেছে।' আবার আজ সকালে আমাদের দেখে বড্ড খুশি হয়ে উঠেছে। কিন্তু আগামী কাল আমরা যে সত্যি সত্যি ওকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি!

ভাবলে মনটা ভারী হয়ে ওঠে। কিন্তু কি করব? আমি যে পথিক। আমার কাছে তৃণাদির এ বাড়িও যে পান্থশালারই মতো। তবে এখান থেকে বিদায় নেবার পরে পথ চলতে গিয়ে বার বার বাপির কথা মনে পড়বে। কারণ আগেই বলেছি, একবার ওর মুখখানি দেখলে আর ভোলা যায় না। এক বিচিত্র মায়ার জালে জড়িয়ে পড়তে হয়।

বাপিকে সুপ্রভাত জানিয়ে আমি ও অহীন ডাইনিং রুমে ফিরে আসি। একটু বাদে আনোয়ারও আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তৃণাদি ব্রেক-ফাস্ট পরিবেশন করেন। সেই সঙ্গে তিনি দিলওয়ারকে বলে দেন, সে আমাদের কোথায় কোথায় নিয়ে যাবে।

শুনে ভাল লাগে আমার। কারণ গতবার আমি এখানকার অনেকগুলি দ্রষ্টব্যস্থল দেখেছি। দেখিয়েছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রাণা দত্তগুপ্ত। তিনি ও তাঁর সুযোগ্যা পত্নী ড. জয়শ্রী তখন তাঁদের গবেষণার প্রয়োজনে এখানে ছিলেন। রাণাবাবু নিজের সব কাজ ফেলে সারাদিন আমাকে নিয়ে এই শহর ও শহরতলীর পথে পথে ঘুরে বেরিয়েছেন।

আর জয়শ্রী? সে কাজের শেষে মেয়েকে নিয়ে চলে এসেছিল তৃণাদির বাড়িতে। সারা বিকেল তৃণাদিকে রান্না ও অন্যান্য যাবতীয় কাজে সাহায্য করেছে। এমনকি ওঁদের ছোট মেয়ে টিঙ্কুও ডাইনিং রুমে প্রচুর ফাই-ফরমাস খেটেছে। আমার আগমন উপলক্ষে তৃণাদি সেদিন সন্ধ্যায় বেশ কয়েকজন জর্মন, ভারতীয় ও বাংলাদেশীকে খেতে বলেছিলেন।

প্রাতরাশ সেরে আমি ও অহীন দিলওয়ারের সঙ্গে বেরিয়ে আসি টেগোর ইন্‌স্টিটিউট থেকে। নেমে আসি পথে। নিতান্ত সাধারণ একটি পথ। বোধকরি ফুট চল্লিশ চওড়া হবে। দুপাশে ফুটপাথ। তারপরে সারি সারি বাসগৃহ। দোকান-পাট ও অফিসের সংখ্যা কম। নাম ফ্রিয়েসডরফার স্ট্রাসে। এই পথটিকে খুঁজে পেতে কালরাতে কি কষ্টটাই না পেয়েছি।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা মেট্রো স্টেশনে আসি। টিকেট কেটে এসক্যালেটারে চেপে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে যাই। গাড়ি আসে, উঠে বসি।

কলকাতার মতই যাওয়া-আসার জন্য দুটি লাইন, একমাত্র লণ্ডন ছাড়া প্রায় সর্বত্রই দেখছি এই ব্যবস্থা। গাড়িগুলিও কলকাতার মতই সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কেবল সিটগুলো দুপাশের দেওয়ালে লাগানো নয়। পাশাপাশি দুখানি করে সিট, মাঝখানে প্যাসেজ। চেয়ারকারের মতো সামনের দিকে ও পেছনের দিকে মুখ করে পাশাপাশি আটজন বসা যায়।

কিন্তু সিটের কথা নয়। আমি ভাবছি জর্মনীর রাজধানী বন্‌ শহরের মেট্রোতে চড়ে আমি কিম্বা অহীন আজ কোন উত্তেজনা বোধ করছি না। অথচ অহীনের এটা প্রথম য়ুরোপ ভ্রমণ। সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। দু-বছর আগে জুরিখ থেকে লণ্ডনে পৌঁছে যেদিন প্রথম মেট্রো চড়েছিলাম। পিকাডেলী সার্কাস থেকে কিংস ক্রস গিয়েছিলাম। আনন্দ আর উত্তেজনায় সেদিন আমি রীতিমত চঞ্চল হয়ে পড়েছিলাম। কারণ তখনো কলকাতায় মেট্রো-রেল চলতে শুরু করে নি।

এখন শুনেছি য়ুরোপের মানুষও কলকাতার মেট্রোরেলে চড়ে খুশি হন। হয়তো বা কিঞ্চিৎ বিস্মিতও বোধ করেন। করারই কথা। যে শহরের পথে পথে এত গর্ত আর জঞ্জাল। ফুটপাথে হাট মিলেছে। রাস্তার বাঁকে বাঁকে বাস ট্রাম প্রাইভেট গাড়ি ও রিক্সা-ঠেলার জটলা। স্টেশনে স্টেশনে লোকাল ট্রেনের অব্যবস্থা। সবচেয়ে বড় কথা চারিদিকে নিয়মহীনতার মধ্যে মেট্রোরেল কেবল কলকাতা নয়, সারা

ভারতের বিস্ময়। আর তাই আমরা এখন য়ুরোপে এসে মেট্রো চড়ে বিস্মিত বোধ করি না।

অতএব অন্যকথা ভাবা যাক। এই বন্ শহরের কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জর্মনী বিভক্ত হল। ভাগ হল বার্লিন। পশ্চিম বার্লিন হয়ে গেল পূর্ব-জর্মনীর মধ্যে একটি দ্বীপের মতো, সে রয়ে গেল মূল-ভূখণ্ড থেকে বহুদূরে। রাষ্ট্রনেতারা বন্ শহরকে তাঁদের অস্থায়ী রাজধানী মনোনীত করলেন। ১৯৪৯ সালে বন্ এই সুদুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করল।

অথচ আলীসাহেব সহ সবার কাছেই শুনেছি যে বন্ কোনকালেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিম্বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা পায় নি। সুরের যাদুকর বেথোফেনের জন্মস্থান রূপে তার কিছু সুনাম ছিল আর খ্যাতি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য। সে ছিল শুধুই একটি বিশ্ববিদ্যালয়-শহর। আলী সাহেবও পড়াশুনা করার জন্যই এখানে এসেছিলেন।

ছোট এবং শান্তির শহর হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বন কিন্তু খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। রাজধানী নির্বাচিত হবার অনেক পরেও বোমা ও কামান-বিধ্বস্ত শহরের সংস্কার সাধন সম্ভব হয় নি। তবে দেশের আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতি হবার পর থেকেই ফেডারেল সরকার এই শহরের উন্নয়নে মনযোগী হয়েছেন। এবং গত ছ'ত্রিশ বছরে বন্ য়ুরোপের একটি প্রথমশ্রেণীর শহরের মর্যাদা লাভ করেছে। এখন এ শহরের জনসংখ্যা তিন লক্ষের ওপরে।

জনসংখ্যা যা-ই হোক, বন্ কিন্তু পর্যটকদের প্রিয় শহর। কারণ —'There's more to Bonn than the Parliament, the Beethoven's house and the river Rhine !'

জানি না এই প্রবাদবাক্যে কেন বিশ্ববিদ্যালয়কে যুক্ত করা হয় নি। বেথোফেনের জন্মস্থান, রাইনের তীরভূমি আর বিশ্ববিদ্যালয় নিঃসন্দেহে বন্ শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

তাহলেও কিন্তু বিদেশী পর্যটকরা এই শহরে পদার্পণ করে প্রথমেই

'Bundeshhaus' অর্থাৎ পার্লামেন্ট দেখতে যান। রাইনের তীরে গাছে ছাওয়া একটি গিরিশিরার কোলে বাগানে ঘেরা চমৎকার চার-তলা বাড়ি। গতবার রাণাবাবু আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে। কিন্তু আজ অহীন বলছে—কি হবে সেখানে গিয়ে? য়ুরোপ ভ্রমণে এসে বড় বাড়ি দেখে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।

কথাটা খুবই সত্য। আর তাই আমরা 'বাড গোডেসবের্গ মার্কট্' (Bad Godesberg Markt) স্টেশনে নেমে পড়লাম। বাইরে এসে কিছুক্ষণ হাঁটার পরেই পৌঁছে গেলাম পাহাড়ী পথে। ঘন জঙ্গলে ঘেরা ছোট পাহাড়। এই পাহাড়ী অঞ্চলেই রয়েছে বন্ শহরে প্রাচীনতম ঐতিহাসিক নিদর্শন, গোডেসবের্গ দুর্গ। পাহাড়ী পথের ওপরে দাঁড়িয়ে দেখি। পাহাড়ের পাদদেশে প্রায় সমতল উপত্যকা। এখন বন্য পরিবেশ। ছোট-বড় গাছে বোঝাই হয়ে আছে। তারই মাঝে এখানে-ওখানে পুরনো বাড়ির ধ্বংসস্তূপ আর তাদের কেন্দ্রস্থলে গোলাকার দুর্গ। বোধকরি শ'খানেক ফুট উঁচু হবে, আট তলা। প্রতি তলাতেই চারিদিকে জানলার মতো বেশ বড় বড় ফাঁক। দিলওয়ার বলে—ঐ ফাঁকে বন্দুকের নল বসিয়ে বহিরাক্রমণ প্রতিহত করা হত।

—গতবারে রাণাবাবু বলেছিলেন, দুর্গের ভেতরে সিঁড়িগুলো অক্ষত রয়েছে। সেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে দেওয়া হয়। ওপর থেকে বন্ শহরটিকে নাকি ভারী সুন্দর দেখায়।

—কিন্তু আজ তো ওপরে ওঠা যাবে না দাদা!

দিলওয়ার আমাকে নিরাশ করে। কারণ বুঝতে পারি না। জিজ্ঞেস করি—কেন বলতো?

—আজ যে সোমবার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন।

তাহলেও আমরা সিঁড়ি বেয়ে নিচের উপত্যকায় নেমে আসি। দুর্গদ্বারের সামনে একটা গাছের ছায়ায় বসে পড়ি। কথায় কথায় দিলওয়ার বলতে থাকে—১২১০ সালে জনৈক আর্চবিশপ এই দুর্গের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু মাত্র দু-বছর পরে তিনি পদচ্যুত হওয়ায় নির্মাণকার্য অগ্রসর হতে পারে না। ১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তৎ-

কালীন আর্চবিশপ আবার কাজ শুরু করলেন। পাঁচতলা পর্যন্ত নির্মিত হল। তারপরে নানা কারণে প্রায় একশ' বছর কাজ বন্ধ থাকল। ১৩৪০ সালে আবার কাজ আরম্ভ হয়ে তিনটি তলা ও অন্যান্য কাজ শেষ হয়।

একবার থামে দিলওয়ার। তারপরে আবার বলে—সওয়া দু-শ বছর ধরে এই দুর্গ স্থানীয় শাসকদের বাসগৃহ রূপে সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু অবশেষে শাসকদের পারিবারিক কলহের অকুস্থলে পরিণত হওয়ায় ১৫৮৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর দুর্গটি ধ্বংস হয়ে যায়।

—কেমন করে? দিলওয়ার থামতেই অহীন জিজ্ঞেস করে।

দিলওয়ার জবাব দেয়—১৫৮৩ সালে কোলন ক্যাথেড্রালের কার্যকরী সমিতি এখানকার আর্চবিশপ গেভার্ডকে পদচ্যুত করেন। কারণ তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণ করে কাউন্টেস এগনেস নামে জনৈক প্রোটেস্ট্যান্ট যুবতীকে বিয়ে করেছিলেন। কার্যকরী সমিতি তাই তাঁকে পদচ্যুত করে বাভেরিয়ার ডিউক আরনেস্ট-কে আর্চবিশপ নিযুক্ত করলেন। কিন্তু গেভার্ড সে আদেশ উপেক্ষা করে দুর্গ আগলে পড়ে রইলেন। ডিউক ফার্নিনাণ্ডের নেতৃত্বে বাভেরিয়ার সৈন্যরা দুর্গ অবরোধ করলেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ অবরোধের পরেও দুর্গের পতন ঘটল না। তখন ফার্নিনাণ্ড ১৫০০ পাউণ্ড বারুদ দুর্গের নিচে মজুত করে আগুন ধরিয়ে দিলেন। দুর্গ ধ্বংস হয়ে গেল।

সেই থেকে পৌনে চারশ' বছর ধরে দুর্গ ধ্বংসস্তূপ রূপেই পড়ে ছিল। ১৯৬১ সালে সরকার দুর্গটির সংস্কার সাধন করেন। তারপরে এই হোটেল ও রেস্তরাঁ খোলা হয়। এখন এটি পর্যটকদের একটি অবশ্য দর্শনীয় স্থল।

দুর্গ দেখে আবার উঠে আসি ওপরে। পাহাড়ী পথ বেয়ে ফিরে আসি গোডেসবের্গ মার্কেটিং সেণ্টারে। আমাদের নিউ-মার্কেটের মতো একই ছাদের নিচে সারি সারি সুসজ্জিত দোকান। প্রতিটি দোকান তাকিয়ে দেখার মতো।

তাহলেও আমরা দোকান দেখে সময় নষ্ট করি না। এসে দাঁড়াই

বাজারের সামনে, পাথর-বাঁধানো প্রশস্ত পথে। এটি আপাত দৃষ্টিতে রাজপথ হলেও এত চওড়া যে অনায়াসে স্কোয়ার বলা যেতে পারে। তাছাড়া এখানে মানে এই বাজারের সামনে গাড়ি আসতে দেওয়া হয় না। কার-পার্ক অনেকটা দূরে। গাড়ি না আসতে দিলেও এখানে কিন্তু বেশ ভিড়।

দিলওয়ার বলে—এই জায়গাটি বন্ শহরের হৃৎপিণ্ড। এটি একটি মিলনভূমি। সারা গ্রীষ্মকাল জুড়ে প্রায় প্রতিদিন বিকেলে এখানে খোলা আকাশের নিচে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, কনসার্ট থিয়েটার কবিতাপাঠ ও পল্লীগীতি প্রভৃতির আসর বসে। ইংলণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ থেকে শুরু করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন. এফ কেনেডি পর্যন্ত বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিরা এখানে এসেছেন এবং এখানকার 'গোল্ডেন বুক'-এ তাঁদের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

বাড গোডেসবের্গ বাজার থেকে আমরা বেথোফেনের জন্মস্থান দেখতে এলাম। এটি বন্ শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন। রাস্তার নাম বনগাসে (Bonngasse), বাড়ির নম্বর বিশ। বিশ্ববিখ্যাত সুরস্রষ্টা ও বেহালাবাদক লুড্‌ভিগ্‌ ফন্ বেথোফেন (Ludwig Von Beethoven) এই বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতা জোহান ও মা মেরিয়ার সঙ্গে চার বছর বয়স পর্যন্ত এই বাড়ির পেছন দিকে বাস করেছেন। এখন এ বাড়িটি মিউজিয়াম আর এর পাশের বাড়িটি একটি 'আর্কাইব' বা মহাফেজখানা। ঐ বাড়িটিতে বাস করতেন এক মহীয়সী মহিলা যিনি বেথোফেনকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বেথোফেনের ধর্মমাতা। সতেরো বছরে মাতৃহারা হবার পরে তিনি বেথোফেনকে মায়ের অভাব বুঝতে দেন নি।

পথের পাশে একটি তেতলা বাড়ি। গোলাপী রঙের সাধারণ বাড়ি। কাচ ও কাঠের দরজা-জানলা। দোতলা ও তিনতলার কার্নিশে কিছু মরশুমী ফুলের টব। লাল ও হলুদ ফুল ফুটে আছে। নিচের তলায় ফুটপাথের সঙ্গে বেশ বড় একটা কাঠের দরজা। কিন্তু এটি সাধারণত বন্ধ করেই রাখা হয়। কেন, বলতে পারব না। তবে

গতবারও বন্ধ দেখে গেছি।

বাড়ির দিকে মুখ করে দাঁড়ালে, ডানদিকে একটি কাঁকর বিছানো হাঁটাপথ। সেই পথে এগিয়ে বাড়িটার মাঝামাঝি জায়গায় সিঁড়ি-কোঠা। এদিকের সারা কার্নিশ জুড়ে আরও বেশি ফুল ফুটে আছে। তারা মালার মতো বাড়িটাকে জড়িয়ে ধরেছে।

আমরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি দোতলায়। এটি বাড়ির পেছন-দিক। প্রথম ঘরটির নাম বনের জিমের (Bonner Zimmer)। এঘরের দেওয়ালে বেথোফেনের ঠাকুরদাদার একখানি তৈলচিত্র ঝোলানো রয়েছে। তাঁর নামও ছিল লুডভিগ। তিনিও একজন সুরস্রষ্টা ছিলেন। এঘরে সেকালের বন্ জনপদের একটি খোদাই করা 'মডেল' রয়েছে। রয়েছে আরও কয়েকখানি ছবি ও একটি পিয়ানো। পিয়ানোটি দেখবার মতো। ওপরে মূল্যবান ধাতু দিয়ে খচিত একটি পাখি ও জনৈক গ্রীক যুবকের মুখ অঙ্কিত। পাখিটি গান গাইছে।

পিয়ানোটি দেখে আমরা পাশের ঘরে এলাম। এঘরের দেওয়ালে বেথোফেনের বার্থ-সার্টিফিকেটের একখানি নকল বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। আরেকখানি ছবি রয়েছে মেশেল্ন্ (Mecheln) নামে একটা জায়গার। সেখানে বেথোফেনের ঠাকুরদাদা জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

যেসব পরিবার বেথোফেনকে জীবনসংগ্রামে সাহায্য করেছেন, তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে পাশের ঘরখানি উৎসর্গীকৃত। আমরা দিলওয়ারের সঙ্গে সেই ঘরে আসি। এঘরেও কয়েকখানি ছবি রয়েছে। একখানি ছবিতে বেথোফেন একটি মেয়েকে পিয়ানো শেখাচ্ছে। আরেকটি ছবি মাতৃবিয়োগের পরে কিশোর বেথোফেন ও তাঁর ধর্মমাতার। ধর্মমাতা পরমস্নেহে তাঁকে কাছে টেনে নিচ্ছেন।

আমরা পরের ঘরখানিতে আসি। এখানে বেথোফেনের ষোল বছর বয়সের একখানি ছবি রয়েছে। রয়েছে একটি অর্গান যেটি তিনি দশ/এগারো বছর বয়স থেকে বাজাতেন। আর আছে বেথোফেনের একচল্লিশ বছর বয়সের একটি আবক্ষ ব্রোঞ্জমূর্তি।

সে বয়সটা তাঁর ভিয়েনায় কেটেছে। বাইশ বছর বয়সে তিনি ভিয়েনায় চলে যান। কিন্তু তখুনি পিয়ানো-বাদক রূপে উত্তর-পশ্চিম জর্মনীতে তিনি সুপ্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছেন।

তারপরে আমরা দেখি সেই সুমহান সুরস্রষ্টার নিজের হাতে লেখা কিছু গানের পাণ্ডুলিপি ও স্বরলিপি, নিজের হাতে নির্মিত কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র এবং একখানি 'এ্যালবাম'। এই এ্যালবামখানি তিনি এখান থেকে ভিয়েনায় নিয়ে গিয়েছিলেন। এ্যালবামে তৎকালীন য়ুরোপের বহু বিখ্যাত লোকের হাতের লেখা রয়েছে, রয়েছে বেথোফেন সম্পর্কে প্রশস্তি ও ভবিষ্যদ্বাণী। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণীটি লিখেছেন তৎকালীন ভিয়েনার একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-প্রেমিক কাউণ্ট ফার্ডিন্যাণ্ড ওয়াল্ড স্টাইন। তিনি লিখেছেন—

"The spirit of Mozart is mourning and weeping over the death of her beloved. With the inexhaustible Haydn she found repose but no occupation. With the help of unremitting labour you shall receive Mozart's spirit from Haydn's hands."*

বলা বাহুল্য ওয়াল্ড স্টাইনের সে ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে।

অবশেষে আমরা আসি এই স্মৃতিমন্দিরের গর্ভগৃহে। এখানেই আবির্ভূত হয়েছিলেন একটি মানবশিশু, যিনি জীবনে ঐশ্বর্যের আকাঙ্খা করেন নি, প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করেন নি, এমন কি যশেরও বাসনা করেন নি। সারাজীবন সুরের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে জগদ্বাসীর হৃদয়ে অমর হয়ে রয়েছেন।

* Mozart জগদ্বরেণ্য অস্ট্রিয়ান সুরস্রষ্টা। সতেরো বছর বয়সে বেথোফেন তাঁর কাছে গান-বাজনা শিখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আকস্মিক মাতৃবিয়োগের জন্য মাত্র দু-মাস ভিয়েনায় থেকে তাঁকে বন্ ফিরে আসতে হয়। পরে বাইশ বছর বয়সে গুরু হায়ড্ন্-এর (Haydn) সঙ্গে তিনি যখন ভিয়েনায় যান, তখন মোজার্ট দেহরক্ষা করেছেন। কিন্তু বেথোফেন তাঁরই ঘরানায় সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করেন। তাঁর মাঝেই মোজার্টের স্বপ্ন সার্থক হয়।

অপেক্ষাকৃত ছোট একখানি ঘর। ঠিক মাঝখানে কোমর সমান উঁচু একটি কাঠের বেদির ওপরে বেথোফেনের আবক্ষমূর্তি। শ্বেত-পাথরে নির্মিত। গায়ে কোট, মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল। উঁচু নাক, চওড়া কপাল, ঠোঁটে মৃদু হাসি আর আশ্চর্য উজ্জ্বল দুটি চোখ।

আমরা প্রণাম করি। আর তাঁর অমর আত্মার কাছে কায়মনোবাক্যে কামনা করি, তোমার সুরের পরশে এই হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীতে শান্তি ফিরে আসুক।

বেথোফেনের কথা ভাবতে ভাবতেই বেথোফেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি। ১৭৭০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর বেথোফেন এক সঙ্গীত সাধক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা এবং পিতামহ দুজনেই রাজগায়ক ছিলেন। পিতামহ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পরিবারের আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়। তাঁরা পাঁচ ভাই-বোন ছিলেন। কিন্তু পুষ্টি ও চিকিৎসার অভাবে তিনটি ভাই-বোন শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। অর্থাভাবে তেরো বছর বয়সে বেথোফেনকে স্কুল ছাড়তে হয় এবং ষোলো বছর বয়সে পরিবারের রুটি যোগাড়ের জন্য তাঁকে পথে নামতে হয়।

এর আগেই কিন্তু বেথোফেনের বাবা তাঁর মধ্যে প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে পেশাদারী পিয়ানোবাদক করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারপরেই অবশ্য বেথোফেন সেকালের প্রখ্যাত সুরকার ও নাট্যকার ক্রিসটিয়ান গোটলার নীফের নজরে পড়ে যান। তিনি তাঁকে গান-বাজনা শেখাতে শুরু করেন। মাত্র তেরো বছর বয়সে বেথোফেন প্রথম একটি বাজনার সুর সংযোজন করেন। আর তারই ফলে তিনি বন্ অপেরার বাদক নির্বাচিত হন। সতেরো বছর বয়সে তিনি ভিয়েনায় গিয়ে মোজার্টের কাছে গান-বাজনা শেখার সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু আকস্মিক মাতৃবিয়োগের জন্য মাত্র দু-মাস বাদেই তাঁকে আবার বন্ ফিরে আসতে হয়।

বিশ বছর বয়সে তাঁর সঙ্গে হাইড্‌ন্-এর পরিচয় এবং

বাইশ বছর বয়সে তিনি তাঁর সঙ্গে ভিয়েনায় চলে যান। তারপর থেকে আর তাঁকে পেছনে তাকাতে হয় নি। শুধুই নিরলস সাধনা আর সিদ্ধিলাভ। ক্রমে অস্ট্রিয়ার সীমানা পার হয়ে তাঁর খ্যাতি বাইরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৮১০ সালে চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর ফিফ্‌থ সিম্‌ফোনী বার্লিনে প্রযোজিত হয় এবং তিনি বিশ্ববরেণ্য হয়ে ওঠেন।

তারপরে তিনি আরও চারটি সিম্‌ফোনী সৃষ্টি করেছেন। ১৮১৩ সালে ভিয়েনায় তাঁর সপ্তম সিম্‌ফোনী প্রযোজিত হবার পরে পুনরায় তিনি খ্যাতি লাভ করলেন। ১৮১৪ সালে ভিয়েনায় য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের রাজা-রানীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

বেথোফেন ছিলেন প্রকৃত শিল্পী, সত্যিকারের সাধক। জীবনে তিনি অসংখ্য মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা লাভ করেছেন কিন্তু একেবারেই অর্থ রোজগার করতে পারেন নি। সারাজীবনই তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। এবং হয়তো এই কারণেই কোন কুমারী তাঁর কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করেন নি।

শেষ জীবনে একমাত্র জীবিত ভাই নাইক্সেনডর্ফের (Gneixen dorf) সাহায্যে তাঁকে খাওয়া-পরা চালাতে হত। এবং সে সাহায্যের পরিমাণ এতই কম ছিল যে তা দিয়ে প্রচণ্ড শীতেও ঘর গরম করার জন্য কয়লা কিনতে পারতেন না। আর তাই বেথোফেন মাত্র ন'টি সিম্‌ফোনী সংযোজন করতে পারলেন, দশম সিম্‌ফোনীটি তাঁর মানস-লোকেই রয়ে গেল। অথচ তিনি সেটি শুরু করেছিলেন। কয়েক কিলোগ্রাম কয়লার জন্য জগদ্বাসী বেথোফেনের দশম সিম্‌ফোনী থেকে বঞ্চিত হল, মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে এর চেয়ে বড় কলঙ্ক আর কী হতে পারে ?

বেথোফেন তাঁর সুরের মাঝে নাটকোচিত চমক সৃষ্টি করে সঙ্গীতকে প্রকৃত প্রাণময় করে তুলেছেন। তিনি আজও জর্মনীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুরকার। আর তাই মোজার্ট জর্মন না হয়েও জর্মনীর সঙ্গীত

ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

বেথোফেনের পূর্ববর্তী যুগে কণ্ঠসঙ্গীতকেই সঙ্গীতজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান রূপে গণ্য করা হত। যন্ত্রসঙ্গীতের তখন, সামান্যই মূল্য ছিল। বাদকরা ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পী, সুরকারের ছিল না তেমন মর্যাদা। বেথোফেন এই প্রতীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে গিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যন্ত্রসঙ্গীত কণ্ঠ সঙ্গীতের চেয়ে কম মূল্যবান নয়, সুরকার গায়কের চেয়ে বড়!

১৮২৬ সালে বেথোফেন কিছুদিন ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে বাস করেন। তারপরে ভিয়েনা ফিরে গিয়েই নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। অসুখ সেরে যায় কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবাযত্নের অভাবে শরীর সুস্থ হয় না। তিনি দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁর প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে। কয়েকমাস শয্যাশায়ী থাকার পরে অবশেষে ১৮২৭ সালের ২৬শে মার্চ মাত্র সাতান্ন বছর বয়সে এই বিশ্ববরেণ্য সুরস্রষ্টা সুরলোকে মহাপ্রস্থান করেন। দর্শনার্থীদের জন্য তাঁর মরদেহ তিনদিন ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখার পরে শোভাযাত্রা সহকারে তাঁকে সমাধিস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। তৎকালীন ভিয়েনার সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী ও সাহিত্যিক সহ সমাজের সর্বশ্রেণীর বিশ হাজার শোকার্ত মানুষ সেদিন অশ্রুসিক্ত নয়নে সেই শোকযাত্রায় সামিল হয়েছিলেন।

বেথোফেনের বাড়ি থেকে বের হয়ে হাঁটতে হাঁটতে আর দেখতে দেখতে আমরা হাউপটবাহন্‌হফ (Hauptbahnhof) অর্থাৎ বন্‌ শহরের প্রধান রেলস্টেশনে এলাম। পথে বেথোফেনের দণ্ডায়মান একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি দর্শন করলাম। আর দেখলাম বেথোফেন হল (Beethovenhalle) এটি শ্রেষ্ঠ কনসার্টের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। প্রতি তিনবছর অন্তর এখানে মহাসমারোহে বেথোফেন উৎসব পালিত হয়।

স্টেশনটির দুটি অংশ, 'সারফেস' রেল এবং মেট্রো। সারফেস রেলের স্টেশনটি ওপরে, পথ থেকে প্রায় পঁচিশ ধাপ সিঁড়ি পার হয়ে

সামনে প্রশস্ত বাঁধানো চত্বরে। আমি আমার ফরাসীবোন গব্রিয়েলের বাড়ি স্ত্রাসবুর্গ থেকে পরশু বিকেলে ঐ স্টেশনে এসেছি। তারপরে মেট্রো করে তৃণাদির বাড়ি গিয়েছি।

মেট্রো স্টেশনটি পথ থেকে নিচে নেমে। দিলওয়ার আমাদের সেখানেই নিয়ে এলো। একটা মেট্রো চড়ে আমরা কোয়েনিশ (Koenig) স্টেশনে এলাম।

ওপরে উঠে খানিকটা হেঁটে পথের ডানদিকে প্রকাণ্ড একটা তিন-তলা বাড়ি, অনেকটা আমাদের রাইটার্সের মতো। গতবারও রাণা-বাবু আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। এটিই কোয়েনিশ মিউ-জিয়াম। পুরো নাম 'Zoologisches Forschunginstitut und Museum Alexander Koenig' (Zoological Research Institute and Alexander Koenig Museum).

প্রখ্যাত প্রাণীবিদ্ আলেকজাণ্ডার কোয়েনিশ (১৮৫৮-১৯৪০) এই গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৯ সালে তিনি তাঁর সমস্ত সংগ্রহ সরকারকে উপহার দেন। এটি জর্মনীর তৃতীয় প্রাণীবিদ্যা-যাদুঘর। শুনেছি প্রথম দুটি ফ্রাঙ্ক্‌ফুর্ট এবং স্টুটগার্ট' শহরে অবস্থিত।

এই যাদুঘরের নিচের তলায় রয়েছে স্তন্যপায়ী জীবদের মরদেহ, যেমন জিরাফ হাতি ঘোড়া শুয়োর হরিণ গাধা গরু বানর ও সীলমাছ এবং মানুষ প্রভৃতি। সংগ্রহগুলির চারিপাশে সুন্দর পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন বন্য বরাহকে রাখা হয়েছে বরফের ওপরে। শুধু পরিবেশ নয়, প্রাণীদেহগুলি সাজাবার সময় জীবনের ক্রমবিকাশের কথাও মনে রাখা হয়েছে।

দোতলায় রয়েছে শুধু পাখিদের প্রজাতি। সারা পৃথিবী থেকে পাখি সংগ্রহ করে আনা হয়েছে। দেখানো হয়েছে পক্ষীকুলের জীবনের ক্রমবিকাশ। এখানে এমন অনেক দৈত্যাকার পাখির প্রজাতি রয়েছে যাদের বংশ এখন বিলুপ্ত।

তিনতলায় রয়েছে এদেশীয় জন্তুদের প্রজাতি, যেমন এ্যান্টিলোপ, সীল, হিপোপটেমাস্, কুমীর প্রভৃতি। তবে শুনেছি সংরক্ষিত

প্রজাতিদের সামান্য সংখ্যকই প্রকাশ্যে প্রদর্শিত হয়েছে। কারণ রাণাবাবু বলেছিলেন যে, এদের নাকি দশ লক্ষের ওপরে শুধু প্রজাপতির প্রজাতি রয়েছে।

তবু সেই সামান্য সংগ্রহের প্রদর্শনী দেখে সেদিন আমি ভারী আনন্দ লাভ করেছিলাম। অথচ অহীনের দুর্ভাগ্য, সে আমার আনন্দের অংশীদার হতে পারল না। কারণ একই। আজ সোমবার, সুতরাং যাদুঘর বন্ধ।

বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসি মেট্রো স্টেশনে। একটা গাড়ি ধরে 'Universitat' অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে এসে নামি। ওপরে উঠে কয়েক মিনিট হেঁটে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পৌছই। পুরো নাম 'Rheinische Friedrich-Wihelm-Universitat.'

রোমান আমলে বন্ কোলন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তখন রোমান শাসকদের বাস করার জন্য ১৫৬৭ সালে এই প্রাসাদের নির্মাণ কার্য শুরু হয়। সপ্তদশ শতকে বাড়িটি আরও বড় করা হয়। কিন্তু তারপরেই বহিরাক্রমণের ফলে ১৬৮৯ সালে বাড়িটি প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তী কালে বাভেরিয়ার জনৈক স্থপতির নেতৃত্বে ইতালীয় রীতিতে প্রাসাদটি পুনরায় নির্মিত হয়। তার পরে চলে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনেব পালা। শেষ পর্যন্ত ১৭৩৪ সালে নির্মাণকার্য শেষ হয়। তখন এটি একটি সেনাবিনাস ও দুর্গও বটে।

১৭৭৭ সালে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রাসাদের প্রধান অংশটি ভস্মীভূত হয়। বলা বাহুল্য বাড়িটি আবার তৈরি করা হয়। ১৮১৮-য় এই বাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা কিন্তু অনেক আগে, সপ্তদশ শতকে। ১৬৩৯ সালে এই শহরে যে কলেজ স্থাপিত হয়েছিল, তাকে কেন্দ্র করেই ১৭৮৬ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

বিগত দু'শ' বছরে তো বটেই, এখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও এই শিক্ষায়তনের ওপর দিয়ে বহু ঝড় বয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ১৯৪৪ সালের ১৮ই অক্টোবর এই বাড়ির ওপরে

বোমা পড়ে। ফলে বাইরের দেওয়াল ছাড়া প্রায় গোটা বাড়িটাই ধ্বংস হয়ে যায়।

কিন্তু জর্মনদের অভিধানে ধ্বংস বলে কোন শব্দ নেই। কারণ জর্মনী বিশ্বকর্মার আপন আলয়, সে সৃষ্টির মহাতীর্থ। তাই আবার বাড়িটি তৈরি করা হয়েছে, যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনি করে। আজও যেন সে ১৭৪৪ সালে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কার সাধ্য বলে যে, ১৯৫১ সালে এর নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে!

কথাটা শুনে অহীনও অবাক হয়। সে অবাক বিস্ময়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে। থাকারই কথা। কেবল তো গড়ন নয়, আকৃতি এবং অঙ্গসজ্জাও দেখার মতো। এটি এখনও বন্ শহরের সবচেয়ে লম্বা বাড়ি। সুন্দরও বটে। বিশেষ করে বাড়ির তুদিকের টাওয়ার তুটি এবং পেছনের ক্যাথেড্রাল টাওয়ারটি।

বাড়ির সামনে ফুলের বাগান তারপরে সুপ্রশস্ত পথ। পথের পরে সুবিশাল সবুজ ময়দান। পাশে গাছে ছাওয়া প্রকাণ্ড পার্ক, নাম হফগার্টেন (Hofgarten)।

তিনতলা বাড়ি। সারা বাড়ি জুড়ে সারি সারি দরজা-জানলা, টালির চাল। তু-পাশে টাওয়ারের কাছে চৌচালা। সেই চালের ওপরে মঠাকৃতি টাওয়ার।

বাড়ির সামনে পথের একাংশ জুড়ে সাইকেল স্ট্যাণ্ড, অসংখ্য সাইকেল। ব্যাপারটা একটু বিস্ময়কর! এই মোটর আর মেট্রোর শহরে, এত ছাত্র-ছাত্রী সাইকেলে চেপে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে! সত্যই তাই। মোটরগাড়ি শিল্পের এত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও এদেশে সাই-কেলের খুবই কদর। অসংখ্য মানুষ সাইকেল চড়েন। ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য যেমন, তার চাইতে অনেক বেশি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য। আর তাই মোটর পথের পাশে সাইকেল আরোহীদের জন্য পৃথক বাঁধানো পথ রয়েছে জর্মনীর প্রায় সব বড় শহরে।

বেশ ব্যস্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকদের অবিরাম আসা-যাওয়া। কিছু ছাত্র-ছাত্রী সামনের ময়দানে শুয়ে-বসে রয়েছে

কেউ বই পড়ছে, কেউ বা আড্ডা দিচ্ছে। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখি। অহীন ছবি নেয়। তারপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে মুখ করে আমরাও বসে পড়ি ময়দানে। বসে বসে বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখতে থাকি।

একটু বাদে অহীনের প্রশ্নের উত্তরে দিলওয়ার জানায়—থিয়োলজি, এডুকেশন, মেডিসিন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইন, অঙ্কন, বিজ্ঞান. কৃষি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে পড়া এবং জর্মন ভাষা শেখার ব্যবস্থা আছে এখানে।

একবার থামে দিলওয়ার। তারপরে, আবার বলে—এ অঞ্চলে প্রায় সব স্কুল-কলেজই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে।

—স্কুলও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে!

অহীন একটু বিস্মিত। তাই দিলওয়ার উত্তর দেবার আগেই আমি বলে ফেলি—হ্যাঁ হবে না কেন? আগে তো আমাদেরও তাই ছিল। আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাটিকুলেশন পাশ করেছি।

—এখানেও তাই। দিলওয়ার বলে—১৮১৮-১৯ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪৭জন ছাত্র-ছাত্রী ম্যাট্রিকুলেট হয়েছে।

—আর এখন?

—এখন আটটি ফ্যাকালটিতে ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছে।

গতবার রাণাবাবু আমাকে নিয়ে এসেছিলেন এখানে। সেই আমার এই বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রথম দেখা। কিন্তু এই শিক্ষায়তনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সৈয়দ মুজতবা আলী। আমি তাই অহীন আর দিলওয়ারকে আলীসাহেবের কথা বলে চলি। আলীসাহেব লিখেছেন—

“আর বন শহরের ভিতরটাও বড় মনোরম। বার্লিনের মত চওড়া রাস্তা নেই, পাঁচতলা বাড়িও নেই। মোটরের গাঁক-গাঁকও নেই। আছে কাশী আগ্রার মত ছোট ছোট গলিঘুচি ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি-ঘর-দোর, ঘুমন্ত কাফে, অর্ধ জাগ্রত রেস্তরাঁ। আর বিশাল বিরাট

বিপুল কলেবর আধখানা শহর জুড়ে ভুবন-বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই জর্মনীতে প্রথম সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ হয়। হেরমান য়াকোবি এখানেই অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর শিষ্য কির্ফেল এখনো সেখানে সংস্কৃত পড়ান। পুরাণ সম্বন্ধে তাঁর মোটা কেতাবখানার তর্জমা ইংরেজীতে এখনো হয় নি। কির্ফেলের সতীর্থ অধ্যাপক লশ উপনিষদ নিয়ে বছর বিশেক ধরে পড়ে আছেন। তাঁর সুহৃদ্ রুবেনসের শরীরে ঈষৎ ইহুদী রক্ত ছিল বলে তিনি জর্মনী ছাড়তে বাধ্য হন। উপস্থিত তিনি তুর্কীর আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ান। বহুকাল ধরে রামায়ণখানা কামড়ে ধরে পড়ে আছেন—প্রামাণিক পুস্তক লেখার বাসনায়।*

আর রাইনের ওয়াইনের প্রশংসা করার দায় তো আমার উপর নয়। ফ্রান্সের বর্দো বার্গেণ্ডির সঙ্গে সে কাঁধ মিলিয়ে চলে।

আমি যখন প্রথম দিন আমার অধ্যাপকের সঙ্গে লেখাপড়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলুম, তখন তিনি ভূরি-ভূরি খাঁটি তত্বকথা বলার পর বললেন ঃ

'এখানে ফুল প্রচুর পরিমাণে ফোটে, তরুণীরা সহৃদয়া এবং ওয়াইন সস্তা। বুঝতে পারছেন, আজ পর্যন্ত আমার কোনো শিষ্যেরই বদনাম হয় নি যে নিছক পড়াশুনা করে সে স্বাস্থ্যভঙ্গ করেছে। আপনিই বা কেন করতে যাবেন ?

রাজধানী ঠিক মোকামেই থানা গাড়লো।"

"* হালে খবর পেয়েছি তিনি রুশদেশে গিয়ে সেখান থেকে রামায়ণের প্রামাণিক পাঠ প্রকাশ করেছেন।"

॥ চার ॥

—হ্যালো শঙ্কুদা…

গৌর প্রায় ছুটে এসে আমার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়। তারপরে আবার বলে—ভাল আছো?

—নিশ্চয়ই। খুব ভাল। স্ত্রাসবুর্গে ছিলাম বোনের কাছে, এখানে রয়েছি দিদির বাড়িতে। এবারে ভাই-য়ের সঙ্গে বাভেরিয়া যাবো।

অহীন আর দিলওয়ারের সঙ্গে গৌরের পরিচয় করিয়ে দিই। ওরা করমর্দন করে।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তৃণাদির বাড়িতে ফিরে এসে দেখা হয় গৌরের সঙ্গে। শঙ্কর ওকে কোলন বিমানবন্দর থেকে নিয়ে এসেছে। ওরা বাড়ির সামনে গার্ডেনে বসে গল্প করছিল। একখানি ক্যাম্প-খাটের ওপর বসে আছে বাপি। তাকে ঘিরে চেয়ারে বসেছিল গৌব শঙ্কর অমৃত আর বাবলু। তৃণাদি ও জয়া নিশ্চয়ই রান্নাঘরে।

আমাদের দেখতে পেয়েই গৌর ছুটে এসেছে। এবারে বাবলুও এগিয়ে আসে। বলে—কয়েকমাস হোল আবার বেকার হয়েছি। কাল একটা চাকরির চেষ্টায় গিয়েছিলাম, তাই আসতে পারি নি।

—তাতে কি হয়েছে? আজ তো এসেছো। কিন্তু চাকরিটা হবে কি?

—আজ্ঞে হতে পারে, সামনের মাস থেকে।

—ভেরী গুড্।

—হ্যাঁ দাদা! বেকার ভাতা নিতে বড্ড লজ্জা করে।

আমি অহীনের সঙ্গে বাবলুর পরিচয় করিয়ে দিই। বাংলাদেশের ছেলে। সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান যুবক। বছর তিরিশেক বয়স হবে। দিলওয়ারের মতো, সে-ও এদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছে।

আগেই বলেছি, এদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের কি অভিযোগ জানা নেই আমার। তবে এদের আমি কিছুতেই সন্ত্রাসবাদী ভাবতে পারি না। গতবার বাবলু আমাকে বিমানবন্দর থেকে নিয়ে এসেছিল। কথায় কথায় বলেছিল—বড্ড আশা করেছিলাম শান্তি নিকেতনে এম. এ. পড়ব। ব্যবস্থাও সব হয়ে গিয়েছিল। তারপরে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সব ছেড়ে সবাইকে ছেড়ে এখানে পড়ে রয়েছি। জানি না আর কোনদিন দেশে ফিরতে পারব কিনা, মা-বাবা ভাই-বোনের সঙ্গে জীবনে দেখা হবে কিনা ?

এ প্রশ্নের উত্তর সেদিনও জানা ছিল না, আজও জানা নেই। তবে গতবারের মতো এবারেও এই ছেলেগুলোকে দেখে ভারী আনন্দ হচ্ছে। ভিন্ন ধর্ম আর ভিনদেশী হলেও ওরা যে আমার বাংলা-মায়ের সন্তান।

বাবলু বাপির সঙ্গে খেলা করছিল। হঠাৎ সে আমার কাছে চলে আসায় বাপি বোধকরি কষ্ট পেয়েছে। সে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বাবলু তাড়াতাড়ি আগের জায়গায় গিয়ে বসে। দিলওয়ারও গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ায়। বাপির মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

আগেই বলেছি কেউ এ বাড়িতে এলে বাপি যেমন খুশি হয়, তেমনি চলে যাবার সময় দুঃখ পায়। তাই যাবার সময় সবাইকেই যেতে হয় পালিয়ে। গতকাল এবং আজ সকালে আমরাও তাই করেছি। বাপি দুর্বল, বাপি অশক্ত ও অব্যক্ত কিন্তু সে যে অতিশয় উদার ও স্নেহপ্রবণ, তা বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না। গতকাল অহীনকে দেখে সে খুশি হয়েছে, আজ গৌরকে দেখেও তাই। আর এখন বাবলু ও দিলওয়ারকে পেয়ে তো প্রায় আত্মহারা।

কিছুক্ষণ পরে ওরা বাপিকে নিয়ে ভেতরে চলে যায়। ওরা ওকে খাইয়ে দেবে।

বাপির খাওয়া হলে, আমাদের খাবার ডাক পড়বে। আমি তাই গৌরের সঙ্গে গল্প করতে থাকি। অনেকদিন বাদে আমাদের দেখা।

গৌরের দাদা সুদেব আমার সহপাঠী। গৌর আমার চেয়ে

বছর তুয়েকের ছোট। তার মানে ওর এখন তেপ্পান্ন চলেছে। দেখে কিন্তু একেবারেই বোঝা যায় না। স্কুল ফাইনাল পাশ করে রেডিও ইঞ্জিনীয়ারিং শিখে আঠারো বছর বয়সে সে ভাগ্য অন্বেষণে যাত্রা করেছিল। বাঁশদ্রোণী থেকে লণ্ডন। তারপরে সুদীর্ঘ সংগ্রাম। বিদেশের মাটিতে সহায় সম্বলহীন এক স্বল্প শিক্ষিত বাঙালী তরুণের জীবন সংগ্রাম। আশ্রয় ও খাদ্যের সংস্থান করে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া।

গৌর সে সংগ্রামে জয়লাভ করেছে। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে রয়াল এয়ারফোর্সে যোগদান ও বৃটিশ নাগরিকত্ব লাভ। তারপরে বিয়ে এবং ধাপে ধাপে ওপরে ওঠা। তুটি কন্যার জন্ম। রয়াল এয়ার-ফোর্সের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বৃটিশ এয়াবওয়েজে যোগদান। লণ্ডনে বাড়ি করে স্ত্রী ও মেয়েদের সেখানে রেখে চাকরির জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো। অবশেষে কয়েকবছর হল বার্লিনে স্থায়ী হওয়া। মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য স্ত্রী পড়ে রয়েছে লণ্ডনে। যাতায়াতের অসুবিধে নেই। কিন্তু ছুটি কোথায়? বছরে মাসখানেক ছুটি তখন সে হয় কলকাতা যায়. না হয় কানাডায় সুদেবের কাছে। তবে অফিসের কাজে প্রায়ই লণ্ডন যেতে হয়. তখন তু-একদিন থাকতে পারে মেয়েদের সঙ্গে। আর ওরাও ছুটি-ছাটায় বার্লিন এসে মাঝে মাঝে থেকে যায় তু-চারদিন।

অতএব সে একা পড়ে রয়েছে বার্লিনে। রান্না থেকে শুরু করে কাপড় কাচা ও ঘর-দোর সাফ, সব কাজ নিজেকেই করতে হয়। এদেশে অবশ্য সবই হয় যন্ত্রের সাহায্যে। গতবারে আমি বেশ কিছুদিন বার্লিনে ওর কাছে ছিলাম। কি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট! আকারেও বেশ বড়। আর কি নেই সেখানে? অথচ একটি মানুষ একাকী জীবন কাটাচ্ছে। আমি কষ্ট পেলেও ব্যাপারটা ওর গা-সহা হয়ে গিয়েছে। কারণ ব্যক্তিকে নিয়েই য়ুরোপের সমাজ, পরিবারকে নিয়ে নয়। আর তাই একাকী জীবন-যাপন. য়ুরোপের সমাজে স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা ছাপোষা বাঙালী গেরস্তরা এমন নিঃসঙ্গ জীবনের কথা ভাবতেও পারি না।

গতবছর ওর বড় মেয়ে সুনারা গ্রাজুয়েট হয়ে চাকরি শুরু করেছিল। কিছুদিন আগে সে তার বৃটিশ বয়ফ্রেণ্ডকে বিয়ে করেছে। গৌর লণ্ডনে গিয়ে শুভবিবাহ সুসম্পন্ন করিয়েছে। সুনারা সুখে স্বামীর সঙ্গে সংসার করছে। ছোট মেয়ে ডায়না আগামী বছর গ্রাজুয়েট হবে। সে মিউজিক নিয়ে পড়াশুনা করছে।

বড়মেয়ে সুনারাকে আমি দেখেছি বছর তিনেক আগে। সে বাবার সঙ্গে পিতৃভূমি দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু ছোটমেয়ে ডায়নাকে এখনো দেখি নি। এবারে দেখা হবে ওর সঙ্গে। কৃষ্ণারণ্য ভ্রমণ শেষে আমিও বার্লিন যাবো। গৌরের কাছে থাকব কয়েকদিন। তখন ডায়না বার্লিনে আসবে।

গৌরের গাড়ি নিয়ে শঙ্কর সপরিবারে বন্ এসেছে আর গৌরকে আসতে হল বিমানে। কারণ পশ্চিম-বার্লিন হচ্ছে একটি দ্বীপের মতো, তার একদিকে পূর্ব-বার্লিন আর তিনদিকে পূর্ব-জর্মনী। গৌর বৃটিশ নাগরিক ও একসময় রয়াল এয়ারফোর্সে চাকরি করত। তাই বৃটিশ কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ছাড়া সে পূর্ব-জর্মনীর ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে পারে না।

তবে ওর আসা-যাওয়ার অসুবিধে নেই। পশ্চিম বার্লিন থেকে পশ্চিম জর্মনীর বিভিন্ন বিমানবন্দরে বৃটিশ এয়ারওয়েজের বিমান সারাদিন যাওয়া-আসা করছে। তারই কোন বিমানে সে যখন ইচ্ছে চলে আসতে পারে। আজও তাই এসেছে।

কিন্তু এখন আর গৌরের কথা নয়। তৃণাদি খেতে ডাকছেন। বাবলুও তাগিদ দিচ্ছে—দাদা, দুটো বাজে। অনেকটা পথ যেতে হবে, দেখতেও সময় লাগবে। তার ওপরে আপনি এসেছেন বলে দিদি আজ কয়েকজনকে ডিনারে বলেছেন। আটটার আগে ফিরে আসতে হবে।

অতএব খেতে আসি। খাবার দেখে গৌর ভারী খুশি হয়। এদেশে ঠাকুর-চাকর পাওয়া যায় না। তাই বড় চাকরি করেও নিজেকে রান্না করে খেতে হয়। সুতরাং লাঞ্চ টেবিলে শুক্তো দেখে

সে খুশি হয়ে ওঠে। মেমসাহেব বিয়ে করে য়ুরোপে জীবন কাটালেও সে বরিশালের বাঙাল। বড়ি দিয়ে শুক্তোর প্রতি সহজাত আকর্ষণ ত্যাগ কববে কি ভাবে ?

যাক্ গে, খাবার পরে বাপি ছাড়া আর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি ও অহীন বেরিয়ে আসি বাবলুর সঙ্গে।

দশ নম্বব বাসে চড়ে আমরা রাইনের তীরে এলাম। না, নদীটা সত্যই সুন্দর। আমি এই নদীকে দেখেছি সুইজারল্যাণ্ডের বাজেলে, দেখেছি ফ্রান্সের স্ত্রাসবুর্গে, দেখেছি জর্মনীব কোবলেঞ্জে। আজ আবার দেখছি এখানে এই বন্ শহরে। যত দেখছি, ততই ভাল লাগছে। তাব ওপরে সবাই বলেন, রাইন নাকি সবচেয়ে সুন্দর এখানে।

নদীটা এখানে বেশ বড় বাঁক নিয়েছে বাঁয়ে। নদীর দু-তীরেই জনপদ। বড় বড় বাড়ি আর গাছপালা। নদীতে টলটলে জল। জলে ভাসছে নানা আকারের জাহাজ ও স্টীমাব। নদীর দু-তীরই বাঁধানো। গভীব জল। বড় বড় জাহাজগুলিও জেটির গায়ে এসে থামতে পাবে।

আমরা ঘাটে এলাম। এ ঘাটের নাম রাইনালে (Rhinalay)।

বাবলু বেকার, তবু সে টিকেট কিনে আনল। কিছুতেই দাম নিল না। বলল—এদেশে বেকার মানে কপর্দকহীন নয়। আমি বেকার ভাতা পাই।

স্টীমারটি বিচিত্র, নিচের তলায় গাড়ি আর ওপর তলায় মানুষ। সবটা জুড়েই গদিযুক্ত আরাম কেদারার সারি। খানিকটা জায়গায় আচ্ছাদন, বাকিটা খোলা। আমরা খোলা আকাশের নিচে বসি।

একটু বাদে স্টীমার চলতে শুরু করে। অর্ধেক সিট খালি পড়ে আছে। সময়-সচেতন সারেঙ যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করেন নি।

য়ুরোপের বড় ও মাঝারী সব শহরেই এমন জলবিহারের ব্যবস্থা রয়েছে। জুরিখ, লণ্ডন, পারি, বার্লিন, রোম, এথেন্স এমনকি স্ত্রাস-বুর্গে পর্যন্ত আমি 'স্টীমার ট্রিপ' করেছি। জুরিখ ও বার্লিনে নদী

নেই। সেখানে হ্রদ ভ্রমণের ব্যবস্থা রয়েছে। রাইনে জলবিহার খুবই জনপ্রিয়।

কেনই বা হবে না। পশ্চিম য়ুরোপের প্রাণধারা রাইন। যেমন পরিষ্কার টলটলে জল, তেমনি সুগভীর। এঁরা নদীকে পূজা করেন না কিন্তু ভালোবাসেন।

পলি জমে নদীখাত যাতে বুজে না যায়, তার জলবহন ক্ষমতা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেদিকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি এঁদের। নদী যাতে তীরভূমি ভেঙে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল প্লাবিত না করতে পারে, তার ব্যবস্থাও এঁরা করে রেখেছেন। যেখানেই দরকার হয়েছে তীরভূমি উঁচু করে বাঁধিয়ে দিয়েছেন। নদী এঁদের কাছে কলুষনাশিনী নয়। তাই এঁরা কলকারখানা ও শহরের নোংরা জল নদীতে বিসর্জন দেওয়াকে অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করেন। বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় রাইনের বুকে আর তার তীরে তীরে মরণপণ লড়াই হয়েছিল। ফলে রাইনের জল হয়ে গিয়েছিল বিষাক্ত। যুদ্ধের পরে শত্রু-মিত্র সবাই মিলে রাইনকে বিষমুক্ত করে তুলেছেন। তারপরে বিজ্ঞানভিত্তিক যৌথ পরিকল্পনা তৈরি করে একযোগে রাইনের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে ব্রতী হয়েছেন। আর তারই ফলে রাইন আজ পশ্চিম য়ুরোপেব প্রাণধারা।

রাইনের জন্ম সুইজারল্যাণ্ডে। সুইস সীমান্ত ধরে চলা শুরু করে লিচ্‌টেনস্টেইন, অস্ট্রিয়া ও পশ্চিম জর্মনীর খানিকটা অংশ পার হয়ে সে বাজেল পৌঁচেছে। সেখান থেকে উত্তর বাহিনী হয়ে পশ্চিম জর্মনী ও ফ্রান্সের সীমা নির্ধারণ করে বেশ কিছুদূর পথ চলেছে। তারপরে উত্তর-পশ্চিম প্রবাহিণী হয়ে পশ্চিম জর্মনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। অবশেষে নেদারল্যাণ্ডসে গিয়ে বহুধারায় বিভক্ত হয়ে বহু বদ্বীপ সৃষ্টি করে উত্তর মহাসাগরে বিলীন হয়েছে। রাইনের দৈর্ঘ্য ১৩২০ কিলোমিটার।

রাইন পশ্চিম য়ুরোপের প্রাণধারা, কারণ কয়লা লোহা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ, তেল, গাড়ি তৈরির সরঞ্জাম ও ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং-

জিনিসপত্র পরিবহণে রাইন মোটর ও রেলপথের চেয়ে বেশি সাহায্য করেছে। সুইজারল্যাণ্ড, লিচ্‌টেনস্টেইন ও অস্ট্রিয়ায় সমুদ্র-উপকূল নেই। রাইন তাঁদের নৌবাণিজ্যের প্রধান সহায়।

১৮১৭ সালে রাইন নদীতে প্রথম স্টীমার চলে। লণ্ডন থেকে রওনা হয়ে একটি স্টীমার কোব্‌লেঞ্জ পৌঁছয়। এখন অসংখ্য মাল ও যাত্রীবাহী জাহাজ প্রতিদিন রাইন দিয়ে চলাচল করছে। সংখ্যায় ডাচ ও জর্মন জাহাজই বেশি। বর্তমানে বাজেল থেকে রটারড্যাম পর্যন্ত নিয়মিত স্টীমার সার্ভিস রয়েছে।

রাইনের কথা ভাবতে ভাবতে রাইন পার হয়ে এলাম। এ জায়গাটার নাম কোনিগস্ ভিন্টার (Konigs Winter)

স্টীমার থেকে নেমে আসি। জায়গাটি ভারী সুন্দর। নদীর তীরে তীরে পথ। গাছে ছাওয়া পথ। সারা অঞ্চলটাই পার্কের মতো। কেবল সুন্দর নয়, নির্জনও বটে। পথচারী প্রায় নেই বললেই চলে। যারা যাওয়া-আসা করছে, তারা প্রায় সবাই সাইকেলে। সুতরাং এটি অভিসার এবং দেহচর্চার আদর্শ স্থান। দুটোই সমানে চলেছে। অভিসার বিষয়ে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। আর দেহচর্চা মানে গায়ের রং ময়লা করার প্রচেষ্টা। স্বল্পবাস পরিহিত নারী-পুরুষ রোদে পুড়ছে। কেউ বই পড়ছে, কেউ বা শুধুই শুয়ে আছে।

পার্কের মতো অঞ্চলটি পার হয়ে পথের পাশে বড় বড় বাড়ি। যেমন তেমন বাড়ি নয়, মনোরম ভিলা, বাগানবাড়ি। সামনে বড় বড় গাছের ছায়ায় মরশুমী ফুলের শয্যা আর বাঁধানো জলাশয়। রাজহাঁস খেলা করছে।

বাড়িগুলোর পেছনে সবুজ পাহাড়। একটা নয়, পাশাপাশি সাতটা পাহাড়। রোম মহানগরীর মতো বন্ শহরটিও সাত পাহাড়ের নগর। আলীসাহেবের ভাষায় সপ্তশ্রীলাচল। তবে রোমের পাহাড়গুলি যেমন শহরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, এখানে পাহাড়গুলোকে বেশ চেনা যাচ্ছে।

একটা প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াই। এ বাড়ির

সামনেও বাগান আর ফোয়ারা। কিন্তু বাগানবাড়ি এত বড় হয় না। বোধকরি কোন রাজপ্রাসাদ।

—না। বাবলু বলে—ড্রেসেন হোটেল। এই হোটেলের প্রতিষ্ঠাতা মিস্টার ড্রেসেন হের হিটলারের খুব বন্ধু ছিলেন। তাই হিটলার মাঝে মাঝেই এখানে এসে রাত কাটাতেন।

বাবলুর কথা শুনে কথাটা মনে পড়ে যায়। হের হিটলারের কথা। একদা অবিভক্ত জর্মনী যাঁর কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্রবণ করত, আজও সেই এ্যাডলফ্ হিটলার জর্মনীর ধিকৃততম মানুষ।

এটি আমার জানা ছিল না। আধুনিক ইতিহাসের এই খল-নায়কের প্রতি আমার অবচেতন মনে কিছু শ্রদ্ধা অবশিষ্ট ছিল। তাঁর জীবনের সকল কলঙ্কের কথা জেনেও আমি তাঁকে একজন বীর ও দেশপ্রেমিক রূপে শ্রদ্ধা করতাম। গতবার য়ুরোপ ভ্রমণের সময় জর্মনীকে আমার ভ্রমণসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার একটি কারণ ছিল, জর্মনী হিটলারের দেশ। যেদিন জর্মনী পোলাণ্ড আক্রমণ করেছিল, সেদিন আমি আট বছরের বালক। কিন্তু তার পরদিন অমৃতবাজার পত্রিকায় ডান হাত ওপরে তুলে হিটলারের যে ছবিখানি ছাপা হয়েছিল, তা আজও আমার চোখে ভাসে। সেদিন থেকেই আমার মনে হিটলারের জর্মনী ও বার্লিন দেখার বাসনা বাসা বেঁধেছে। জীবনদেবতার অশেষ করুণায় আমার সে বাসনা পূর্ণ হল। একবার নয়, আমি দুবার জর্মনীতে এলাম।

. এসে যেমন আনন্দ লাভ করলাম, তেমনি দুঃখও পেলাম। হিটলারকে এঁরা এঁদের জাতীয় ইতিহাস থেকে মুছে ফেলেছেন। এখন হিটলার এঁদের কাছে কেবল একজন নিষ্ঠুর ক্ষমতালোভী যুদ্ধবাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর সংগঠন শক্তি, তাঁর বীরত্ব, তাঁর দেশপ্রেমের কথা এঁরা বোধকরি একেবারেই বিস্মৃত হয়েছেন। সে মানুষটা যে তাঁর দেশের জন্য কোন ভাল কাজ করেছেন, বিশ্বের বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে যে তাঁর কোন অবদান আছে, একথা কোন ইতিহাসে লেখা হয় নি। কারণ ইতিহাস পরাজিতের জন্য নয়।

তবে বৃটিশ আমেরিকা ফরাসী ও রাশিয়ার দখলমুক্ত হবার পরে দুই জর্মনী যদি আবার মিলিত হয় এবং তখন যদি জর্মনীর কোন নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখা হয়, তাহলে আশাকরি এ্যাডল্‌ফ্‌ হিটলার তাঁর যোগ্য আসন লাভ করতে পারবেন।

কিন্তু থাক গে ইতিহাসের কথা। তার চেয়ে বরং বিস্ময়কর মানুষটির কর্মময় জীবন ও শোচনীয় পরিণতির কথা ভাবা যাক। ১৮৮৯ সালের ২০শে এপ্রিল অস্ট্রিয়ায় জন্ম হয় তাঁর। শৈশবও সেখানেই কেটেছে। তিনি তরুণ বয়সে শিল্পচর্চা শুরু করেন, কিন্তু সুবিধে করতে পারেন না। তাই ভাগ্যহীন দরিদ্র যুবক রুজি রোজ-গারের আশায় ১৯১৩ সালে ম্যুনিক চলে আসেন। বহু চেষ্টা করেও মনের মতো একটা চাকরি যোগাড় করতে না পেরে যখন হতাশ হয়ে পড়েছেন, তখন হঠাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তিনি সেনা বাহিনীতে যোগদান করলেন। ১৯১৬ সালে যুদ্ধে আহত হয়ে আবার ম্যুনিক ফিরে এলেন।

১৯১৯ সালে হিটলার জর্মনীর ন্যাশনালিস্ট সোশ্যালিস্ট অর্থাৎ নাৎসী দলে যোগদান করলেন। আপন প্রতিভা বলে মাত্র এক বছরের মধ্যে তিনি দলের প্রচার বিভাগীয় প্রধানের পদে উন্নীত হলেন। ১৯২৩ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। রাজনৈতিক বন্দী রূপে তাঁকে ন'মাস জেলে থাকতে হয়। তারই মধ্যে এই পরিশ্রমী ও প্রতিভাবান মানুষটি "মেইন ক্যাম্প' নামে একখানি বই লিখে ফেললেন। লিখলেন, নাৎসী দলের আদর্শ ও কর্মপন্থার কথা। লিখলেন, তাঁর দল ক্ষমতায় এলে কি ভাবে যুদ্ধ বিধ্বস্ত জর্মনীর উন্নতি বিধান করে বৃহত্তর জর্মনীর স্বপ্নকে সফল করে তুলবেন? আর ভার্সাইচুক্তিতে জর্মনীর প্রতি যে অবিচার হয়েছে, কি ভাবে তার প্রতিবিধান করবেন?

জেল থেকে মুক্তি পাবার পরেই বইখানি প্রকাশিত হল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি জর্মনদের মন জয় করে নিলেন। তিনি ১৯৩২ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে হিণ্ডেনবুর্গের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার

সুযোগ লাভ করলেন।

নির্বাচনে তিনি পরাজিত হলেন। কিন্তু দূরদর্শী হিটলার হাল ছাড়লেন না। তাঁর অসাধারণ সাহস, বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের ফলে পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৩ সালে তিনি জর্মনীব চ্যান্সেলার নিযুক্ত হলেন। এবং এক বছরের মধ্যে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নিজেকে জর্মনীর 'ফ্যুরার্' রূপে ঘোষণা করলেন।

ডিক্টেটর পদে আসীন হবার পরেই তিনি জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে তৎপর হলেন। তাঁর নেতৃত্বে জর্মনীর দ্রুত উন্নতি হতে থাকল। বিজ্ঞানের সব বিভাগে, কৃষি, শিল্পে ও বাণিজ্যে জর্মনী অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করল। সেই সঙ্গে গঠিত হল শক্তিশালী স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জমন জাতিকে হিটলার মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করলেন।

অবশ্য সেই সঙ্গে হিটলার নিজের নিরাপত্তার প্রয়োজনে হাজার হাজার বিরোধীকে হত্যা করলেন। রাজকোষে অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি ইহুদিদের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করেন। লক্ষ লক্ষ ইহুদি দেশত্যাগী হন। লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে 'কন্‌সেণ্টেশন' ক্যাম্পে বন্দী করে দুঃসহ যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হয়।

এ সবই অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। কিন্তু রাজনৈতিক হত্যা তো প্রতিযুগে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে সংগঠিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। আর একদল ইহুদি যে দেশের সাধারণ মানুষকে শোষণ করে জর্মনীর যাবতীয় সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করে ফেলেছিলেন, এ অভিযোগও মিথ্যে নয়।

হিটলার ১৯৩৪ সালে ফ্যুরার পদ গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৯৪৫ সালে তিনি সস্ত্রীক আত্মহত্যা করেন।...

কিন্তু না, এখন আর হের হিটলারের কথা নয়। হাঁটতে হাঁটতে আমরা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে গিয়েছি। পৌঁছে গেছি মাউণ্টেন ট্রেন স্টেশনে। এবারে আর বাবলুকে টিকেট কাটতে দিলাম না।

অহীন টিকেট কিনে আনল। জনপ্রতি সাত মার্ক।

একটু বাদে গাড়ি এলো। দার্জিলিঙের টয় ট্রেনের মতো গাড়ি। তবে অমন শ্রীহীন নয়, চকচকে ঝক্ঝকে, গদি আঁটা আসন। কাচের দরজা জানলা। আর মাত্র একখানি কোচ। একে বোধকরি রেল-গাড়ি না বলে রেল-বাস বলাই ঠিক হবে।

গাড়ি ছাড়ল। আমরা পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠতে থাকলাম। নিচের রাইন উপত্যকাটি আস্তে আস্তে আরও স্পষ্ট আরও সুন্দর হয়ে উঠছে। যেন জীবন্ত একখানি বিশাল রঙীন ছবি। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে চেয়ে দেখছি। দেখছি, আর দেখছি।

দেখা শেষ হবার আগেই যাত্রার যতি পড়ল। গাড়ি থেমে গেল। আমরা উঠে এসেছি পাহাড়ের ওপরে।

গাড়ি থেকে নেমে আসি। পাহাড়ের গায়ে একফালি সমতল। একপাশে মাউণ্টেন রেলের প্লাটফর্ম, আরেকপাশে একটি রেস্তরাঁ। মাঝখানে ফাকা জায়গা।

বাবলু ছুটে গিয়ে তিনটে কোলা নিয়ে আসে। বোধকরি রেলের টিকিটের খেসারত। বাধ্য হয়ে বোতলটা হাতে তুলে নিতে হয়।

এটি পাহাড়ের শিখর নয়। শিখর আরেকটু ওপরে। একটা পায়েচলা বাঁধানো পথ বেয়ে আমরা উঠে আসি শিখরে। সেকালে একটা দুর্গ ছিল এখানে। এখন তার কিছু ভগ্নাবশেষ পড়ে রয়েছে।

কিন্তু আমরা এখানে ইতিহাসের পাঠ নিতে আসি নি। এসেছি রাইন উপত্যকার অপরূপ রূপ দর্শন করতে। আগেই বলেছি, রাইন তার সুদীর্ঘ ১৩২০ কিলোমিটার যাত্রাপথে সবচেয়ে সুন্দর এই বন্ শহরের উপকণ্ঠে। আর সেই অনিন্দ্য সুন্দর রূপটি সবচেয়ে ভাল দেখা যায় এখান থেকে।

কথাটা মিথ্যে নয়। দু-দিকের দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে দূরে, বহুদূরে। আমাদের বাঁয়ে কোব্‌লেঞ্জ আর ডাইনে বন্ এবং কোলন। মাঝখানে আঁকাবাঁকা রূপোলী রাইন। সুন্দর, সত্যই সুন্দর।

কেবল বুঝতে পারছি না, এমন সুন্দর দৃশ্য যেখান থেকে দেখা

যায়, সে জায়গাটার এমন বিশ্রী নাম হল কেন?

বাবলু বলে—এ জায়গাটার নাম ড্রাখেন-ফেল্‌স (Dracenfels)। ড্রাখেন মানে ড্রাগন আর ফেল্‌স মানে আগুন।

কিছুক্ষণ বাদে নেমে আসি প্ল্যাটফর্মে। গাড়ির অপেক্ষা করতে থাকি। হের হিটলারের ভাবনাটা আবার পেয়ে বসে আমাকে। আমি ভাবতে থাকি—

শ্রদ্ধেয় শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস' গ্রন্থে হিটলারের অন্তিম দিনগুলির যে প্রামাণ্য বিবরণ দিয়েছেন, তা বড়ই করুণ।

শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"১৫ এপ্রিল, ১৯৪৫, ইভা ব্রাউন বার্লিনে আসিলেন হিটলারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য।...তাঁর কোন 'গ্লামার' ছিল না। কিন্তু তিনি সুশ্রী ও দীর্ঘাঙ্গী ছিলেন। তাঁর দেহ ছিল সবল সুঠাম এবং কেশ ছিল চম্পকবর্ণ। তথাপি জার্মানীর এতবড় রণপ্রভুর সঙ্গিনী হওয়ার মত যোগ্যতা বা গুণাবলীও তাঁর ছিল না। হিটলার ছিলেন তাঁর চেয়ে ২৩ বছরের বড়। তবু আশ্চর্য এই যে, ইভা ও হিটলার পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন।...

যুদ্ধের অস্বাভাবিক ও বিপজ্জনক অবস্থার জন্য ২৮ এপ্রিল রাত্রি ১টা থেকে ৩টার মধ্যে (ইংরাজী মতে ২৯ এপ্রিল) হিটলার অত্যন্ত সাধারণ ও সরল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইভা ব্রাউনকে বিবাহ করিলেন। গোয়েবেলস্ ভাল্টার ভাগনার (Walter Wagner) নামে একজন সবকারী প্রশাসককে এই অভিনব বিবাহে 'পৌরহিত্য' করার জন্য ডাকিয়া আনিলেন এবং সেই বেচারা অকস্মাৎ এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন। তিনি ছাড়া এই বিবাহের আরও সাক্ষী ছিলেন গোয়েবেলস এবং বোরম্যান।...

এতদিনে ইভা ব্রাউন জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া হিটলারের পত্নী হিসাবে আইনগত স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করিলেন। এখন থেকে তিনি হইলেন 'ফ্রাউ হিটলার'। এই সংক্ষিপ্ত বিবাহ

অনুষ্ঠানের পর বিবাহ উপলক্ষে একটি ভোজের ব্যবস্থা হইল এবং সেখানে উপস্থিত ছিলেন বোরম্যান, গোয়েবেলস ও ফ্রাউ (মিসেস) গোয়েবেলস, হিটলারের দুইজন মহিলা সেক্রেটারি ও নিরামিষ রাঁধুনী এবং পরে আসিয়া যোগ দিলেন জেনারেল ক্রেবস, জেনারেল বার্গডোরফ প্রভৃতি। অতিথিরা আনুষ্ঠানিকভাবে শ্যাম্পেন পান করিলেন এবং কিছুক্ষণের জন্যে জার্মানীর ভয়াবহ অবস্থার কথা ভুলিয়া গিয়া পুরানো দিনের কিছু আনন্দের কথা নিয়া আলোচনা করিলেন। হিটলার তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া পুনরায় ঘোষণা করিলেন যে, ন্যাশনাল সোসিয়েলিজম শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁর পুরাতন বন্ধুরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে আর বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ নাই। অতিথিদের কেহ কেহ এই সময় অশ্রুসিক্ত চোখে নিঃশব্দে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন হিটলারও পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন এবং তাঁর একজন সেক্রেটারি ফ্রাউ গার্টরুড জুঙকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হিটলার তাঁর নিকট তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্র বা উইল ডিক্‌টেট্‌ করিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি দুইটি দলিল তৈয়ার করিলেন—একটি ব্যক্তিগত এবং অপরটি রাজনৈতিক। এই দলিলে মিথ্যা, অর্ধমিথ্যা, অপপ্রচার, নাৎসী মতবাদের গুণগান, ইতিহাসের বিকৃতি ইত্যাদি ঘটাইলেন এবং নিজের ব্যর্থতার জন্য অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইলেন। তথাপি ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তিনি তাঁর 'শেষ আবেদন' রাখিয়া গেলেন।...

রাজনৈতিক দলিলের দুইটি অংশ ছিল। প্রথমটি সাধারণ রকমের এবং দ্বিতীয়টি সুনির্দিষ্ট ধরনের।

রাজনৈতিক দলিলের গোড়াতেই তিনি যুদ্ধের জন্য সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করিলেন : 'একথা সত্য নয় যে, আমি অথবা জার্মানীতে অপর কেহ ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ চাহিয়াছিলেন, কিংবা এই যুদ্ধে প্ররোচনা দিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ চাহিয়াছিলেন একমাত্র সেই সমস্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতিক ধুরন্ধরগণ, যাঁরা ইহুদীবংশ সম্ভূত কিংবা যাঁরা ইহুদীদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কাজ করিতেছিলেন। নিরস্ত্রী-

করণের জন্য আমার সর্বপ্রকার প্রস্তাবের পর ভবিষ্যৎ বংশধরগণ নিশ্চয়ই আমার ঘাড়ে যুদ্ধের দায়িত্ব চাপাইয়া দিতে পারিবেন না।··· শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইবে, আমাদের শহরগুলির ধ্বংসস্তূপ ও স্মৃতিস্তম্ভ হইতে সেই সমস্ত লোকের প্রতি ঘৃণা সর্বদাই নতুন করিয়া দেখা দিবে, যারা শেষ পর্যন্ত এর জন্য দায়ী ছিল। আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদ ও সেই মতবাদের সাহায্যকারী যারা তাদেরকে এজন্য আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

অতঃপর হিটলার পোলিশ-জার্মান যুদ্ধের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া বলিলেন যে, যুদ্ধের তিন দিন আগেও তিনি পোলিশ-জার্মান সমস্যার একটা যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের শাসকচক্র এই যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়াছিলেন একদিকে বাণিজ্যিক কারণে এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদের প্রোপাগাণ্ডার চাপে।

যুদ্ধক্ষেত্রে এবং বোমাবিধ্বস্ত শহরগুলিতে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর জন্য এবং তাঁর নিজ হাতে ইহুদীদের হত্যাকাণ্ডের জন্য সমস্ত দায়িত্ব তিনি ইহুদীদের ঘাড়েই চাপাইয়া দিলেন। তারপর তিনি বর্ণনা করিলেন কেন তিনি বার্লিনে অবস্থানের জন্যই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন:

'After six years of war, which inspite of all setbacks will one day go down in history as the most glorious and heroic manifestation of the struggle for existence of a nation, I cannot forsake the city that is the Capital of this State···I wish to share my fate with that which millions of others have also taken upon themselves by staying in the town···

I have, therefore, decided to remain in Berlin and then to choose death voluntarily···I die with a joyful heart in the knowledge of the immeasurable deeds and achievements of our peasants and workers and of a

contribution unique in history of our youth which bears my name…'

২৯শে এপ্রিল অপরাহ্নে হিটলারের নিকট আর একটি ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ পৌঁছিল। তাঁর এতদিনের সহযোদ্ধা ও মিত্র এবং ইতালীর প্রাক্তন ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটর বেনিতে মুসোলিনী তাঁর উপপত্নী ক্লারা পেতাচ্চিসহ উত্তর ইতালীর পার্টিজান যোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়িয়া নিহত হইয়াছেন। হিটলার সম্ভবতঃ মুসোলিনীর নিধন হওয়ার বিস্তৃত সংবাদ জানিতেন না। কিন্তু যতটুকু জানিলেন, ততটুকুই তাঁর আত্মনাশের ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। অপরাহ্নে তিনি তাঁর প্রিয় আলশেসিয়ান কুকুর ব্লণ্ডিকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিলেন। অবশ্য তিনি নিজ হাতে এই কাজ করেন নাই। তাঁর এক সার্জেনকে দিয়া বিষপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। বাঙ্কারের অন্য দুইটি কুকুরকেও গুলি করিয়া মারা হইল।…

ক্রমেই হিটলারের জীবনের শেষ সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। তিনি তাঁর সেক্রেটারী গার্টরুড জঙকে তাঁর অবশিষ্ট দলিলপত্র পোড়াইয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন এবং সেই সঙ্গে এই নির্দেশ দিলেন যে, পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত বাঙ্কারের কেউ যেন ঘুমাইতে না যান। স্বভাবতঃই সকলে ভাবিলেন যে, এবার তিনি শেষ বিদায় নিবেন, কিন্তু ৩০শে এপ্রিল রাত্রি আড়াইটার আগে তেমন কিছু ঘটিল না। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলিয়াছেন যে, ফুরার ঐ সময় তাঁর প্রাইভেট কক্ষ থেকে সাধারণ ভোজনগারের দিকে গেলেন। সেখানে তখন জনা কুড়ি লোক, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন হিটলারের পার্শ্বচর ও মহিলা, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে হিটলার করমর্দন করিলেন এবং অস্পষ্ট স্বরে কিছু বলিলেন। তাঁর চোখ তখন বাষ্পার্দ্র ছিল। ফ্রাউ জঙের মতে 'হিটলারের চোখ তখন বাঙ্কারের প্রাচীর ভেদ করিয়া বহুদূরে তাকাইয়াছিল'। এরপর হিটলার পুনরায় তাঁর কক্ষে চলিয়া গেলেন।…

এদিকে বার্লিনেরও মৃত্যু ঘনাইয়া আসিল। কারণ, পরদিন

রুশ সৈন্যরা চ্যান্সেলারির মাত্র কয়েক মহল্লা দূরে আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু এই অবস্থায়ও কিছু কিছু সেনাপতি বাঙ্কারে আসিয়া সামরিক রিপোর্ট দিলেন—যদিও রিপোর্ট দেওয়ার কিছুই ছিল না। কারণ, বার্লিন রক্ষার আর কোন উপায়ও ছিল না। হিটলার নির্বিকার চিত্তে এই বিপর্যয়কর অবস্থার কথা শুনিলেন এবং অন্তিম লগ্নের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বেলা প্রায় ২টার সময় তিনি তাঁর লাঞ্চ খাইলেন। কিন্তু তাঁর সদ্য বিবাহিতা ইভার কোন ক্ষুধা ছিল না।...সুতরাং হিটলার যথারীতি তাঁর দুই সেক্রেটারি ও পাচিকার সঙ্গে তাঁর জীবনের শেষ আহার গ্রহণ করিলেন। কোন কথাবার্তা তিনি বলিলেন না।

বেলা আড়াইটা নাগাদ হিটলারের এস. এস. এ্যাডজুটান্ট চ্যান্সেলারির গ্যারেজের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ও হিটলারের ব্যক্তিগত সোফার এরিক কেম্পকাকে নির্দেশ পাঠাইলেন চ্যান্সেলারির বাগানে ২০০ লিটার পেট্রোল পাঠাইবার জন্য। এরিক কেম্পকা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—এই নিদারুণ সময়ে এত পেট্রোল পাওয়া যাইবে না। কিন্তু হুকুম আসিল যেভাবেই হোক যোগাড় করিতেই হইবে। তখন ১৮০ লিটার পেট্রোল সংগৃহীত হইল এবং বাঙ্কারের জরুরী নির্গমন পথে এই পেট্রোল রাখা হইল। যখন হিটলারের চিতাগ্নির আয়োজন করা হইতেছিল, তখন তিনি তাঁর শেষ আহার গ্রহণ করিয়া ইভা ব্রাউনকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠতম পার্শ্বচরদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ গোয়েবেলস, জেনারেল ক্রেবস্ এবং বার্গডফ, আর সেক্রেটারিগণ ও পাচিকা। কিন্তু সুন্দরী ও ব্যক্তিত্বশালিনী মহিলা শ্রীমতী গোয়েবেলস সেই সময় উপস্থিত ছিলেন না। তিনিও ইভার মত স্বামীর সঙ্গে একত্রে মৃত্যু বরণের জন্য কৃতসঙ্কল্প ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ৬টি নিষ্পাপ শিশু সন্তানকেও সেই সঙ্গে হত্যা করিতে হইবে, এই চিন্তায় তিনি বিচলিত ছিলেন।...

"কিন্তু হিটলার ও ইভার এই সমস্ত সমস্যা ছিল না। তাদের একমাত্র কাজ ছিল নিজেদের জীবন নাশ। সুতরাং সকলের কাছ

থেকে বিদায় নিয়া তাঁরা নিজেদের ঘরে চলিয়া গেলেন। কক্ষের বাইরে যাতায়াতের পথে ছিলেন ডঃ গোয়েবেলস, বোরম্যান এবং আরও কয়েকজন। কিছুক্ষণ পর তাঁরা একটি রিভলভারের গুলীর আওয়াজ শুনিলেন এবং আর একটি গুলীর শব্দের জন্য অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু সেই শব্দ আর পাওয়া গেল না। সুতরাং খানিকটা সময় পর তাঁরা ফুরারের আবাসকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁরা দেখিলেন সোফার উপর ফুরারের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া আছে।

তিনি তাঁর নিজের মুখে গুলী করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। তাঁর পাশেই ইভার মৃতদেহ পড়িয়া আছে। আর মেঝের উপরে দুইটি রিভলবার পড়িয়া আছে। ইভা তাঁর রিভলভার ব্যবহার করেন নাই। তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছেন।

তখন সময় অপরাহ্ন ৩-৩০ মিনিট সোমবার, ৩০শে এপ্রিল ১৯৪৫। এ্যাডলফ হিটলারের ৫৬ তম জন্ম দিবসের ১০ দিন পর এবং তৃতীয় রাইখের ভাগ্যবিধাতা হওয়ার ১২ বছর ৩ মাস পর।...

"বাঙ্কারে হিটলারের কর্মচারীরা চ্যান্সেলারির বাগানে হিটলার ও ইভার মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া গেলেন। হিটলারের মুখ চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এজন্য একটি কম্বলে তাঁর মৃতদেহ ঢাকিয়া নেওয়া হইয়াছিল। চ্যান্সেলারির বাগানে তখন রুশদের গোলা আসিয়া পড়িতেছিল এবং সেই গোলা বর্ষণের শব্দ ছাড়া এত বড় 'ঐতিহাসিক' মৃত্যুর জন্য আর সাড়া শব্দ ছিল না। গোলাবর্ষণের এক ফাঁকে বিরতির সময় হিটলার ও ইভার দেহে পেট্রোল ঢালিয়া দিয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইল এবং সেই প্রজ্জ্বলিত শিখা ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিল। জরুরী প্রবেশ পথের আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া গোয়েবেলস এবং বোরম্যান শবানু-গামীদের ভূমিকায় এ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং ডান হাত ঊর্ধ্বে তুলিয়া নাৎসী কায়দায় স্যালুইট্ বা অভিবাদন জানাইলেন।

তখনও লালফৌজের গোলায় চ্যান্সেলারির বাগান বিধ্বস্ত হইতে ছিল এবং হিটলার ও ইভার দেহ আগুনে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইতেছিল।..."

॥ পাঁচ ॥

বাপির দু-চোখের কোল বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু আসে নেমে। অশক্ত হাত দিয়ে বাপি তার চোখ মুছতে পারে না। নিজের আঁচল দিয়ে ছেলের চোখ মুছিয়ে দেন তৃণাদি। তারপরে স্নেহঝরা স্বরে সান্ত্বনা দেন—কেঁদো না বাপ! ওঁরা আবার আসবেন। তাছাড়া অহীনবাবু আজ যাবেন না, থাকবেন আমাদের কাছে।

তৃণাদির শেষের কথাটি সত্য হলেও প্রথমটি নয়। এ যাত্রায় আমি আর আসছি না এখানে। ভবিষ্যতে কখনো আসা হবে কিনা তাও জানা নেই আমার। তবু তৃণাদি তাঁর অক্ষম ও অশক্ত অথচ হৃদয়বান পুত্রকে সেই আশ্বাসই দিচ্ছেন।

তৃণাদির পরামর্শেই পালিয়ে না গিয়ে আজ আমরা ওর কাছে বিদায় নিতে এসেছি। পালিয়ে গেলে বাপি আমাদের প্রতীক্ষায় বসে থাকবে, সারারাত দু-চোখের পাতা এক করবে না। সেদিন ব্রাসেল্‌স থেকে ফিরে আসতে দেরি হওয়ায় তাই করেছে। তৃণাদি বলেছেন—আপনারা আজ বরং ওকে বলে যান। ও কান্নাকাটি করে মনটাকে হাল্কা করে ফেলুক।

কিন্তু কোন্ মা তার ছেলের চোখের জল সইতে পারে? বিশেষ করে সেই ছেলে যদি হয় অক্ষম ও অশক্ত। তাই আপন সন্তানকে মায়ের এই মিথ্যে আশ্বাস।

বাপির চোখের জল আমার চোখদুটিকে অশ্রুসিক্ত করে তুলেছে। কিন্তু আমি যে পথিক। আমাকে শক্ত হতে হবে। যেমন শক্ত হয়েছিলাম সেদিন জুরিখে সুইসবোন সিল্‌ভিয়ার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়, কিম্বা মাত্র পাঁচদিন আগে স্ত্রাসবুর্গ স্টেশনে আমার ফরাসী বোন গাব্রিয়েলের কাছে বিদায় বেলায়।*

*লেখকের 'জয়ন্তী জুরিখ' এবং 'এক ফরাসী নগরে' বই দুখানি দ্রষ্টব্য।

সেদিনও আমি এমনি অশ্রুসিক্ত চোখে বিদায় নিয়েছি। কিন্তু চোখের জল আমার চলার পথকে পিচ্ছিল করে তুলতে পারে নি। আমি এগিয়ে এসেছি দেশ থেকে দেশান্তরের পথে। আমি যে পথিক। সকল দেশের সকল কালের ক্লান্তিহীন পথিক।'

বাপির একখানি অশক্ত হাত আমার ছুহাতের মুঠোয় ভরে নিয়ে ওকে আদর করি। তারপরে বিদায় নিই ওর কাছ থেকে। বিদায় নেয় শঙ্কর আর জয়া, বিদায় নেয় অমৃত। সে তার একখানি হাত উঁচুতে তুলে বলে ওঠে—টা টা আঙ্কল, টা টা···।

—তা তা···। বাপি সাড়া দেয়।

মনে মনে অমৃতকে ধন্যবাদ দিই। আমরা যা করতে পারি নি, সে তাই করল। বাপি স্বেচ্ছায় বিদায় দিচ্ছে আমাদের। মনের মেঘ কেটে যায়। আমরা একে একে বেরিয়ে আসি বাপির ঘর থেকে। বাপি সহসা বলে ওঠে—পাখি, পাখি···

এ শব্দটার প্রকৃত অর্থ আমরা কেউ জানি না। কেবল জানি. বাপি যখন খুশি হয়, তখন সে বার বার এই শব্দটা উচ্চারণ করতে থাকে। তার মানে বাপি খুশিমনে বিদায় দিল আমাদের।

বাবলু, দিলওয়ার. ফিরোজ, মিস্টার চোপরা আর তাঁর ছেলেমেয়ে টিকু ও বিশাখা এবং উইণ্টার দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। বাবলুদের মতই ফিরোজ বাংলাদেশের যুবক। মিস্টার চোপরা বহুবছর এখানে বাস করছেন। বিশাখা ও টিকু তৃণাদির কাছে গান-বাজনা শেখে। ওদের বয়স বোধকরি ২০/২২ হবে। উইণ্টার জনৈক জর্মন যুবক। তৃণাদির ভক্ত। ভাল চাকরি করে। একখানি মার্সেডিজ গাড়ি আছে। গতবার সে আমাকে তার গাড়িতে বিমানবন্দরে পৌঁছে দিয়েছিল। বলেছিল, ভারত ভ্রমণে যাবে। দেখে আসবে জোড়াসাঁকো. শান্তি-নিকেতন, দক্ষিণেশ্বর আর বেলুড়মঠ। এখনো গিয়ে উঠতে পারে নি।

সবার সঙ্গে অহীনের কাছ থেকেও নিতে হয় বিদায়। ওর জন্য বড্ড খারাপ লাগছে। ইচ্ছে ছিল ওকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবো। কিন্তু তা সম্ভব হল না। আমাদের গাড়িখানি 'ফোর্ড

হাইওয়ে! পশ্চিম-জর্মনীর প্রধান অটোবানটি বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত ল্যুবেক (Lubeck) থেকে প্রায় সোজাসুজি দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে হ্যামবুর্গ, হ্যানোভার, কাজেল, (Kassel), ফ্রাঙ্কফুর্ট ও কার্লশ্রুহে (Karlsruhe) হয়ে সুইজারল্যাণ্ডের বাজেল পর্যন্ত বিস্তৃত। আরেকটি অটোবান কার্লশ্রুহে থেকে শুরু হয়ে প্রায় সোজাসুজি পূর্বদিকে প্রসারিত হয়ে স্টুটগার্ট, অগ্সবার্গ ও ম্যুনিক ছুঁয়ে অস্ট্রিয়া সীমান্তের স্যাল্‌জ্‌বার্গ পর্যন্ত প্রসারিত। কোলন্ থেকে একটি জাতীয় সড়ক উত্তর-পূর্বে অগ্রসর হয়ে হ্যানোভার এসেছে আর দক্ষিণ-পূর্বে প্রসারিত হয়ে কার্লশ্রুহে পৌঁছেছে।

—তার মানে আমরা পরশু অটোবান দিয়ে যাই নি?

—আক্ষরিক অর্থে তাই। তবে বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গের অটোবানদুটি যথাক্রমে কোলন ও কেব্‌লেঞ্জ এসে জর্মনীর এই জাতীয় সড়কে মিশেছে। এই জাতীয় সড়কটি নামে অটোবান না হলেও কোনমতেই অটোবানের চেয়ে তুচ্ছ নয়।

—পরশু তো আমরা এই পথ দিয়েই কোব্‌লেঞ্জ থেকে বন ফিরে এসেছি? আমি জিজ্ঞেস করি।

সহাস্যে শঙ্কর উত্তর দেয়—আর আজ আবার বন থেকে কোব্‌লেঞ্জ চলেছি।

গৌর পেছন থেকে বলে ওঠে—আমরা এখন কোব্‌লেঞ্জ চলেছি কারণ কোব্‌লেঞ্জ হল রাইন এবং মোজেলের সঙ্গম। সেখান থেকে আমরা মোজেল উপত্যকার পথ ধরে কার্লশ্রুহে পৌঁছব। এই পথটি য়ুরোপের সুন্দরতম প্রাকৃতিক পথগুলির অন্যতম। পথটির নাম ভাইন স্ট্রাসে। জর্মনরা 'ভাইন' শব্দটি লেখেন 'w' দিয়ে। সুতরাং পথটিকে অনায়াসে 'ওয়াইন এভেন্যু' বা সুরা সরণি বলা যেতে পারে।

—পথটি যে রমণীয় হবে, তা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু সে পথ চলতে চলতে আবার মাতাল হয়ে যাবো না তো?

—তা একটু হুঁশিয়ার থাকতে হবে বৈকি! কারণ সর্বত্রই প্রচুর ওয়াইন পাবেন এবং আপনার বাঁদিকের মানুষটি মদ দেখলেই চুকচুক

করতে থাকে। আমাকে শিখণ্ডী করে জয়া শঙ্করের ওপর এক হাত নিয়ে নিল।

শঙ্কর কিন্তু কোন প্রতিবাদ করে না। সে অন্যকথা বলে—কার্লশ্রুহে স্টুটগার্ট ও বাজেলের মধ্যবর্তী রাইন উপত্যকাই ব্ল্যাক-ফরেস্ট।

আমি কিছু বলতে পারার আগেই গৌর বলে ওঠে—কোব্‌লেঞ্জ এসে গেল। সামনে দেখা যাচ্ছে।

আমি দেখি। পরশু রাতে শুধু আলো দেখে বিদায় নিয়েছি। শহরটির গঠন-প্রকৃতি বুঝতে পারি নি। আজ দিনের আলোয় খানিকটা অনুমান করতে পারছি। দেখতেও ভাল লাগছে। রাইনের তীর দিয়ে পথ। বাঁদিকে রাইন, ডাইনে জনপদ। পথের পাশে গাছের সারি তারপরে বাড়ি। জনপদের শেষে পাহাড়। পাহাড়ের ওপরেও কিছু কিছু বাড়ি-ঘর।

শঙ্কর গাড়ির গতিবেগ কমায়। গৌর বলতে থাকে—কোব্‌লেঞ্জ সুপ্রাচীন জনপদ। জায়গাটির অবস্থান দেখে খুশি হয়ে রোমানরা খ্রীষ্টীয় ১৪ থেকে ৩৭ সালের মধ্যে কোনো সময়ে দুই নদীর সঙ্গমে একটি সেনানিবাস নির্মাণ করেন। কিছুকালের মধ্যেই সঙ্গমটি বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। সেইসঙ্গে একটি জনপদ গড়ে ওঠে। তারপরেই বহিরাক্রমণ ঘটে। জনপদটি ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু জনশূন্য হয় না। আবার গড়ে ওঠে জনপদ। ত্রয়োদশ শতকে সেই রোমান সেনানিবাসের জায়গায় তৈরি হয় 'ইলেক্টরস্ ক্যাসেল'। এখন সেটি শহরের গ্রন্থাগার।

এই শহরের ঐতিহাসিক অট্টালিকাসমূহ প্রায় সবই দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে নির্মিত। এবং সেই সময়টাই কোব্‌লেঞ্জের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় যুগ। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীতেও কয়েকটি বড় বড় বাড়ি তৈরি হয়েছে এবং সে সময়টাও বেশ গৌরবময়।…

আমরা শহরে প্রবেশ করলাম। পথের দু-পাশেই বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট, হোটেল-রেস্তরাঁ। পুরনো শহর। পথ খুব চওড়া

নয়। বরং সরু বলা যেতে পারে। কিন্তু যেমন মসৃণ তেমনি পরিচ্ছন্ন।

গৌর আবার বলতে শুরু করেছে—এখানকার রাইনকে বলা হয় 'মিড্‌ল রাইন' বা মধ্য-রাইন। কোব্‌লেঞ্জ এই অঞ্চলের হৃৎপিণ্ড। এখানে দুটি নদী ও একটি পাহাড় এসে মিলিত হয়েছে। পাহাড়টির নাম আইফেল (Eifel)। রাইনের পুবদিকটা মালভূমির মতো উঁচু আর পশ্চিমে পাহাড়ের ঢালে বনভূমি। বনভূমিতে প্রচুর স্বাস্থ্য-নিবাস নির্মিত হয়েছে। রাইন উপত্যকার সবচেয়ে রমণীয় অঞ্চলের প্রবেশ তোরণ এই কোব্‌লেঞ্জ।

কোব্‌লেঞ্জ বেশ বড় শহর। জনসংখ্যা এক লক্ষের ওপরে। এটি মধ্য-রাইন অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সেই সঙ্গে জেলাসদর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই শহরে বার বার বিমান আক্রমণ হয়েছে। ফলে শহরের শতকরা পঁচাশি ভাগ বাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের পরে আবার গড়ে উঠেছে শহর। এমনকি ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাড়িগুলোকে পর্যন্ত ঠিক আগের মতো করে তৈরি করা হয়েছে।

রাইন ও মোজেল দুটি নদীই নাব্য। নদীপথে এখান থেকে ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড ও লুক্সেমবুর্গ যাওয়া যায়।

একবার থামে গৌর। তারপরে বলে—আরও একটি কারণে কোব্‌লেঞ্জ জর্মনীর ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হয়ে রয়েছে।

—কি? আমি প্রশ্ন করি।

গৌর উত্তর দেয়—এই কোব্‌লেঞ্জ শহরেই ১২২৬ সালে জর্মনীর 'অর্ডার অব নাইটস' (Knights)-এর প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়।

—জর্মনরাও কি নাইটদের স্যার বলেন?

—না। বলেন, ডয়েট্‌শার (Deutscher)···

গৌর আর কিছু বলতে পারার আগেই গাড়ি থেমে যায়। তাকিয়ে দেখি একটা পাথর বাঁধানো প্রশস্ত প্রাঙ্গণে গাড়ি থেমেছে।

তিনদিকে বাড়ি আর দোকানের সারি। তারই মাঝে এই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। আরও অনেক গাড়ি সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মানে এটা একটা 'কারপার্ক'।

হ্যাঁ, তাই বটে। মাঝখানের খানিকটা অংশ বাদ দিয়ে বাকি জায়গাটায় সাদা দাগ দিয়ে গণ্ডী আঁকা। প্রতি গণ্ডীর শেষে ফুট-পাথের ওপরে একটি করে মিটার বসানো।

গাড়ি থেকে নেমে আসি সবাই। শঙ্কর গাড়ি বন্ধ করে গৌরকে জিজ্ঞেস করে—কতক্ষণ লাগবে বলুন তো ?

—এখন···

—সাড়ে চারটা। জয়া বলে ওঠে—তার মানে আমরা মাত্র একঘণ্টায় মাসির বাড়ি থেকে কোব্‌লেঞ্জ চলে এলাম। আর সেদিন লেগেছিল চারঘণ্টার ওপরে।

গৌর মাথা নাড়ে। তারপরে শঙ্করকে বলে—ঘণ্টা তুয়েকের চার্জ, মানে একটা মার্ক ফেলে দাও মিটারে।

—তু ঘণ্টার চার্জ তো আশি সেণ্ট।

—খুচরো থাকলে, তাই ফেলো।

জয়া ব্যাগ খুলে আশি সেণ্ট বের করে শঙ্করের হাতে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অমৃত চেঁচিয়ে ওঠে—আমি ফেলব বাবা, আমি···

ছেলের হাতে পয়সাগুলো দিয়ে শঙ্কর ছেলেকে কোলে নেয়। শ্রীমান অমৃত এক এক করে মিটারের ফুটো দিয়ে পয়সাগুলো গলিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মিটারে আটটি ঘর লাল হয়ে যায়। এ মিটার-গুলোতে সবশুদ্ধ বারোটা করে ঘর আছে। প্রতি ঘর সাদা হয়ে যেতে পনেরো মিনিট সময় লাগবে। তার মানে এখানে তিনঘণ্টার বেশি গাড়ি পার্ক করার নিয়ম নেই।

অমৃতকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে শঙ্কর ক্যামেরা খোলে। আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলি।

ছবি নেওয়া হলে শঙ্করের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করি।

কয়েক মিনিট হেঁটে রাইনের তীরে আসি। বাঁধানো তীরভূমি।

তীরের কাছেই গভীর জল। বড় বড় জাহাজগুলি পর্যন্ত জেটিতে এসে ভিড়েছে। পরশু ফ্রান্স থেকে রেলে জর্মনী আসার পথেও রাইনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। এই একই ব্যাপার দেখেছি।, গতকাল বন্ শহরের উপকণ্ঠে এবং আজ এখানে রাইনের বাঁধানো তীরভূমি আর গভীর জল দেখে পুলকিত হচ্ছি। এঁরা নদীকে পুজো করেন না, কিন্তু ভালোবাসেন। নদী এঁদের কাছে কলুষনাশিনী নয়, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ উৎস।

এটাই স্টীমার ঘাট। একখানি তেতলা প্রকাণ্ড স্টীমার এবং কয়েকখানি মাঝারী ও ছোট স্টীমার বিভিন্ন জেটিতে নোঙর করে আছে। শঙ্কর খোঁজ-খবর নিয়ে এসে জানায়—কিছুক্ষণ আগে 'ট্রিপ্' চলে গেছে, পরের ট্রিপ্ পাঁচটা দশ মিনিটে।

—তার মানে আমাদের আধঘণ্টা বসতে হবে। জয়ার কণ্ঠে বিরক্তি।

গৌর হেসে বলে—তাতে কি হয়েছে? চলো, ততক্ষণে পায়ে হেঁটে একবার সঙ্গম থেকে ঘুরে আসা যাক।

হাঁটতে হাঁটতে সঙ্গমে আসি—রাইন আর মোজেল নদীর সঙ্গম। মোজেল এসে মিলিত হয়েছে রাইনের সঙ্গে। দুটি নদীর মাঝে কোব্লেঞ্জ শহরের মূল অংশ। মোজেলের ওপারেও গড়ে উঠেছে জনপদ। আর তাই শহরের দুই অংশে যাতায়াতের জন্য কয়েকটি পুল রয়েছে।

দুই নদীর মিলনস্থলটি ত্রিভুজাকৃতি। মিলনবিন্দুটি খুবই সংকীর্ণ, দূর থেকে তীরের ফলার মতো মনে হচ্ছিল। দুই নদীর তীরভূমি সহ সমগ্র সঙ্গম এলাকাটি পাথর বাঁধানো।

গৌর বলে—এই অংশটির জর্মন নাম ডয়েট্শ এক (Deutsches Eck)। ১২১৬ সালে স্থানীয় নাইটদের উপস্থিতিতে এই নামকরণ হয়েছিল। শ' তিনেক বছর বাদে য়ুরোপীয় রণেসাঁসের সময় এখানে একটি অট্টালিকা নির্মিত হয়।...

—কোন্‌টি? সামনের এই চৌকো দোতলা বাড়িটা বোধহয়?

মাঝখান থেকে জয়া বলে ওঠে।

গৌর মৃদু হাসে। তারপরে বলে—তা বলতে পারো। তবে তুমি তো জানো, বিগত বিশ্বযুদ্ধে কোব্‌লেঞ্জ খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আর তারই ফলে সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত বাড়িটাও ধ্বংস হয়ে যায়। যুদ্ধের পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িটাকে আবার অবিকল আগের মতো করে তৈরি করা হয়েছে।

গৌর থামতেই শঙ্কর বলে—সামনে ঐযে গির্জাটি দেখা যাচ্ছে, ওটির নাম সেণ্ট কাসটোর (Kastor)। এই ক্যাথোলিক গির্জাটি কোব্‌লেঞ্জ শহরের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা মন্দির।

—তার মানে আরও গির্জা আছে এ শহরে ? জিজ্ঞেস করি।

শঙ্কর উত্তর দেয়—আছে বৈকি। তবে আমি মাত্র আর দুটি গির্জা দেখেছি। একাদশ শতকে নির্মিত প্রোটেস্টাণ্ট্‌দের সেণ্ট্‌ ফ্লোরিন (Florin) এবং ত্রয়োদশ শতকে রোমানদের নির্মিত লিবফ্রাউয়েনকির্শে (Liebfrauenkirche)। এটি কোব্‌লেঞ্জ শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবালয়।

—গির্জা ছাড়া এখানে আর কি প্রাচীন দর্শনীয় বস্তু রয়েছে ?

—একটি ব্যারাক বাড়ি। ১৭০১ সালে নির্মিত। সত্যি দেখবার মতো।

—কিন্তু এদিকে যে পাঁচটা বাজে ! স্টীমার ভর্তি হয়ে যাবে। জয়া প্রায় আঁতকে ওঠে।

ঘড়ি দেখি। জয়া ঠিকই বলেছে। পাঁচটা দশের স্টীমার না ধরতে পারলে, আমরা আর জলবিহার করতে পারব না। সন্ধের আগে আমাদের কখেম (Cochem) পৌঁছতে হবে। নইলে সেখানে রাতের আশ্রয় পাওয়া মুশকিল হতে পারে।

অতএব ফিরে আসি স্টীমার ঘাটে। না, স্টীমার ধরতে কোন অসুবিধে হয় না। অসুবিধে হয় না বসার জায়গা পেতে। কারণ আমাদের পাঁচজনকে বাদ দিয়ে আর মাত্র জনাবিশেক যাত্রী। অথচ স্টীমারটির ওপরে ও নিচে কম করে শ'তিনেক লোকের বসার ব্যবস্থা

রয়েছে। কেবল আপার ডেকেই বোধকরি শ'দুয়েক লোক বসতে পারেন।

আমরা সিঁড়ি বেয়ে আপার ডেকে উঠে এসেছি। . এখানে একপাশে সারেঙের কেবিন আর ড্রিঙ্ক্‌স কাউন্টার। বাকি জায়গাটা জুড়ে বেঞ্চির সারি। দু-সারি বেঞ্চির মাঝখানে টেবিল পাতা। মাথার ওপরে এখন কোন আচ্ছাদন নেই। তবে প্রয়োজনে আচ্ছাদিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। এখন কেবল চারিদিকে রেলিং ঘেরা।

যাত্রীরা সবাই ওপরে উঠে এসেছেন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছেন আমরা বৃহত্তম দল, পাঁচজন। বাকি যাত্রীরা প্রায় সকলেই জোড়ায়-জোড়ায়। তাঁরা নির্জনতা পছন্দ করছেন। তাই তাঁরা কেউ আমাদের কাছাকাছি বসেন নি।

ড্রিঙ্ক্‌স কাউন্টার থেকে একটি করে 'কোলা'র বোতল হাতে নিয়ে আমরা বেশ জাঁকিয়ে বসেছি। আমাদের মাথার ওপরে নীল আকাশ, চোখের সামনে দূর দিগন্ত আর সারা শরীরে রাইনের বাতাস। আমরা দেখি, শুধু চেয়ে চেয়ে চারিদিক দেখি।

যাত্রী না হলেও, যথাসময়ে স্টীমার ছাড়ল। এবং সেইসঙ্গে শুরু হল ঘোষণা। বলা বাহুল্য জর্মন ভাষায়। কিন্তু আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না। শঙ্কর অনুবাদ করে বলে চলে—এটি হচ্ছে রাইন আর মোজেলের সঙ্গমে একঘন্টার জলবিহার। এই জলযাত্রায় যোগদান করার জন্য স্থানীয় পর্যটন দপ্তর আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।···

স্টীমার রাইনের বুক বেয়ে সঙ্গমের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমাদের বাঁয়ে কোব্‌লেঞ্জ। ছবির মতো সুন্দর শহর। বাড়ি-ঘর পথ পার্ক ও গাছপালা। পথের পাশে গাছের সারি, আর পার্কে-পার্কে গাছের জটলা।

য়ুরোপের যেখানেই গিয়েছি, গাছপালা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। জুরিখ লণ্ডন পারি স্টক্‌হোম কোপেনহ্যাগেন রোম এথেন্স। সর্বত্রই দেখেছি গাছের বাহার। কিন্তু গাছের প্রতি জর্মনদের মমত্ববোধ বোধকরি সবার ওপরে। কারণ বিগত বিশ্বযুদ্ধে যে জর্মনীর শহরগুলি বৃক্ষশূন্য

হয়ে গিয়েছিল। তার মানে এই গাছগুলোর বয়স বড়জোর চল্লিশ বছর। এবং ঠিকমত পরিচর্যা করলে যে একটা শহর চল্লিশ বছরে কি রকম সবুজ হয়ে উঠতে পারে, কোব্‌লেঞ্জ তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

আমরা সঙ্গমে আসি, রাইন আর মোজেলের সঙ্গম। বাঁদিক থেকে মোজেল এসে রাইনে বিলীন হয়েছে। সেই পাথর বাঁধানো সঙ্গমস্থল। এখান থেকে সত্যি তীরের ফলার মতই মনে হচ্ছে। মোজেলের দু-তীরই বাঁধানো, দু-তীরেই শহর, কোব্‌লেঞ্জ। মোজেলের ওপরে পর পর গুটিতিনেক পুল দেখা যাচ্ছে। একটি পুলের ওপরে ছাউনী রয়েছে।

এখান থেকে মোজেলের ওপর দিয়ে শহরের শেষ সীমা দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে শহর ছাড়িয়ে সবুজ পাহাড় আর নীল দিগন্ত, যেখানে আকাশ নেমে এসেছে পাহাড়ের কোলে।

পাহাড় কেবল শহরের দিকে নয়। পাহাড় রয়েছে রাইনের ওপারে। ওদিকেও বাড়ি-ঘর দেখতে পাচ্ছি। তবে তা খুবই কম, কেবল দু-চারটি। তাইতো হবে। ওপারটা তো আর দু-হাজার বছরের পুরনো শহর নয়।

রাইন কিন্তু মোটেই ফাঁকা নয়, তার বুকে বেশ ভিড়। ছোট বড় ও মাঝারী জাহাজ ও স্টীমার যাতায়াত করছে অবিরত। সুইস পতাকা নিয়ে একটা বড় টুরিস্ট স্টীমার কোব্‌লেঞ্জ ঘাটে ভিড়ছে। আগেই বলেছি য়ুরোপের মানুষ বড়ই পর্যটনপ্রিয়। তার ওপরে এটা জুন মাস। পর্যটন-ঋতুর মধ্যাহ্ন। এসময় স্থলপথ ও বিমান-পথের মতো জলপথেও প্রচুর পর্যটক দেশ থেকে দেশান্তরের ভ্রমণ করেন। আর পর্যটন ব্যবসায় সুইজারল্যাণ্ড সবার ওপরে।

আধঘণ্টার ওপরে রাইন নদীতে জলবিহার করে আমরা আবার সঙ্গমে ফিরে এলাম। ডাইনে বাঁক নিয়ে মোজেল নদীতে প্রবেশ করলাম। ছোটনদী, পূর্ববঙ্গের একটি বড়খালের মতো চওড়া।···

কিন্তু থাক্‌গে, মোজেলের কথা পরে হবে। তার আগে আরেক-বার সঙ্গমকে দেখা যাক। সঙ্গমস্থলটি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

জায়গাটি ফাঁকা। গুটিকয়েক গাছ-ছাড়া আর কিছু নেই। রেলিঙে ঘেরা পাথর বাঁধানো ছায়াশীতল। বালি নেই, মাটি নেই, রোদ নেই, ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে চমৎকার একফালি জায়গা। মনে পড়ছে প্রয়াগের কথা। আমরা কি এভাবে বাঁধিয়ে নিয়ে গাছ লাগিয়ে জায়গাটাকে আরও রমণীয় করে তুলতে পারি না? নদীর ভাঙন অথবা বর্ষার প্লাবনকে রুখে সঙ্গমটিকে এই রকম স্থায়ী ভূখণ্ডে পরিণত করতে পারলে কিন্তু সেটি এর চাইতে অনেক বেশি রমণীয় হয়ে উঠতে পারে।

রেলিঙে ভর দিয়ে বেশ কয়েকজন নারী-পুরুষ সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওঁরা আমাদের দেখছেন। আমরাও ওঁদের দেখছি। দেখে মনে হচ্ছে ওঁরাও পর্যটক। তাহলে ওরা আমাদের মতো জল-বিহার না করে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? কি জানি, হয়তো জলবিহার করে আবার সঙ্গমটি দেখছেন? কিম্বা এই স্টীমারটি ধরতে পারেন নি, পরের যাত্রায় অংশ নেবেন। যাত্রী হোক্ কি না হোক্, কর্তৃপক্ষ ঘণ্টায় ঘণ্টায় জলবিহারের ব্যবস্থা করেছেন।

আবার মাইক গর্জে ওঠে। ঘোষক তেমনি জর্মনে বলে চলেছেন। এবারে জয়া আমার সহায় হয়। বলে—ঘোষক মোজেলের দুই-তীরে শহরের কথা বলছেন। এই প্রথম বাঁকের কাছে দেখুন, ত্রয়োদশ শতকে নির্মিত একটি রোমান ব্যাসিলিকা (Basilica), নাম সেন্ট্ লাউরেনটিউস (Laurentius)। ঐ উপাসনা মন্দিরের দেওয়ালে সেকালের কিছু স্মরণীয় চিত্রসম্ভার রয়েছে। রয়েছে ১৪৬৭ সালে নির্মিত একটি পাথরের বেদি এবং যীশুখ্রীষ্টের ভারী সুন্দর একখানি মূর্তি।

প্রথম বাঁকটির পরে মোজেল বেশ খানিকটা সোজা প্রবাহিতা। তারপরে সেই ছাউনী দেওয়া পুল। আমরা পুলের তলা দিয়ে সামনে এগিয়ে চললাম।

মাইক আবার গর্জে উঠল। জয়া জানায়—ঘোষক বলছেন, কোখলেম্ শহরে দুটি মিউজিয়াম ও দুটি থিয়েটার রয়েছে। আমাদের

বাঁদিকে দেখুন মিটেল রাইন (Mittel Rhein) মিউজিয়াম। এখানে আদি ও মধ্যযুগীয় রাইন উপত্যকার কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে। আছে আধুনিক রাইন-শিল্পকলার কিছু উল্লেখ-যোগ্য অঙ্কন।

আরও একটি মিউজিয়াম রয়েছে এখানে, মিটেল রাইনিশে (Mittel Rheinische)। সেখানে পরিবহণ তথা ডাক ও বেতার ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ওপরে মূল্যবান দলিল ও তথ্যচিত্র দেখতে পাবেন। কিন্তু সে মিউজিয়ামটি আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না, কয়েকটা বড়-বড় বাড়ি আড়াল করে রেখেছে।

আর বাঁদিকে ঐযে নদীর ধাবে বড় বাড়িটার চমৎকার বহির্ভাগ দেখা যাচ্ছে, ওটি হচ্ছে 'থিয়েটার.' এই শহরের বৃহত্তম নাট্য-নিকেতন। পুরোনও বটে, ১৭৯১ সালে নির্মিত। আকারেও ছোট নয়, পাঁচ-শ' আসন রয়েছে।

ঘোষকের ঘোষণা শেষ হয়। স্টীমার ফিরে চলে সঙ্গমের দিকে। আমাদের জলযাত্রার যতি আসন্ন। অস্তগামী সূর্যের সোনালী আলোয় শহরটিকে মনে হচ্ছে স্বর্ণপুরী। আর মোজেলকে সোনার নদী।

সত্যই সোনার নদী। কতটুকুই বা চওড়া। আগেই বলেছি পূর্ববঙ্গের একটা বড় খালের মতো। কিন্তু যেমন গভীর, তেমনি টলটলে জল। কেনই বা হবে না। এদেশে যে নদীকে দিয়ে নর্দমার কাজ করানো হয় না আর বারোমাস নদী কাটা ও পরিষ্কার করা হয়। ফলে মোজেলের মতো ছোটনদীও সর্বদা নাব্য। স্টীমার যাতায়াত করে লুক্সেমবুর্গ হয়ে ফ্রান্স।

মোজেল উপত্যকার আঙ্গুর জগদ্বিখ্যাত। ফলে এই উপত্যকায় গড়ে উঠেছে মদশিল্প। মোজেল শুধু তার উপত্যকাকে উর্বর করেই ক্ষান্ত হয় নি, সেই সঙ্গে এ অঞ্চলের শিল্পসম্ভার পরিবহণের দায়িত্ব গ্রহণ করে দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। তাই মোজেলের কাছে জর্মনদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

আমরাও এখান থেকে মোজেল উপত্যকায় প্রবেশ করব। তার ভুবনমোহিনী ভাইন (Wine) স্ট্রাসে বা দ্রাক্ষা সরণি দিয়ে কৃষ্ণারণ্যের পথে এগিয়ে যাবো। তাই মমতাময়ী মোজেলকে প্রণাম করে আজকের এই রমণীয় জলযাত্রার যতি টানলাম।

॥ ছয় ॥

বিকেল সাতটায় কোব্‌লেঞ্জ থেকে রওনা হওয়া গেল। আগের মতই শঙ্কর গাড়ি চালাচ্ছে। আমি তার পাশে। পেছনে গৌর জয়া আর অমৃত।

মোজেলের তীরে তীরে প্রায় সোজা ও সমতল পথ। মোজেলের ছপাশেই পাহাড়। নদীর উপত্যকা থেকে আস্তে আস্তে ওপরে উঠেছে। পাহাড়ের ঢালে আঙ্গুর আর আপেল ক্ষেত। তারই পাশে পাশে মসৃণ পথ।

আমরা গিরিশিরার ওপরে উঠে এলাম। একটা পুলে উঠলাম। এপাশের গিরিশিরা থেকে ওপাশের গিরিশিরা পর্যন্ত ঝুলন্ত পুল। খুবই মজবুত। একদম ছলছে না।

আমরা কিন্তু এত উঁচুতে এত বড় পুল তৈরি করতাম না। পুলটির দৈর্ঘ্য কমাবার জন্য রাস্তাটাকে নদীর বেলাভূমিতে নামিয়ে নিয়ে যেতাম। সেখানে পুল তৈরি করে আবার রাস্তাটিকে ওপরে তুলে আনতাম। ফলে কয়েকমাইল চড়াই উৎরাই করতে হত।

আর এদেশে, কেবল এদেশেই বা বলি কেন? সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন, ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে আমি একই জিনিস দেখেছি। পথিকের পথশ্রম লাঘব করার জন্য ওপর দিয়ে পুল তৈরি করা হয়েছে। ফলে পথ-সংক্ষেপ হচ্ছে। আর গাড়ির গতিবেগ অক্ষুন্ন থাকছে।

নদী পার হয়ে ওপারের পাহাড় থেকে এপারের পাহাড়ে এলাম।

একই রকম পাহাড়, আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে যাওয়া সবুজ পাহাড়। পাহাড়ের ঢালে তেমনি আপেল আর আঙ্গুর ক্ষেত। আপেল নয়, আঙ্গুরের কথা বলতে শুরু করে গৌর। সে বলে—এই রাস্তাটা কোব্‌লেঞ্জ থেকে ট্রিয়ের (Trier) চলে গেছে। ট্রিয়েরে জার নদী (Saar) এবং রুভের নদী (Ruwer) এসে মোজেলে মিশেছে। জার এবং রুভার উপত্যকা দুটিও বৃহত্তর মোজেলে উপত্যকার অংশ। মোজেল উপত্যকা মদশিল্পের জন্য খুবই প্রসিদ্ধ। এই উপত্যকার মদকে বলা হয় 'হোয়াইট ওয়াইন।' সুরারসিকগণ বলেন মোজেলের তীরেই সবচেয়ে ভাল আঙ্গুর ফলে। আর সেই আঙ্গুর থেকেই শ্রেষ্ঠ হোয়াইট ওয়াইন তৈরি হয়।

সে যাই হোক। মোটকথা এ অঞ্চলের হোয়াইট ওয়াইন বিশ্বশ্রেষ্ঠ এবং সেই মদ তৈরির আঙ্গুর পাওয়া যায় এই উপত্যকার মধ্যাঞ্চলে, আগামীকাল আমরা সেই অঞ্চলটি অতিক্রম করব।

গৌর চুপ করে। আমি বাইরের দিকে তাকাই। পাহাড়ের ওপরে গাছপালার মাঝে একটা প্রাচীন দুর্গ। আঙ্গুরের অধিকার নিয়ে বহু রক্ত ঝড়েছে এ উপত্যকায়। ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐ দুর্গটি সেই হানাহানির সাক্ষী হয়ে আজও রয়েছে দাঁড়িয়ে।

নিচে নদীর তীরে কিছু বাড়ি-ঘর আর একটি পর্যটক শিবির মানে গাড়ির কলোনী। ইংরেজীতে বলা হয় 'Trailer Park'. পর্যটন-কেন্দ্রগুলিতে পর্যটকদের জন্য এরকম অস্থায়ী শিবির গড়ে তোলা হয়।

গাড়ির কলোনী হলেও গাড়িগুলো নিজের থেকে চলতে পারে না। তাই এগুলোকে গাড়ি না বলে চাকা লাগানো বাড়ি বললেই ঠিক বলা হয়। চার-চাকার এই অস্থায়ী আবাসগুলোকে অন্য গাড়ি টেনে নিয়ে আসে। এতে বেডরুম আছে, কিচেন আছে। আছে বাথরুম ও টয়লেট। জলের পাইপ, ইলেট্রিক্ লাইন ও ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রয়েছে। এইরকম কোন জায়গায় ওগুলোকে টেনে এনে জল গ্যাস ও বৈদ্যুতিক লাইনের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়।

ব্যাস্, সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা ওয়ান-রুম ফ্ল্যাট বাড়িতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

মধ্যবিত্ত পর্যটকরা এখন য়ুরোপে এই গাড়ি বা 'ক্যারাভান' খুব বেশি ব্যবহার করছেন। হোটেল কিম্বা মোটেল তো বটেই, টুরিস্ট্ লজ এমনকি পেনসন (Pension) পর্যন্ত অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। তুলনায় এই ক্যারাভানের ভাড়া অনেক কম। এগুলো ভাড়া নিয়ে নিজের গাড়ির পেছনে জুড়ে তাঁরা বেড়াতে চলে আসেন। এই ক্যারাভানগুলো খুবই হালকা, তার ওপরে তেলের মতো মসৃণ পথ। বয়ে বেড়াতে কোন অসুবিধে নেই।

এবারে তীরভূমি থেকে নদীর দিকে তাকাই। সেই স্বচ্ছ ও সুগভীর জলধারা। প্রচুর স্পীড্-বোট ও ছোট-বড় স্টীমার চলাচল করছে। পাহাড়ী নদী কিন্তু কি আশ্চর্য নাব্য।

নদীর ওপরে একটা বাঁধ। বাঁধের ওপর দিয়ে আমরা নদী পার হয়ে এলাম। আবার তেমনি তীরপথ ধরে চললাম এগিয়ে। তবে এতক্ষণ চলেছিলাম স্রোতের বিপরীতে, এখন চলেছি স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে। বন্ থেকে রওনা হবার পরে কোব্লেঞ্জ পর্যন্ত এসেছি উত্তর-পূর্বে, এখন চলেছি উত্তর-পশ্চিমে। এটি অটোবান কিম্বা ন্যাশনাল হাইওয়ে নয়, অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ পথ কিন্তু ভারী মসৃণ। আর সৌন্দর্যের কথা তো আগেই বলেছি। মোজেলের তীরে তীরে আঙ্গুর আর আপেল বাগানে ঘেরা মনোরম সরণি।

না, শঙ্করকে বেশিক্ষণ পাহাড়ী পথে গাড়ি চালনা করতে হল না। আমরা একটা প্রশস্ত উপত্যকায় নেমে এলাম। পাহাড় এখানেও রয়েছে। তবে পথের ডানদিকে উপত্যকার শেষে বেশ খানিকটা দূরে, আর নদীর ওপারে। বলা বাহুল্য নদী মানে মোজেল। তারই বনাবৃত সমতল বেলাভূমির বুক চিরে পথ। পথের পাশে সারি সারি বাড়ি। সমতল উপত্যকায় আর পাহাড়ের গায়ে। মাঝে মাঝে এই পথ থেকে বাড়ি-ঘরের ভেতর দিয়ে পথ উঠে গিয়েছে পাহাড়ে।

শঙ্কর বলে—কখেম, মোজেল উপত্যকার রমণীয় শৈলবাস।

—আজ আমরা এখানেই রাত কাটাবো। জয়া যোগ করে।

গৌর বলে—এবারে একটা সীমার ফ্রাই (Zimmer Frei) খুঁজে বের করতে হবে।

শঙ্কর মাথা নাড়ে।

জয়া আমাকে বুঝিয়ে দেয়—সীমার মানে বেডরুম, ফ্রাই মানে খালি। সীমার ফ্রাই মানে খালি ঘর।

আমি ঘড়ি দেখি, সওয়া আটটা। তার মানে কোব্‌লেঞ্জ থেকে এখানে আসতে সোয়া ঘন্টা লাগল। এখনও রোদ রয়েছে। গ্রীষ্মের য়ুরোপে ষোলো-সতেরো ঘন্টা দিন। এখানে সন্ধ্যা হবে রাত সাড়ে ন'টায়।

এটাই কখেম শহরের প্রাণকেন্দ্র। হোটেল রেস্তরাঁ, দোকান-পাট, পেট্রোল-পাম্প্‌, সবই এখানে পথের পাশে, পাহাড়ের গায়ে। আর পথের অপর পাশে গাছে ছাওয়া পার্ক। মনোরম অবসর বিনোদনস্থল। তারপরে নদী, মনমোহিনী মোজেল।

বাজার ও বড় বড় হোটেলগুলি ছাড়িয়ে আমরা ডানদিকের একটি চড়াই পথ বেয়ে পাহাড়ে উঠতে শুরু করলাম। পথের দু-পাশেই ছোট-ছোট বাড়ি। এর অধিকাংশ বাড়িতেই ঘরভাড়া দেওয়া হয়। বাড়িগুলোর সামনে বোর্ড ঝুলছে 'Zimmer Frei'। কিন্তু সব বাড়িতে ঘর খালি নেই। যেসব বাড়িতে Frei শব্দটির পাশে কিম্বা নিচে সবুজ আলো জ্বলছে অথবা একটি ছোট সবুজ পতাকা উড়ছে, সেসব বাড়িতেই শুধু ঘর খালি রয়েছে।

গুটি তিনেক বাড়ি দেখে, ভাড়া বিচার করে শেষ পর্যন্ত পাশা-পাশি সুন্দর দুখানি ঘর পাওয়া গেল। বাড়িটা পাহাড়ের ওপরে, প্রায় সমতল জায়গায়। ছোট বাড়ি, সামনে একফালি ফুলবাগান। বাগানে দাঁড়িয়ে নিচের উপত্যকাটিকে ছবির মতো সুন্দর মনে হচ্ছে। ঘর দুখানিও বেশ ভাল। বাথরুম-সংলগ্ন ডাব্‌ল বেডরুম। কার্পেটে মোড়া, ড্রেসিং টেব্‌ল, আলনা ও চেয়ার দিয়ে সুসজ্জিত।

সত্তর উত্তীর্ণা জনৈকা বৃদ্ধা বাড়িওয়ালী। একজন বান্ধবীর সঙ্গে

তিনি বাড়ির পেছনের অংশে বাস করেন। সামনের অংশ বলতে এই দুখানি ঘর।

শঙ্করের সবিনয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন—ক'দিন থাকবে?

—আজ্ঞে একদিন। আজকের এই রাতটা। কাল সকালে ব্রেক্‌ফাস্ট করে আমরা ব্ল্যাক-ফরেস্ট রওনা হব।

—তাহলে ব্রেকফাস্ট সহ জনপ্রতি ২২ মার্ক করে দিতে হবে। চারজনের চার্জ দিলেই চলবে, বাচ্চার জন্য কিছু লাগবে না।

শঙ্কর মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করে—বেশিদিন থাকলে ভাড়া কমে যায় বুঝি?

—হ্যাঁ কারণ বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় ও তোয়ালে ধোবার খরচ দু-মার্ক করে। দুদিন থাকলে ওটা অর্ধেক হয়ে যাবে।

—আর তিনদিন থাকলে?

—ধোবার খরচ বাদ হয়ে যাবে। বিশ মার্কে থাকতে পারবে।

—ঠিক আছে। আমরা ২২ মার্ক করেই দেব। আপনি ঘর-দোব পরিষ্কার করিয়ে দিন।

—কাকে দিয়ে আর করাবো বাবা? নিজেদেরই করতে হবে। তোমরা গাড়ি থেকে মালপত্র নামাও, আমরা ঘর পরিষ্কার করে চাদর-তোয়ালে ও সাবান দিয়ে দিচ্ছি।

ভদ্রমহিলা Frei লেখার পাশ থেকে ছোট সবুজ পতাকাটি খুলে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

আমরা গাড়ি থেকে মালপত্র নামাতে শুরু করি। ভদ্রমহিলা তাঁর বান্ধবীকে নিয়ে এসে ঘর পরিষ্কার করতে লেগে যান। শুধু ঘর নয়, সেই সঙ্গে বাথরুম ও টয়লেট পরিষ্কার করে দিলেন। বিছানায় চাদর পালটে বালিশের ওয়াড় বদলে শয্যা পর্যন্ত পরিপাটি করে তুললেন। তারপরে বাগান থেকে ফুল এনে ফুলদানিতে গুছিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন—কাল সকালে কখন তোমাদের ব্রেক্‌ফাস্ট চাই?

গৌর শঙ্করের দিকে তাকায়, শঙ্কর জয়ার দিকে। না, জয়া

আমার দিকে তাকায় না। সে গৌরের দিকে তাকিয়েই বলে—ন'টা।

—ঠিক আছে।

—তাহলে তাই বলে দাও।

শঙ্কর তাই বলে। ভদ্রমহিলারা গুটেন্ নাক্ট (Gutten Nacht) মানে শুভরাত্রি জানিয়ে ভেতরে চলে যান।

আমরা গোছগাছ শেষ করি। তারপরে একে একে গরমজলে স্নান সেরে নিই। সময় বেশি লাগে না। দু-ঘরে দুটি বাথরুম।

স্নান শেষে পোশাক পরে বারান্দায় এসে বসি। আকাশ থেকে সন্ধ্যা নেমে এলো কখেমের বুকে, তার পাহাড়ী পথে আর মোজেলের জলে। একটু বাদে মোজেলের ওপারে দিগন্তের কাছে একাদশীর চাঁদ উঠল, আকাশের বুকে দেখা দিল লক্ষ তারার দেওয়ালী। হাল্কা হাওয়ায় শীতের পরশ সেই সঙ্গে জানা-অজানা ফুলের সুবাস। ইতিমধ্যে বাড়িতে বাড়িতে আর পথে-পথে জ্বলে উঠেছে আলো। সেই আলোর মালায় পথ দেখে আমরা বেরিয়ে আসি পথে, নেমে চলি মোজেলের তীরে।

মিনিট তিনেক উৎরাই ভেঙে পৌঁছই সমতল পথে। আগেই বলেছি মোজেলের তীরভূমি জুড়ে পার্ক আর তারই পাশে মসৃণ ও প্রশস্ত পথ। যে পথ দিয়ে আমরা কোব্লেঞ্জ থেকে এখানে এসেছি, যে পথ দিয়ে কাল আবার শুরু হবে আমার অজানা পথ-পরিক্রমা।

কিন্তু কালকের কথা এখন নয়, আজকের কথা হোক। রমণীয় মোজেল উপত্যকার এই অপরূপ কখেমকে দেখা যাক। পথের একপাশে সারি সারি আলো ঝলমলে দোকান, হোটেল রেস্তরাঁ ও কিছু বড় বাড়ি। তারপরে পাহাড়। পাহাড়ের গায়েও বহু বাড়ি। না, বাড়ি নয়, আলোর ফুল। আলো ফুল হয়ে ফুটে আছে।

পথের অপর পাশে মোজেলের তীরভূমি পর্যন্ত গাছে ছাওয়া, আর ছোট-ছোট বাগানে ঘেরা সবুজ প্রান্তর। শঙ্কর বলছে পার্ক।

তাই বটে কারণ শিশুদের দোলনা থেকে বুড়োদের বসবার বেঞ্চি পর্যন্ত সবই রয়েছে এখানে। রয়েছে বলেই নরনারীর কলহাস্যে আর সুগভীর সুখানুভূতিতে এখন সেগুলো মধুময়।

কিন্তু আমরা হৃদয়ের তাড়নায় এখানে আসি নি, এসেছি পেটের তাগিদে। তাছাড়া যদিও সবে সন্ধে হয়েছে, তাহলেও রাত দশটা। গ্রীষ্মকালে য়ুরোপের মানুষ দিনের আলোতেই রাতের খাওয়া সেরে নেন। দেবি করলে ডিনার পাওয়া যাবে না। তাই ডানদিকে পার্কের দিকে নজর না দিয়ে বাঁ পাশের রেস্তরাঁগুলি দেখতে থাকি। প্রথমেই জর্মনীয়া, হোটেল কাম-রেস্তরাঁ। চারতলা বাড়ি। সামনে আলো ঝলমল বাগান।

পরেরটির নাম আল্‌টে থোর শ্যেংকে (Alte Thor Schenke)। শঙ্কর বলে—এটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ সরাই, ১৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

—তার মানে সাড়ে ছ'শ বছরের পুরনো! আমি বিস্মিত।

মাথা নেড়ে শঙ্কর উত্তর দেয়—হ্যাঁ। এবং এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। তার অনেক আগের থেকেই কথেম পর্যটকদের আকর্ষণ করে এসেছে। এবং সে আকর্ষণ আজও অক্ষুন্ন, কারণ খুব ভাল স্থানীয় মদ পাওয়া যায় এখানে।

—আমরা কিন্তু মদের জন্য পথে বের হই নি, খাবার খেতে এসেছি। গম্ভীর স্বরে জয়া শঙ্করকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

হেসে শঙ্কর বলে—তাই আমরা এ সরাইখানায় ঢুকছি না, যাচ্ছি পাশের রেস্তেরাঁয়, নাম ব্রিক্সিয়াডে (Brixiade)। ওখানে ভিড় একটু বেশি, গোলমালও কানে বিঁধবে। কিন্তু শস্তায় ভাল খাবার পাবো, আর সামনের ঐ বাগানে বসে চাঁদের আলোয় কথেম ও মোজেলের অপরূপ রূপ দর্শন করতে পারব।

অতএব কয়েক পা এগিয়ে ব্রিক্সিয়াডে রেস্তরাঁয় প্রবেশ করি। একটা খালি টেব্‌ল পেয়ে বাগানে এসে বসি। বেয়ারা সেলাম ঠোকে। গৌর ও জয়া খাবারের আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে, শঙ্কর অমৃতকে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকে। আমি তাকিয়ে

থাকি মোজেলের দিকে। চাঁদের আলোয় মোজেল একটি রুপোলী রেখা আর ওপারের পাহাড়গুলো চাঁদের পাহাড়।

ডিনার করে ডেরায় ফিরতে রাত এগারোটা বেজে গেল। গৌর সাহেব মানুষ। রাতের খাবারের পরে বেশ খানিকটা হাঁটা হয়ে গিয়েছে। অতএব সে গিয়ে শুয়ে পড়ল। শ্রীমান অমৃত গাড়িতে বিশেষ করে কোব্‌লেঞ্জ থেকে কখেম আসার সময় ভাল ঘুমিয়ে নিয়েছে। তবু সে ডিনার-টেব্‌লে বসে ঘুমে ঢুলছিল। এতক্ষণ কোনো রকমে তাকে জাগিয়ে রাখা হয়েছে। জয়া তাই তাকে নিয়ে বিছানায় চলে গেল।

একটু শীত শীত করছে। তাহলেও চাঁদের আলোয় মোহময়ী কখেম আমাদের আকর্ষণ করে। আমি ও শঙ্কর ত্নখানি চেয়ার টেনে বারান্দায় বসে পড়ি। বসে বসে মনমোহিনী মোজেল উপত্যকার রূপসুধা পান করতে থাকি।

মিসেস লেমান মানে আমাদের বাড়িওয়ালী বারান্দায় আসেন। শঙ্করকে বলেন—তোমরা আর বাইরে যাবে না তো?

—না, না।

—তাহলে আমি গেটে চাবি দিয়ে দিই।

শঙ্কর মাথা নাড়ে।

চাবি দিয়ে গেট বন্ধ করে ভদ্রমহিলা আবার ফিরে আসেন আমাদের কাছে। জিজ্ঞেস করেন—তোমরা কি চাবিটা রেখে দেবে?

—কেন বলুন তো?

—না। আমি যদিও কাল খুব ভোরে উঠব, তোমাদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু তোমরা যদি তারও আগে প্রাতর্ভ্রমণে বের হও?

—আমরা অত সকালে উঠতেই পারব না। চাবি আপনার কাছেই থাক।

ভদ্রমহিলা চাবিটা তাঁর পকেটে রাখেন। কিন্তু চলে যান না। বোধকরি কিছু বলতে চাইছেন। শঙ্কর তাড়াতাড়ি বলে—বসুন না! সে একখানা চেয়ার আনতে চায়।

মিসেস লেমান তাকে বাধা দেন। নিজেই একখানি চেয়ার টেনে এনে আমাদের পাশে বসেন। তারপরে বল্লেন—কিন্তু তোমাদের দেরি হয়ে যাবে। তোমরা ক্লান্ত। অনেক রাত হল, তোমবা শুতে যাবে।

—তার জন্য তাড়া নেই। আর আমরা মোটেই ক্লান্ত নই। দুপুরের পরে বন্ থেকে বের হয়েছি। তার চেয়ে আপনি কখেমেব কথা বলুন, আপনার কথা বলুন।

—কখেম প্রাচীন জনপদ হলেও, তার এই উন্নতি হাল আমলেব। যুদ্ধের সময় কোব্‌লেঞ্জ থেকে বহু শরণার্থী এখানে এসে আশ্রয় নেন। যুদ্ধের পরে তাঁদের অনেকেই এখানেই থেকে যান। ক্রমে জর্মনীব পর্যটন মানচিত্রে কক্‌হেম বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

—আপনিও কি যুদ্ধের সময় এখানে এসেছেন?

—না, না। আমার স্বামী এখানেই থাকতেন। এখানকার সব-চেয়ে পুরনো সরাইখানায় ম্যানেজার ছিলেন।

—আলটে থোর শ্লেংকে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমরা দেখেছো? দেখবেই তো. সবাই দেখে।

একবার থামেন তিনি। তারপরে আবার ধীর কণ্ঠে বলতে শুরু করেন—তখন আমাদের দেশে দরকার না হলে মেয়েবা বড় একটা চাকরি করত না। আমিও করতাম না। তিনি ছিলেন কর্মঠ ও বুদ্ধিমান মানুষ। যা আয় করতেন, চলে যেত। দুটো ছেলেকে নিয়ে আমি সুখেই সংসার করছিলাম।

—তারপরে কি হল?

—তারপরে? তারপরে সর্বনাশা যুদ্ধ শুরু হল। হিটলারের নির্দেশে আমার স্বামীকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে যেতেই হল।…একদিন যুদ্ধ শেষ হল। অনেক দিন তাঁর কোন খবর পাই নি। তবু পথ

চেয়ে বসে রইলাম। মাসের পর মাস কেটে গেল। কিন্তু তিনি আর ঘরে ফিরে এলেন না।

দেশের অবস্থা একটু স্বাভাবিক হবার পরে তাঁর খোঁজ শুরু করলাম। কিন্তু বহু খোঁজাখুজি করেও তাঁকে আর খুঁজে পেলাম না।

—ছেলেরা ?

—হ্যাঁ। অনেক কষ্ট করে তাদের মানুষ করেছি। তারা বড় হয়েছে, সংসার করছে, ভালই আছে।

—কোথায় থাকে ?

—একজন কোব্‌লেঞ্জ, আরেকজন বার্লিনে।

—তারা আপনার খোঁজ নেয় না, সাহায্য করে না ?

—খোঁজ নেয় না, সেকথা বলব না। খোঁজ নেয়। চিঠি লিখলে, উত্তর দেয়। আসতে বললেও এসে দেখে যায়। তবে কোন আর্থিক সাহায্য করে না। হয়তো করতে পারে না। ওদের নিজেদের সংসার রয়েছে।

—আপনার তাহলে কি এই বাড়িভাড়া দিয়েই চলে?

—হ্যাঁ। এখন মানে এই বছর দশেক হল তাই চালাতে হচ্ছে। তার আগে আমি একটা চাকরি করতাম।

—আপনার বান্ধবী কি করেন ?

—কিছুই না। এ বয়সে আমাদের কে কাজ দেবে ? ওর অবস্থা আরও খারাপ। আমার তবু এই বাড়িখানি আছে। ওর কিছু নেই।

—ছেলে-মেয়ে ?

—আছে। একটি ছেলে, তুটি মেয়ে। তারা বিয়ে করেছে, সুখেই আছে। কিন্তু সাহায্য করা তো দূরের কথা, চিঠি লিখলে জবাব পর্যন্ত দেয় না।

—কিন্তু এই বাড়িভাড়া দিয়ে আপনাদের তুজনের···

—চলে যায় কোনমতে। কেবল অসুখ-বিসুখে পড়লে অসু-বিধেয় পড়ে যাই। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ছুটতে হয়।

থামলেন ভদ্রমহিলা। শঙ্করও চুপ করে থাকে। সে বোধকরি

আর কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

একটু বাদে মিসেস লেমান নিজেই আবার বলে ওঠেন—তোমরা আমার ছেলের মতো। তাই তোমাদের একটা অনুরোধ করব।

—বেশ তো বলুন!

—তোমাদের জানাশোনা কেউ কখেম বেড়াতে এলে, তাদের আমার বাড়িতে উঠতে ব'লো। এত কম ভাড়ায় এমন সুন্দর ঘর, কোথাও পাবে না। তাছাড়া কাল সকালে দেখো, আমি তোমাদের ভাল ব্রেক-ফাস্ট দেব। মানে বুঝতেই পারছ, ঘর দুখানি নিয়মিত ভাড়া হলে আমাদের দুজনের খাওয়া-পরা চলে যায়, এই আর কি।

একটু হাসেন তিনি। কিন্তু সে হাসি বড়ই করুণ।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলে ওঠে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলব বৈকি, নিশ্চয়ই বলব। আমাদের জানাশোনা কেউ বার্লিন থেকে কখেম এলে, তাকে নিশ্চয়ই আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।

—ব'লো, একটু ভাল করে ব'লো। মানে ঐযে তোমাদের বললাম, এই ঘর দুখানি নিয়মিত ভাড়া হলে, আমাদের দুজনের কোনমতে চলে যায়।

তাঁর অনুরোধের আকুলতা অনুভব করেও শঙ্কর এবারে শুধুই মাথা নাড়ে। আবার মিথ্যে আশ্বাস উচ্চারণ করে প্রহসনের বোঝা ভারী করতে চায় না।

ভদ্রমহিলা কিন্তু খুশি হন। সহাস্যে বলেন—অসংখ্য ধন্যবাদ। গুটেন্ নাক্ট।

—গুটেন্ নাক্ট।

আমরাও উঠে দাঁড়াই। তিনি হাসিমুখে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। আমরা বারান্দার আলো নিবিয়ে নিজেদের ঘরে আসি। দোর বন্ধ করে আমার বিছানায় এসে বসি। পাশের খাটে গৌর ঘুমিয়ে পড়েছে। ভালই করেছে, তাকে এই করুণ-কাহিনীর অসহায় শ্রোতা হতে হল না।

॥ সাত ॥

মিসেস লেমান তাঁর কথা রাখলেন। সত্যি বেশ ভাল ব্রেকফাস্ট খাওয়ালেন—মাখন ও জ্যাম দিয়ে চারখানি টোস্ট, দুটি ডিমের ওমলেট, একটি কলা ও ছোট একপ্লেট আলুভাজা এবং কাফি। অমৃতকে কাফির বদলে এক কাপ দুধ।

তবে সকাল ন'টায় পেরে উঠলেন না। ডাইনিং টেবিল গোছ গাছ করে খাবার পরিবেশনে পৌনে দশটা হয়ে গেল। সেজন্য অবশ্য বার বার আপসোস করতে থাকলেন। আর আমাদের বলতে হল—মাত্র একঘণ্টা দেরি হওয়ায় আমাদের কিছুই এসে যাবে না। আমরা তো অফিস করতে যাচ্ছি না, বেড়াতে চলেছি।

খেতে বসার আগেই মালপত্র গাড়িতে তুলে একেবারে তৈরি হয়ে নিয়েছিলাম। খাওয়া হতেই গাড়িতে এসে উঠলাম। মিসেস লেমান ও তাঁর বান্ধবী আমাদের বিদায় জানাতে পাশে এসে দাঁড়ালেন।

শঙ্কর গাড়ি স্টার্ট দিল। আমি ঘড়ি দেখি—সকাল সাড়ে দশটা। তার মানে রওনা হতে ঠিক একঘণ্টা দেরি হল। তা হোক গে।

সহসা মিসেস লেমান বলে ওঠেন—কাল রাতের অনুরোধটা মনে আছে তো?

শঙ্কর মাথা নাড়ে।

তবু তিনি মনে করিয়ে দেন—তোমাদের জানাশোনা কেউ এখানে বেড়াতে এলে, তাকে আমার বাড়িতে উঠতে ব'লো।

—নিশ্চয়ই বলব। কেউ এখানে এলে তাকে আপনার বাড়িতেই পাঠিয়ে দেব।

মিসেসের মুখখানি খুশিতে ভরে ওঠে। চোখ ফিরিয়ে নিই।

গাড়ি চলতে শুরু করে। ওঁরা হাত নাড়েন, আমরা হাত নাড়ি। ওঁরা দাঁড়িয়ে থাকেন, আমরা চলতে থাকি। গাড়ি উৎরাই পথে নেমে

চলে। ওঁরা হারিয়ে গেলেন।

নেমে এলাম বড়রাস্তায়। সেই দোকানপাট বাড়ি-ঘর পার্ক আর মোজেল। কিন্তু একটু বাদেই পথ পরিবর্তিত হল। শঙ্কর সংকীর্ণ একটি চড়াই পথ ধরল। আমরা আবার পাহাড়ে উঠতে শুরু করলাম। পথের দুপাশেই আঙ্গুর ক্ষেত। ধাপে ধাপে উঠে চলেছে আমাদের সঙ্গে।

খুব বেশিক্ষণ অবশ্য চলতে হল না। মিনিট কয়েক বাদেই পথটি একফালি বাঁধানো প্রাঙ্গণে পরিণত হল। পথ শেষ হয়ে গেল। আঙ্গুর ক্ষেত কিন্তু শেষ হয় নি। আবো ওপরে উঠে গিয়ে পাহাডটাব মাথায় গিয়ে শেষ হয়েছে। সেখানে একটি ভগ্নদুর্গ।

বাঁধানো প্রাঙ্গণের একদিকে 'কার-পার্ক' আরেকদিকে ছোট একখানি দোতলা বাড়ি। বাড়ির পাশে দোতলায় উঠবার চওড়া সিঁড়ি, সামনে সাইনবোর্ড—Sessel Lift.

সেদিকে তাকাতেই জয়া বলে—জেসেল-লিফ্‌ট অর্থাৎ বোপ-ওয়ে। ঐ দেখছেন না?

তাকিয়ে দেখি তাই বটে। সামনের বাড়িটা থেকে শুরু হয়ে রোপওয়ে উপত্যকা পার হয়ে দূরের বনময় পাহাডে উঠে গিয়েছে। সেই চলমান দড়ির সঙ্গে কতগুলো গাড়ি অবিরাম আসা-যাওয়া করছে। গাড়ি মানে পাশাপাশি এক[illegible]দুখানি চেয়ার। মাঝখানে একটা বাঁকানো ডাণ্ডা দিয়ে রোপের সঙ্গে যুক্ত। কয়েকটি গাড়িতে যাত্রীও রয়েছেন। তাঁরা পাহাড়ে উঠছেন।

ওরা কোথায় চলেছেন, জানি না। কিন্তু সামনের এই বাড়িটা যে রোপওয়ে স্টেশন, তা বেশ বুঝতে পারছি।

কার-পার্কে গাড়ি রেখে আমরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসি। দোতলায় বাড়ির পেছনে অনেকখানি বাঁধানো চত্বর। এটাই রোপ-ওয়ে প্ল্যাটফর্ম। পাশেই টিকেট কাউণ্টার। গৌর টিকেট নিয়ে আসে। জনপ্রতি যাতায়াত ভাড়া ৬ মার্ক। অমৃতেরও পুরো ভাড়া লাগল। কারণ সে একখানি চেয়ার দখল করবে।

অনেক কসরৎ করে শেষ পর্যন্ত গাড়িতে ওঠা গেল। অর্থাৎ খোলা চেয়ারে বসে পড়া গেল। মাথার ওপরে যেমন আচ্ছাদন নেই, তেমনি তিনপাশের উচ্চতাও সামান্য. কোমরের ওপরে মাত্র ফুটখানেক। সামনের দিকটা ফাঁকা। যে ডাণ্ডাটি খুলে বসে পড়তে হয়, সেটিই একমাত্র নিরাপত্তা। তবে সেটি লাগাতে হয় চলমান গাড়িতে বসে। যাঁরা রাজগীরে রোপওয়ে চড়েছেন, তারা ব্যবস্থাটি বুঝতে পারবেন। তবে রাজগীরের গাড়িগুলো এর চেয়ে দেখতে সুন্দর এবং নিরাপদ। সবচেয়ে বড় কথা সেখানে দুজন লোক গাড়িতে চড়িয়ে সামনের ডাণ্ডাটি লাগিয়ে দেন। এখানে তেমন কোন লোক নেই। য়ুরোপে যে মানুষের দাম বড্ড বেশি।

আর তাই আমরা পর পর গাড়িতে উঠতে পারি নি। প্রথম গাড়িতে শঙ্কর ও অমৃত। ওদের দুখানি গাড়ি পরে গৌর ও জয়া আর তাদের তিনখানি পরে আমি।

দেখতে দেখতে চলেছি। নিচে পাহাড়ের ঢালে আঙ্গুরক্ষেত। তাকালে একটা ভয়মিশ্রিত বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছে। সামনে আর দুপাশে সবুজ পাহাড়। মনটা আমার আনন্দময় হয়ে উঠছে। পাহাড় যে সর্বদা আনন্দ দেয় আমাকে। ভাবতে ভাল লাগছে, সামনের ঐ অজানা পাহাড়ে গিয়ে শেষ হবে আমার এই ভাসমান ঝুলনযাত্রা।

কয়েক মিনিট বাদেই যাত্রা শেষ হল। তার আগে শঙ্কর আমার ছবি নিল। সে ছিল আমার পাঁচখানি গাড়ি আগে। ক্যামেরা বের করে তৈরি হবার মতো সময় হাতে পেয়েছে। তাই ক্যামেরা তাঁক করতেই আমি মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছি। ভাসমান ঝুলায় বসে হাসিমুখে ছবি তোলা খুব একটা সহজ কাজ নয়।

কঠিন কাজটি শেষ করে গাড়ি থেকে নেমে এসেছি। এ জায়গাটার নাম ক্লোটেন (Klotten)। মনে পড়ছে জুরিখের কথা। সেখানকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটির নামও ক্লোটেন।

জংলা পাহাড়। তারই ভেতরে পায়েহাঁটা চড়াইপথ বেয়ে আমরা পাহাড়টার মাথায় উঠে এলাম। ঝোপঝাড় ও ঘাসে ছাওয়া

একফালি প্রায় সমতল প্রান্তর। এখান থেকে দূরের পাহাড় আর নিচের নদীর দৃশ্য অপরূপ। পাহাড়গুলো বেশি উঁচু নয়, তাদের তুষার-ধবল শিখরও নেই। তাহলেও তারা ভারী সুন্দর। নদীর গা থেকে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ফুরিয়ে যায় নি। সেখান থেকে শুরু হয়েছে আরেকটি পাহাড়। তারপরে আবার একটি। এইভাবে একটার পর একটা পাহাড় ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে দিগন্তের গায়ে গিয়ে আছড়ে পড়ছে।

নদীটাও অপরূপা। তার দুদিকেই পাহাড়েব গায়ে আঙ্গুর ক্ষেত। ঘন সবুজের মাঝে সে একটি ঝক্‌ঝকে রুপোলী রেখা। খানিকটা দূরে গিয়ে ইংরেজি 'U' অক্ষরের মতো গিয়েছে বেঁকে। তারপরে আবাব ডাইনে বাঁক নিয়ে সোজা হয়েছে। অবশেষে রুপোলী নদী সবুজ পাহাড়ের মাঝে পড়েছে লুকিয়ে। তাকে আর দেখতে পাচ্ছি না।

কেবল পাহাড় কিম্বা নদী নয়, নদীতীরের দৃশ্যটিও মনোরম। বিশেষ করে ওপারের। ওখানে বেলাভূমি ছাড়িয়েই পাহাড়ের গায়ে আঙ্গুর ক্ষেত। তারই মাঝে মোটর পথ। কোথাও কোথাও পথের পাশে কয়েকটি করে বাড়ি, পাকা বাড়ি। টালির চাল. আর পাথরে দেওয়াল। কোনটি বা তিনতলা। পাহাড় ক্ষেত পথ নদী আর গ্রাম, সব মিলে যেন একখানি রঙীন ছবি।

ওপার থেকে এপারে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনি। এপারের পাহাড়ে ক্ষেত কম, বাড়ি-ঘর বেশি। আর এই পাহাড়টার ওপরেই রয়েছে সেই বিখ্যাত মধ্যযুগীয় দুর্গ এলৎজ (Eltz)। এটি জর্মনীর সব-চেয়ে সুন্দর সুপ্রাচীন দুর্গগুলির অন্যতম। দুর্গ ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে কাঠের একখানি প্রকাণ্ড ক্রুশ।

শঙ্কর বলে—রাতে ঐ ক্রুশে আলো দেওয়া হয়। বহুদূর থেকে দেখা যায়, ভারী সুন্দর দেখায়।

কিন্তু সে আলো আর আমরা দেখতে পাবো না। আজ রাতে যখন সে আলো জ্বলবে, তখন আমরা থাকব বহুদূরে, প্রায় কৃষ্ণারণ্যের কাছে। সেখান থেকে ঐ আলো দেখা যাবে না। বরং ব্যাপারটা

জানা থাকলে গতকাল দেখে নেওয়া যেত। কখন থেকে নাকি আলোটা বেশ ভাল দেখা যায়!

যাকৃগে, এখন আর আপসোস করে কি হবে? তার চাইতে যা দেখতে এসেছি, তাই দেখা যাক। মাটির পথটি ধরে এগিয়ে চলি। একটি পায়েচলা চড়াই পথ, দুদিকেই ঝোপঝাড়। বেশ খানিকটা এগিয়ে তারকাটার বেড়া। তারই মাঝে একটি লোহার গেট। সামনে জর্মন সাইনবোর্ড। শঙ্কর অর্থ বলে দেয়—Wild Park. অর্থাৎ বন্য-জন্তুদের স্বাধীন নিবাস। ভেতরে যেতে তিন মার্ক লাগবে।

—তিন মার্কের জন্য কিছু নয়। আমাদের হাতে যে দেখার মতো সময় নেই। গৌর বলে।

জয়াও সমর্থন করে তাকে—এখুনি এগারোটা বেজে পঞ্চাশ। আজ আমাদের পাঁচ/ছ'শ' কিলোমিটার পথ পার হতে হবে।

ঠিকই বলেছে জয়া। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। অতএব নামতে শুরু করি।

—আরে, এখানে একটা কাফে রয়েছে দেখছি!

শঙ্করের কথা শুনে সামনে তাকাই। সত্যই তাই। রোপওয়ে স্টেশনের ঠিক আগে পথের ধারে একটা কাফি-কর্ণার।

কিন্তু শঙ্কর সেদিকে এগোতে পারে না। তার আগেই প্রায় ধমকের স্বরে জয়া বলে ওঠে—এইতো কাফি খেয়ে বের হলে। দেড়ঘণ্টাও হয় নি। এরই মধ্যে আবার কাফে দেখে···

—আরে না, না! আমি এমনি বললাম। এখন আবার কাফি খাবো কেন? এইতো খেয়ে এলাম। কি বলেন শঙ্কুদা?

—হ্যাঁ। ঠিকই তো! আমাকে ধুয়ো ধরতে হয়।

গৌর মাথা নাড়ে।

জয়া খুশি হয়ে অমৃতের হাত ধরে এগিয়ে চলে। আমরা তিন তৃষ্ণার্ত একে অপরের দিকে তাকিয়ে নীরবে অসহায়ের হাসি বিনিময় করি। আর মনে মনে ভাবি, মেয়েরা মিথ্যেই নারীমুক্তি আন্দোলনের সামিল হয়েছেন। আসলে পুরুষরাই পরাধীন। কেউ

মায়ের কাছে, কেউ ভগ্নীর কাছে. কেউ জায়ার কাছে আবার কেউবা কন্যার কাছে।

রোপওয়ে স্টেশনে পৌঁছই। গাড়িতে বসে পড়ি। গাড়ি নিচে নামছে। এবারে আর সেই ভয়মিশ্রিত বিচিত্র অনুভূতি অনুভব করছি না। বরং নিচের দিকে তাকাতে মজা লাগছে। নিচের বাড়ি-ঘর, ক্ষেত-খামার, পাহাড়-নদীকে জলছবির মতো মনে হচ্ছে। আর রোপওয়ে স্টেশনে পৌঁছে যাওয়া অমৃতকে দেখাচ্ছে যেন একটি লিলিপুট।

দুপুর ঠিক সওয়া বারোটায় আমরা আবার গাড়িতে উঠলাম। কয়েকমিনিটের মধ্যেই কখেম ফিরে এলাম। কিন্তু থামলাম না। চলমান গাড়িতে বসেই রাতের আশ্রয়ের কাছ থেকে নিতে হল শেষ বিদায়।

কখেম ছাড়িয়ে চলেছি এগিয়ে। সেই একই পথ। মোজেলের তীরে তীরে, আঙ্গুর ক্ষেতের ভেতর দিয়ে। জর্মনরা বলেন 'ভাইন স্ট্রাসে,' ইংরেজরা বলেন 'ওয়াইন রোড' আর আমরা বলছি 'সুরা সরণি'।

মোজেলের দু-তীরেই পাহাড়ের ঢালে আঙ্গুর ক্ষেত, অনেকটা দার্জিলিঙের চা বাগানের মতো। মাঝে মাঝে গ্রাম। উপত্যকার অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত অংশে এক-এক জায়গায় কিছু বাড়ি-ঘর। সেই সঙ্গে দোকানপাট ও কলকারখানা। নামে গ্রাম হলেও এসব জায়গায় যাবতীয় নাগরিক আরামের উপকরণ সহজলভ্য।

গতকাল আমরা কোব্লেঞ্জ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে এসেছি, এখন চলেছি দক্ষিণ-পুবে। বেলা একটার একটু পরে মোজেলের কাছ থেকে নিতে হল বিদায়। মোজেল উত্তর-পশ্চিম বাহিনী হয়ে চলে গেল ট্রিয়েব (Trier) দিকে। সেখানে সে মিলিত হবে জার (Saar) ও রুভের (Ruwer) নদীর সঙ্গে। তারপরে লুক্সেমবুর্গ হয়ে ফরাসী দেশে চলে যাবে। সেদিন রাতে আমরা লুক্সেমবুর্গ থেকে ঐ পথ ধরে কোব লেঞ্জ এসেছিলাম।

ওটি জাতীয় সড়ক। এখান থেকে উত্তর-পূর্বে প্রসারিত হয়ে কোব্‌লেঞ্জ গিয়েছে। আমরা এখন একটা অন্য পথ ধরে প্রায় সোজা দক্ষিণে চলেছি।

পথটি মসৃণ হলেও খুব প্রশস্ত নয়। সমতল তো নয়ই। এখন চড়াই বেয়ে একটা পাহাড়ে উঠছি। আমাদের বাঁয়ে নিচের দিকে আঙ্গুর ক্ষেত আর ডাইনে ওপরের দিকে বড়-বড় গাছের ঘন বন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাহাড়টার মাথায় উঠে এলাম। পৌঁছলাম সবুজ সমতলে। মনে হচ্ছে একটা মালভূমির ওপর দিয়ে চলেছি। পথের দু-পাশেই সবুজ ক্ষেত—গম যব আর নানা রকমের সবজি। পাথুরে জমিকে এঁরা উর্বর ক্ষেতে পরিণত করেছেন। ক্ষেতের মাঝে টেলিং (Telling) আর কাপেল (Kappel) নামে দুটি ছোট-ছোট গ্রাম ছাড়িয়ে এলাম।

এ পথে দেখছি গাড়ি কম। তবে প্রচুর সাইকেল আরোহীর সঙ্গে দেখা হচ্ছে। আগেই বলেছি জর্মনীতে বাইসিক্‌ল খুবই জনপ্রিয়।

গাড়ির সংখ্যা কম কারণ এটি সংকীর্ণ পথ। জর্মনরা গতির অনুরাগী। আর তাই তাঁরা প্রশস্ত পথে গাড়ি চালাতে ভালোবাসেন।

অবাক কাণ্ড! একদল যুবক-যুবতী জোড়ায়-জোড়ায় ভারী ভারী মোটরবাইকে সওয়ার হয়ে এই পথ ধরেছে। ওরা এপথে এসেছে কেন? সাধারণত যারা মোটরবাইক চড়ে, তারা সবাই গতির নেশায় মশগুল হয়ে থাকে। তারা তো যাবে অটোবান দিয়ে! যেখানে ঘণ্টায় দুশো কিলোমিটার বেগে চললেও অসুবিধে নেই কোন। বাস্তবিক পক্ষে অটোবানের বাঁদিকে অংশটি স্পীড-কার এবং মোটর-বাইকের জন্যই সংরক্ষিত বলা চলে। অথচ এরা অটোবান দিয়ে না গিয়ে এই স্বল্পগতি পথে এসেছে। বোধ করি এরা মোটরবাইকের আরোহী হলেও গতির অনুরাগী নয়, প্রকৃতির পূজারী। রমণীয় প্রাকৃতিক পরিবেশে আকৃষ্ট হয়েই এরা এইপথ বেছে নিয়েছে।

কৃশ্‌বের্গ (Krichberg)। একটা ছোট শহর। পথের দুপাশেই

বাড়ি-ঘর। প্রায় প্রতি বাড়িতেই চেরী গাছ। অসংখ্য ফল ধরেছে, পেকেছেও প্রচুর। কিন্তু বেল পাকলে কাকের কি? আমরা এগিয়ে চলি। কৃশবের্গ যায় হারিয়ে।

'হিচ্-হাইক' করার জন্য একজোড়া যুবক-যুবতী পথের পাশে দাঁড়িয়ে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝেই এমন দু-এক জোড়ার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কিন্তু আমরা তাঁদের গাড়িতে তুলতে পারছি না। 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী।'

এখনো আমরা সেই মালভূমির মতো পাহাড়টার ওপর দিয়ে চলেছি। পথের পাশে কোথাও ক্ষেত আবার কোথাও বা বন। বনে প্রচুর পাইন গাছ। তবে বনের চেয়ে ক্ষেতের আয়তন বড়। গম যব ও জুকের-রুবুনের (Sucker Rubun) ক্ষেতই বেশি। এটি একটি শাকালুর মতো ফল। এর থেকে চিনি হয়।

বেলা পৌনেদুটো নাগাদ আমরা সেই মালভূমির মতো পাহাড়ের ওপর থেকে নিচের উপত্যকায় নেমে এলাম। পথের প্রকৃতি প্রায় একই রকম। দু-পাশে বন কিম্বা ক্ষেত আর বাড়ি-ঘর। তবে মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট কালো-কালো পাহাড়। সেখানে কিছু লোক পাথর ভাঙছে।

শঙ্কর বলে—এগুলো সবই অতি উৎকৃষ্ট স্লেটপাথরের পাহাড়। ইংরেজীতে যাকে বলে 'Schist' জর্মনরা বলেন শিলিফের (Schiliffer)। এই পাথর থেকে খুব ভাল আসবাবপত্র তৈবি হয়। তাই ওরা পাথর কাটছে।

পথে ক্যোনিগজাউ (Koenigsau) গ্রাম ছাড়িয়ে বেলা দুটোয় সেণ্ট্ মার্টিনস্টাইন (St. Martinstein) রেল স্টেশনে পৌঁছলাম। গতকাল কোব্লেঞ্জ ছাড়ার পরে এই প্রথম রেল লাইনের সঙ্গে দেখা হল।

কেবল রেলস্টেশন নয়, এটি একটি ছোট শহর। আধুনিক দোকান-পাট ও হোটেল রয়েছে। বেলা দুটো। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় অতিক্রান্ত। সুতরাং শঙ্কর গাড়ি থামায়।

লাঞ্চ সেরে নেওয়া গেল। টোস্ট ওমলেট আলুভাজা স্যালাড ও দই অথবা আইস্‌ক্রিম। বলা বাহুল্য আমি গৌর ও জয়া দই খেলাম, অমৃত আইস্‌ক্রিম। আর শঙ্কর একবার আমাদের দলে আরেকবার ছেলের দলে ভিড়ে দই ও আইস্‌ক্রিম দুইই খেয়ে নিল।

খেয়ে নিয়ে গাড়ি ছাড়া গেল। কিন্তু বেশিক্ষণ চলা গেল না। মিনিট পনেরো বাদে একটা পেট্রোল পাম্প্ চোখে পড়তেই শঙ্করের খেয়াল হয়, তেল নেওয়া দরকার। জায়গাটি কিন্তু একটি ছোটগ্রাম। নাম মনসিগেন্ (Monzigen)।

কয়েক মিনিট গাড়ি চলার পরেই আরেকটা ছোট শহরে এলাম। নাম জোবের্নহাইম্ (Sobernheim)। বেশ বড় উপত্যকা। পথের বাঁদিকে বাড়ি-ঘর আর ডানদিকে কল-কারখানা। গৌব বলে—ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া।

শঙ্কর যোগ করে—এখানে একটা বিমানবন্দর আছে।

—আর বাড়ি-ঘরের মাঝে দেখুন, কেমন সুন্দর একটা গির্জা মাথা উঁচু করে রয়েছে! জয়া যোগ করে।

আমরা দেখি। সত্যিই সুন্দর।

জনপদ যায় হারিয়ে, দেখা দেয় ক্ষেত। সেই যব আর আঙ্গুরের ক্ষেত। জর্মনী শিল্প সমৃদ্ধ দেশ, এ সংবাদ জানা ছিল। কিন্তু জানতাম না যে জর্মনী এমন কৃষি সমৃদ্ধ। অবশ্য এটি আমার অজ্ঞতা। কারণ কৃষি ও শিল্প একে অপরের পরিপূরক। দেশকে সমৃদ্ধ করতে হলে বিশ্বকর্মার সঙ্গে দেবী অন্নপূর্ণারও শরণ নিতে হবে।

আগেই বলেছি, এদেশে মানচিত্র দেখে গাড়ি চালাতে হয়। গৌর পেছনে বসে সেই কাজটি করছে। সে সহসা ম্যাপ দেখে বলে ওঠে—আমরা কিন্তু পথ পালটালাম। এতক্ষণ এসেছি ৪২১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে, এখন চলেছি ৪১ নম্বর দিয়ে, এ পথটিকে বলা হয় 'রোমান্টিক রোড।'

তার মানে এ পথে 'রোমান্স' রয়েছে। কিন্তু আমাকে আবার সেই কথা বলতে হচ্ছে 'বেল পাকলে কাকের কি?' আমি যে সে

বয়সটাকে পেরিয়ে এসেছি বহুদিন।

তবে পথটি সত্যই রমণীয়। ক্ষেতের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ। সামান্য উঁচু-নিচু কিন্তু মসৃণ। দু-পাশে বহুদূর বিস্তৃত সবুজ ক্ষেত। ক্ষেতের শেষে ছোট-ছোট পাহাড়। তারা বুঝিবা আকাশের কোলে বসে আমাদের দিকে রয়েছে তাকিয়ে।

রুডেস্‌হাইম (Rudesheim), ছোট গ্রাম। গির্জায় ঘণ্টা বাজছে। একদল নারী-পুরুষ ও কয়েকটি বালক-বালিকা সাজ-গোজ করে সেদিকে চলেছে। একটু অবাক হই। আজ তো রবিবার নয়! তাছাড়া সবে বেলা তিনটে, এখনো যে প্রার্থনার সময় হয় নি।

জয়া বলে—প্রার্থনা নয়, বিয়ে হবে। বর-কনে নিয়ে আত্মীয়-স্বজন গির্জায় যাচ্ছেন।

একটু বাদে গৌরের নির্দেশে শঙ্কর আবার পথ পালটায়। এটি চওড়ায় আরও কম। কোনমতে পাশাপাশি দুখানি গাড়ি চলতে পারে। বাস বা ট্রাক এলে বাঁধানো পথ থেকে মাটিতে নামতে হবে। পথের পাশে ক্ষেত। গম যব আর আঙুরের ক্ষেত।

সহাস্যে শঙ্করকে বলি—তখন তো ৪২১ থেকে ৪১ নম্বরে এসে-ছিলে। এবারে কি ৪১ থেকে ২১শে এলে!

—না। এটা গ্রাম্য পথ। এর কোন নম্বর নেই। গৌর মান-চিত্র দেখে বলে।

—তা এমন নাম-গোত্রহীন পথে আমরা কেন এলাম?

—এই পথটি আমাদের কয়েক কিলোমিটার পথ বাঁচিয়ে দেবে।

আবার একটা গ্রাম। নাম নরহাইম (Norheim)। পথের একপাশে বাড়ি-ঘর, আরেকপাশে গাছপালাহীন পাহাড়। বিচিত্র প্রকৃতি। চারিদিকে সবুজের মাঝে মরুভূমির পরিবেশ। পাহাড়টি দেখে আমার লাহুল-হিমালয়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সবুজ কুলু উপত্যকার পাশেই বৃক্ষহীন লাহুল।

বৃক্ষহীন পাহাড়। জর্মনীতে প্রচুর বৃষ্টি হয়। সুতরাং এ পাহাড় থেকে নিয়মিত ধস নামে। নামলেও ক্ষতি হয় না। পথের পাশে

লোহার জাল দেওয়া রয়েছে।

আবার রেল লাইন। রেলওয়ে ক্রসিং পার হয়ে এলাম। আর তারপরেই গৌর বলে উঠল—গাঁয়ের পথ শেষ হয়ে গেল। এটি ৪৮ নম্বর জাতীয় সড়ক। এটা বেশ বড় জায়গা। নাম বাড-মুনস্টের (Bad Munster)।

গৌর যোগ করে—এটি একটি বর্দ্ধিষ্ণু শহর কিন্তু বেশ পুরনো। ঐ দেখো, পাহাড়ের ওপরে একটা মধ্যযুগীয় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। আর তারই পাশে পাশে আধুনিকতম ভিলা। স্বাস্থ্যকর স্থান বলে এখানে ধনীরা ঐসব বিলাসবহুল ভিলা তৈরি করেছেন।

গ্রামের পরে গ্রাম ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝেই রেল লাইনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কড়া রোদ উঠেছে। এদিকটায় দেখছি গাছ কম। পথে ছায়া নেই বললেই চলে।

আবার একটা রেল স্টেশন হক্স্টাটেন (Hochstatten)। স্টেশন ছাড়িয়ে উপত্যকা। কয়েকটি বাড়ি আর কিছু দোকান। তবে এখন সবই বন্ধ।

জয়া বলে—বিকেল ছ'টায় দোকানপাট খুলবে। এদেশের গ্রামে-গঞ্জে তাই খোলে।

একটা বাসস্টপ। সামনে লেখা 'Bahn Post'।

গৌর মানে বলে—এখান থেকে লাইনের বাস ডাক নিয়ে যায়।

একটা বাস দুজন যাত্রী নিয়ে বাসস্টপে দাঁড়িয়েছিল। বাসটা ছেড়ে দিল। কি করবে, সময় হয়ে গিয়েছে যে! যাত্রী বড় কথা নয়, আসল হচ্ছে সময়। আজ যাত্রী নেই, কাল হবে। কিন্তু সময় তো আর ফিরে আসবে না। তাই সময়ের হেরফের করা চলবে না! আর তা চলে না বলেই যুদ্ধবিধ্বস্ত একটা দেশ চল্লিশ বছরের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী দেশে পরিণত।

বিকেল পাঁচটার সময় আমরা আবার ছায়া পেলাম। ছায়া সুনিবিড় একটা গ্রামে পৌঁছলাম। নাম ফ্রাঙ্কেনস্টাইন (Frankenstein)। ছোটগ্রাম। পথের দুপাশে ছোট-ছোট বাড়ি। বাড়িঘরের পেছনে বনবন।

একটা খাবারের দোকান পেয়ে শঙ্কর গাড়ি থামায়। বলে—কিছু খাবার কিনে চলুন, কোথাও একটু বসা যাক। আমাদের যেমন খিদে পেয়েছে, গাড়িটারও বিশ্রাম দরকার। ইঞ্জিন গরম হয়ে গেছে।

খাবার কিনে হাঁটতে-হাঁটতে লোকালয় ছাড়িয়ে আসি। পথের দুপাশেই ঘন বন। তারই মাঝে একটি বাঁধানো বনপথ। আমরা সেই পথে চলতে থাকি। পথের পাশে কাঠের স্তূপ। সেগুলো ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ভারী ভাল লাগছে হাঁটতে। ছোটগাড়িতে ঘণ্টার পব ঘণ্টা বসে থেকে পায়ে খিল ধবে গিয়েছিল। শ্রীমান অমৃত তো একেবারে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। আইসক্রিমেব লোভ দেখিয়েও শঙ্কর তাকে বাগে আনতে পারছে না।

অমৃতই প্রথম দেখতে পায় ওঁদেব। সে ছুটতে ছুটতে ওঁদের গাড়িব কাছে চলে গিয়েছে। তারপর ওঁদের দেখতে পেয়ে আমাদেব কাছে ডাকছে।

দুজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। তাঁরাও পথের পাশে গাড়ি থামিয়ে পায়চারি করছেন। বয়স বোধকরি দুজনেরই সাতের ঘরে। বৃদ্ধ দীর্ঘদেহী, বেশ শক্ত-পোক্ত। পরণে কালো প্যাণ্ট ও হলুদ বুশ সার্ট। মাথায় টাক আর কিছু ছোট-ছোট পাকা চুল। ভদ্রমহিলা খাটো। পরণে হালকা রঙের গাউন। মাথার চুল সবই সাদা। হাতে লাঠি।

কাছে এসে শুনি অমৃত তাঁদের সঙ্গে জর্মনে দিব্যি আলাপ জুড়ে দিয়েছে। না, এ ছেলের ভবিষ্যত নিয়ে বৃথাই শঙ্করের এত ভাবনা।

আমরা ওদের সঙ্গে করমর্দন করি। শঙ্কর জয়া ও গৌর আলাপ শুরু করে দেয়। তারপরে আমাকে জানায়—এঁরাও বেড়াতে বের হয়েছেন। কৌলন থেকে আসছেন। ব্ল্যাক-ফরেস্ট যাবেন। এখানে একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন।

একটু পরে ওরা বিদায় নিলেন। আমরাও খাওয়া শেষ করে গাড়িতে এসে উঠি। গাড়ি চলতে শুরু করে। ফ্রাঙ্কেনস্টাইন যায় হারিয়ে।

না। আমি ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের কথাই ভেবে চলি। আরেক

ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। নামটা দেখার পর থেকেই যে ভাবনা আমাকে পেয়ে বসেছিল। বিশ্বের কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর ভাণ্ডারে বোধকরি সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। রোমান্টিক ইংরেজ কবি পার্সি বিশি শেলীর (১৭৯২-১৮২২) সহধর্মিনী মেরী শেলী (১৭৯৭-১৮৫১) সেই কাহিনীর রচয়িতা। ১৮১৬ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি এই কাহিনী রচনা করেন। দু-বছর পরে এটি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।

কবি দম্পতি তখন জেনিভায় ছুটি কাটাচ্ছেন। রোজই বিকেলে তাঁদের বাড়িতে আড্ডা বসে। আসেন কবিবন্ধু লর্ড বায়রন এবং আরো অনেক। নানা আলোচনা চলে। বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাই বেশি হয়। কারণ শেলীদম্পতি বিজ্ঞান সম্পর্কে খুবই উৎসাহী ছিলেন। বিজ্ঞানীরা তখন বিদ্যুৎ শক্তির আবিষ্কার নিয়ে যার-পর-নেই উত্তেজিত।

এই আড্ডাতেই একদিন তাঁদের হাতে এলো একখানি জর্মন ভূতুড়ে গল্পের সংকলন। ঠিক হল আড্ডাধারীরা সকলেই একটি করে বিজ্ঞান-ভিত্তিক ভূতের গল্প রচনা করবেন।

শেলী ও বায়রন সহ অন্য কেউ কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে গল্প লিখতে পারলেন না। পারলেন কেবল উনিশ বছরের তরুণী মেরী। আর সে কাহিনী আজ প্রায় পৌনে দু'শো বছর পরেও বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

মেরী শেলীর নায়ক ভিক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সৃষ্টি করলেন এক দানব। বৈজ্ঞানিক শক্তির সাহায্যে তিনি সেই দানবদেহে প্রাণের সঞ্চার করলেন। সৃষ্টির উন্মাদনায় নির্মিত সেই অমিত বলশালী দানব মানুষের ঘৃণায় একদিন খুনীতে পরিণত হল। একে একে সে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন পরিবারের প্রত্যেককে হত্যা করল। অবশেষে অনুতপ্ত দানব নিজেকে ধ্বংস করে তার অভিশপ্ত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করল।

এই দানবকে আমরা দেখেছি জগতের যাবতীয় মারণাস্ত্রের মাঝে, দেখেছি হিরোসিমা—নাগাসিকিতে। খুবই দুর্ভাগ্যের কথা, উনিশ বছরের এক তরুণী ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যে সতর্কবাণী

উচ্চারণ করে গিয়েছেন, বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও আমরা সে সম্পর্কে সচেতন হতে পারি নি। উপরন্তু সেই দানবটাকে আরও ভয়ঙ্কর, আরও নিষ্ঠুর করে তোলার নেশায় মেতে রয়েছি।

॥ আট ॥

ফ্রাঙ্কেনস্টাইন গ্রাম ছাড়িয়ে এসেছি বেশ কিছুক্ষণ। এতক্ষণ আমরা উত্তর-পুবে চলেছিলাম। সেটা ছিল অনিয়ম। কারণ আমরা পশ্চিম-জর্মনীর মধ্যাঞ্চল থেকে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে যাবো। অতএব আমাদের যেতে হবে দক্ষিণে কিম্বা দক্ষিণ-পূর্বে। তবু বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমরা উত্তর-পুবে পথ চলেছিলাম। এবারে সেই পালা শেষ হল। শুরু হল দক্ষিণ-পূর্বদিকে পথচলা।

পথও পরিবর্তিত। সংকীর্ণ গ্রাম্যপথের পরিবর্তে প্রশস্ত জাতীয় সড়ক। নাম এন্. এইচ. ফরটিএইট্।

দুপাশে বনময় পাহাড়। মাঝখানে মসৃণ ও প্রশস্ত পথ। পথের ধারে তারকাঁটার বেড়া। তার মানে এগুলো সবই সংরক্ষিত বনাঞ্চল। একটা সাইনবোর্ডও লাগানো রয়েছে—Naturpark, প্রাকৃতিক কানন।

ভারী ভাল লাগছে পথ চলতে। কিছুক্ষণ বাদেই বন শেষ হয়ে গেল। শুরু হল আঙ্গুর ক্ষেত। পথের দুপাশে যতদূর দেখা যায় শুধু আঙ্গুর আর আঙ্গুর। দ্রাক্ষা আর দ্রাক্ষা। ভাইন স্ট্রাসে। আমরা মনের আনন্দে পথ চলেছি।

কিন্তু আনন্দপথ অচিরেই শেষ হয়ে গেল। ক্ষেত ছাড়িয়ে জনপদে পৌঁছলাম। শঙ্কর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে! বলে উঠে—বাড্-ড্যুরখাইম্ (Bad Durkheim)। আজকের রাতের আশ্রয়।

তার মানে যাত্রার যতি আসন্ন। ঘড়ি দেখি, বিকেল ছ'টা। এক নাগাড়ে প্রায় সাড়ে সাতঘণ্টা মোটর চালাবার পরে শঙ্কর ছুটি

পাবে। ওর খুশি হবারই কথা।

গতকাল কোব্লেঞ্জ ছাড়বার পরে আর এতবড় শহরে পদার্পণ করি নি। কেবল বড় নয়, বেশ ছিমছাম সাজানো-গোছানো শান্ত শহর। আবহাওয়াটিও মনোরম। কেনই বা হবে না। উচ্চতা যে ৫৭১ মিটার!

কয়েক মিনিট খোঁজাখুঁজির পরেই একটি বেশ ভাল পেন্সন (Pension) পাওয়া গেল। রাস্তার পাশে পাঁচতলা বাড়ি। বাড়ির পেছনে বাঁধানো আঙ্গিনায় বোর্ডারদের গাড়ি রাখার ব্যবস্থা।

আমরা মালপত্র নামাই। গাড়ি বন্ধ করে শঙ্কর বলে—গতকাল বন্ থেকে বের হবার পরে এ পর্যন্ত ৭৬৫ কিলোমিটার গাড়ি চলেছে।

—তার মধ্যে আজই বোধহয় শ' পাঁচেক কিলোমিটার?

—নিশ্চয়ই। গতকাল তো মাত্র সওয়া দু-ঘণ্টা গাড়ি চলেছে। বড়জোর শ' দুয়েক কিলোমিটার পথ পার হয়েছিলাম। জয়া গৌরকে সমর্থন করে।

তিনতলায় ঘর পাওয়া গেল। বাথরুম যুক্ত পাশাপাশি দুখানি ডব্ল-বেড রুম। ব্রেকফাস্ট সহ মাথাপিছু দৈনিক ভাড়া ২৫ মার্ক। অমৃতের জন্য কিছু দিতে হবে না। তার মানে শস্তাই বলতে হবে।

পেনসনের লোক লিফটে করে আমাদের তিনতলায় নিয়ে এলো। ঘর পরিষ্কার করে বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়াড় পালটে দিল। বাথরুমে তোয়ালে ও সাবান রেখে বিদায় নিল।

মাঝারী আকারের আলো-হাওয়াযুক্ত ঘর। মেঝেয় কার্পেট পাতা। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সবই রয়েছে। রয়েছে রাস্তার দিকে ছোট একটু ব্যালকনী।

পেনসনের লোক চলে যাবার পরে গৌর বাথরুমে ঢোকে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে। তার হাতে একখানি সাবান। বড় বড় হোটেলে ব্যবহারের জন্য বোর্ডারদের যেমন ছোট-ছোট সাবান দেওয়া হয়।

সাবানখানি আমার হাতে দিয়ে বলে—এখানির ওপরে আজকের

তারিখ আর এই শহরের নাম লিখে তোমার স্যুটকেশে রেখে দাও। Memento বা স্মারকচিহ্ন হিসেবে বাড়ি নিয়ে যেও।

প্রস্তাবটি সত্যই সুন্দর। আজকের এই অপরাহ্ণটি, আগামী-দিনের সুখ-স্মৃতিতে হবে রূপান্তরিত। তখন এই ছোট্ট সাবানখানি আমার কাছে সুমধুর স্মৃতিচিহ্ন হয়ে উঠবে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিতেই সাতটা বেজে গেল। আজ লাঞ্চ্ করা হয় নি বললেই চলে। আগেই বলেছি গ্রীষ্মকালে য়ুরোপের মানুষ দিনের আলোতেই রাতের খাওয়া সেরে নেন। সুতরাং খাবারেব হোটেলগুলি বন্ধ হয়ে যেতে আর বেশি দেরি নেই। তাই তাড়াতাড়ি পোশাক পালটে পথে নেমে আসি।

জুলাই মাস য়ুরোপে ছুটির মরশুম, ভ্রমণের মরশুম। পথে পথে পর্যটকদেব ভিড়। এখানেও তাই। কারণ সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর স্থান রূপে এ শহরটির বেশ খ্যাতি আছে।

চলতে চলতে শঙ্কর শহরের কথাই বলে চলে—রোমান আমল থেকেই এ জায়গাটি সুপরিচিত। কারন সেকালেও এ অঞ্চলের কাঠ মদ ও 'সসেজ' বিখ্যাত ছিল। সে খ্যাতি আজও অম্লান। সেপ্টেম্বাব মাসে এখানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় 'ওয়াইন ফেস্টিভ্যাল' বা সুরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।...

—তোমার নিশ্চয়ই মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? জয়া জিজ্ঞেস করে।

শঙ্কর বুঝতে পারে না ওর প্রশ্ন। সে পাল্টা প্রশ্ন করে—কেন ব'লো তো?

—এটা সেপ্টেম্বার মাস নয় বলে।

আমরা হেসে উঠি। শঙ্কর লজ্জা পায়। কোনমতে বলে ওঠে—না, না, মন খারাপ হবে কেন?

—ঠিকই-তো! গৌর শঙ্করের পক্ষ নেয়। বলে—এখন ওয়াইন

ফেস্টিভ্যাল না হতে পারে। কিন্তু ওয়াইন পেতে তো কোন অসুবিধে নেই। যাক্ গে, ওয়াইনের কথা থাক, তুমি বরং বাড্-ড্যুরখাইমের কথা ব'লো।

শঙ্কর শুরু করে—এখানে চতুর্দশ শতকে নির্মিত একটি গির্জা আছে। সেই গির্জায় ১৮৬৬ সালে যে 'গথিক টাওয়ার' তৈরি করা হয়েছে, তা সত্যি দেখবার মতো। তা ছাড়া এখানে কয়েকটি দর্শনীয় সমাধিক্ষেত্র রয়েছে।

—আমরা দেখব না? জয়া জিজ্ঞেস করে।

গৌর উত্তর দেয়—আজ আর হয়ে উঠবে না। আজ খেয়ে এসে শুয়ে পড়তে হবে, সারাদিন শরীরের ওপর খুবই ধকল গিয়েছে। আগামীকাল সকালে সময় করতে পারলে দেখে নেওয়া যাবে।

কথাটা শঙ্কর বললে হয়তো জয়া একটু আপত্তি করত কিন্তু গৌর বলায় সে আর কোন কথা বলে না। নীরবে হাঁটতে থাকে। আমরা জনবিরল পথ ধরে এগোতে থাকি। কেবল মানুষ নয়, পথে গাড়ির সংখ্যাও সামান্য। আশ্চর্য! মানুষগুলো কি এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? কি জানি? হয়তো হবে।

—কিন্তু আমরা কোথায় চলেছি? গৌর জিজ্ঞেস করে। প্রশ্নটা অকারণে নয়। ইতিমধ্যে আমরা একাধিক রেস্তরাঁ পার হয়ে এলাম। অথচ শঙ্কর হেঁটেই চলেছে।

গৌরের প্রশ্ন শুনে সে একটু থামে। তারপরে আবার হাঁটতে-হাঁটতে বলে—এসব রেস্তরাঁয় শঙ্কুদার অসুবিধে হবে। এখানে একটা চীনা রেস্তরাঁ আছে। সেখানে আমিষ ও নিরামিষ দু-রকম খাবারই খুব ভাল, দামেও শস্তা। সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।

—তুমি কি ঠিকানা জানো?

—না। তবে রেস্তরাঁটি চিনি। বছর কয়েক আগে যখন এসে-ছিলাম, তখন সেখানে খেয়েছি। একটু খোঁজাখুঁজি করলেই পেয়ে যাবো।

—তার চেয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করো না! জয়া পরামর্শ দেয়।

—কাকে জিজ্ঞেস করব? পথচারীরা তো সবাই ট্যুরিস্ট্।

—ঐ ভদ্রমহিলা মনে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দা।

জয়া দেখিয়ে দেয়। জনৈকা স্বাস্থ্যবতী প্রবীণা। একটা থলিতে কিছু নিয়ে একা-একা পথ চলেছেন।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে এগিয়ে যায়। কথা বলে। আমরাও কাছে আসি। শঙ্কর তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। তারপরে বলে—ইনি চীনা রেস্তরাঁটি চেনেন। আমাদের পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন।

ভদ্রমহিলা একটু হেসে চলতে শুরু করেন। আমরা তাঁকে অনুসরণ করি। বলা বাহুল্য শঙ্কর তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে পথ চলেছে। কাজটা খুব সহজ নয়। কারণ আমাদের দেশের মতো জর্মনীর এক অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে অন্য অঞ্চলের বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের ভাষার পার্থক্য খুবই বেশি। হামবুর্গের জর্মন আর ম্যুনিকের জর্মনের পার্থক্য প্রায় কলকাতার বাংলা আব চট্টগ্রামের বাংলার মতই। আমরা বাভেরিয়ার কাছাকাছি চলে এসেছি। হামবুর্গবাসীদের অর্থাৎ উত্তর-জর্মনীর অধিবাসীদের একটি জনপ্রিয় ব্যঙ্গ কৌতুক আছে, যার ইংরেজী করলে দাঁড়ায়—'For a Bavarian, he speaks quite a good German' অর্থাৎ উত্তর জর্মনীর মানুষরা মনে করেন দক্ষিণ জর্মনীর মানুষরা জর্মন বলেন না। সুতরাং শঙ্কর যে এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছে, এটা কোনমতেই সহজ কাজ নয়।

বড় রাস্তা ছেড়ে ভদ্রমহিলা একটা গলিপথ ধরলেন। শঙ্কর পেছন ফিরে আশ্বস্ত করল—আমরা পথ-সংক্ষেপ করছি।

ভাল কথা। খুবই খিদে পেয়েছে। শঙ্কর বলেছে, চীনা রেস্তরাঁয় মনের মতো খাবার খাবো। সংক্ষিপ্ত পথে আর বোধকরি বেশি সময় লাগবে না।

সত্যই লাগল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শঙ্করের সুপরিচিত সেই চীনা রেস্তরাঁর সামনে উপস্থিত হওয়া গেল।...

কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তি করা হয়ে উঠল না। কারণ দোকানের দরজায় বড় বড় তালা ঝুলছে। সামনে নোটিশ। গৌর পড়ে বাংলা বলে দেয়—

'প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীবৃন্দ একই সময়ে বাৎসরিক ছুটি চাওয়ায় একমাসের জন্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হল। পর্যটকদের অসুবিধের জন্য আমরা দুঃখিত।'

ভদ্রমহিলাও দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দিই। তিনি বিদায় নিয়ে ঘরের পথে পা বাড়ান। আমরা ফিরে চলি বড় রাস্তার দিকে।

চলতে চলতে ভাবি. খাবারের অভাব হবে না। কোন না কোন রেস্তরাঁয় মনের মতো খাবার পেয়ে যাবো। সুতরাং খাবারের কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি, এদেশের ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা। য়ুরোপের নিয়ম হল, কর্মচারীদের বাৎসরিক ছুটি নিতেই হবে এবং কে কবে ছুটি নেবে তা বছরের প্রথমেই জানিয়ে দিতে হবে। কর্মচারীদের ছুটির দরখাস্ত দেখে কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থা স্থির করে নেন। যে কোন কারণেই হোক, এই রেস্তরাঁর কর্মচারীরা সবাই একই সময়ে বাৎসরিক ছুটি চেয়েছেন। এটি পর্যটন মাস, বছরের সবচেয়ে ব্যস্ত মরশুম। তবু কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের বাধা দেন নি। তাঁদের ছুটি মঞ্জুর করে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছেন। অথচ এটি সরকারী এমনকি এদেশীয় প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত নয়, একটি চীনা রেস্তরাঁ। তা হোক গে, 'যস্মিন দেশে যদাচার।'

শেষ পর্যন্ত বেশ ভাল ডিনার পাওয়া গেল। খেয়ে নিয়ে পেনসনে ফিরে এলাম। সবে সাড়ে আটটা। এখনও সন্ধ্যে হতে ঘণ্টাখানেক। কিন্তু শঙ্কর ও জয়া ঘরে চলে গেল। শঙ্কর খুবই শ্রান্ত আর জয়া ছেলের জন্য। মা পাশে না থাকলে সে বেটার নাকি চোখে ঘুম আসে না।

আমি ও গৌর দু'খানি চেয়ার নিয়ে এসে ব্যালকনীতে বসলাম।

বসে বসে রোদ ও ছায়ার খেলা আর আকাশের রঙ ফেরা দেখতে থাকলাম।

দেখতে দেখতে একসময় সহসা গৌর বলে উঠল—তুমি এবারে মোটরে জর্মনী ভ্রমণ করছ। বুঝতে পারছ, মোটরে এ দেশ দেখা খুবই সহজ।...

আমি মাথা নাড়ি। গৌর বলতে থাকে—একে তো অটোবান ও অন্যান্য চমৎকার রাস্তা। ঘণ্টায় একশ' থেকে সোয়া শ' কিলো-মিটার বেগে গাড়ি চালানো কিছুই নয়। তার ওপরে পথে পথে খাওয়া-থাকার, গাড়ি রাখার, গাড়ি সারাবার ও তেল নেবার চমৎকার ব্যবস্থা। মোটর চালকদের সাহায্য করবার জন্য তিনটি অটো-মোবাইল ক্লাব রয়েছে। তাঁরা নিয়মিত মানচিত্র ও পথপঞ্জী প্রকাশ করেন। তাঁদের মেকানিক ও অন্যান্য কর্মচারীরা সারা দেশের বড় বড় রাস্তায়, বিশেষ করে অটোবানে সর্বদা টহল দিচ্ছেন। ওঁদের গাড়িতে ওয়্যারলেস রয়েছে। তুমি অটোবানের কোন টেলিফোন বুথ থেকে যেকোন ক্লাবে ফোন করলেই তাঁরা ওয়্যারলেসে তাঁদের গাড়িকে বলে দেবেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এম্বুলেন্স কিম্বা ব্রেক-ডাউন ভ্যান তোমার কাছে চলে আসবে। তুমি তো জানো অটোবানে প্রতি সাড়ে সাত মাইল দূরে দূরে টেলিফোন বুথ রয়েছে। সেখান থেকে তুমি পৃথিবীর যে কোন জায়গায় ফোন করতে পারো।...

আমি মাথা নাড়ি। গৌর বলতে থাকে—তিনটি অটোমোবাইল ক্লাবের প্রধান হল A. D. A. C. মোটরযাত্রীদের সাহায্য করার জন্য তাঁদের চারখানি হেলিকপ্টার পর্যন্ত রয়েছে।

একবার থামে গৌর। তারপরে আবার শুরু করে—সেদিন রাতে বন্ পৌঁছে তোমরা অতক্ষণ ধরে কেন রাস্তা খুঁজলে বুঝতে পারছি না! পথের কোন পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে যেকোন একটা অটোমোবাইল ক্লাবকে টেলিফোন করলে পনেরো মিনিটের মধ্যে একজন 'অটো পায়লট' তোমাদের কাছে চলে আসত। সে সামান্য ফি নিয়ে তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিত।

চুপ করে গৌর। কিন্তু এখুনি কি শুতে যাবো? এখনো যে সন্ধ্যে হয় নি। য়ুরোপের অধিকাংশ মানুষ গ্রীষ্মকালে দিনের আলো থাকতেই পর্দা টেনে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে পড়েন। কিন্তু আমার তাতে ঘুম আসে না। তাই গৌরকে বলি—এবারে জর্মনদের সম্পর্কে কিছু ব'লো।

গৌর বোধকরি বুঝতে পারে না, আমি কি জানতে চাইছি। সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি আবার বলি—মানে তুমি তো বহু বছর জর্মনীতে রয়েছো। আমি তোমার কাছ থেকে জর্মনদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু জানতে চাইছি।

গৌর শুরু করে—জর্মনদের সবচেয়ে বড় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁদের নিয়মনিষ্ঠা। আমি লণ্ডনে স্থায়ী হয়েছি। চাকরির জন্য য়ুরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বসবাস করেছি। তবু আমার ধারণা জর্মনদের মতো 'Methodical' মানে নিয়মনিষ্ঠ জাতি পৃথিবীতে আর নেই। তাই স্টিফেন লিকক নামে জনৈক বিখ্যাত ক্যানাডিয়ান সুরসিক লেখক লিখেছেন—…'even the birds sit in a neat row on the boughs of trees and sing in choir and harmony under a conductor bird'. জর্মনীর পাখিরা পর্যন্ত গাছের ডালে বসে গান গাইবার সময় তাদের নায়কের নির্দেশ পালন করে থাকে।

—ভারী সুন্দর লিখেছেন তো?

—হ্যাঁ। গৌর একটু হাসে। তারপরে বলতে থাকে—সুতরাং জর্মনীতে বাস করতে হলে তোমাকে নিয়মনিষ্ঠ হতেই হবে। হতে হবে মার্জিত এবং আচারপ্রিয়। তোমাকে যদি একবেলায় দু'শো-বার কারও নাম করতে হয়, তাহলে প্রত্যেকবার 'হের' সহযোগে তাঁর পুরোনামটি বলতে হবে। এমন কি তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেও।

—আরেকটা কথা…। গৌর বলে চলে—জর্মনীতে বাস করতে হলে তোমাকে ভাল পোশাক পরে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেই হবে। ফরাসীরা পান-ভোজনের জন্য সর্বস্ব উড়িয়ে দেন। আর জর্মনরা

না খেয়ে থাকবেন তবু জীর্ণ অথবা নোংরা পোশাক পরবেন না।

একবার থামে গৌর। কিন্তু আমি কিছু বলতে পারার আগেই সে আবার বলতে শুরু করে—তোমাদের ধারণা জর্মনরা যেমন বুদ্ধিমান ও স্বাস্থ্যবান, তেমনি পরিশ্রমী। কিছুদিন আগেও তোমাদের ধারনাটা সত্য ছিল কিন্তু এখন আর নেই।

—সেকি! আমি বিস্মিত।

গৌর একটু হেসে উত্তর দেয়—জর্মনরা দক্ষ এবং বুদ্ধিমান সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন তাঁরা তেমন পরিশ্রম করতে চান না। তাঁরা তাঁদের প্রতিবেশীদের মতই শ্রমবিমুখ হয়ে উঠেছেন। অবশ্য এখন তাঁদের আর আগের মতো পরিশ্রম করতে হয়ও না। কারণ সময়ের পরিমাপে জর্মনীর কর্মসপ্তাহ এখন য়ুরোপে সবচেয়ে কম কিন্তু শ্রমিকের মজুরী সবচেয়ে বেশি। জর্মনরা এখন কাজের কথার চেয়ে হাসি-ঠাট্টা, খেলা-ধূলা রাজনীতি ও গাড়ির আলোচনা করতে বেশি ভালোবাসেন। পঞ্চাশের দশকে একদল জর্মন শ্রমিক একদিনে একটা বোমা-বিধ্বস্ত বাড়ির সম্পূর্ণ সংস্কার সাধন করে ফেলেছেন। কিন্তু এখন আর তেমনটি হবার উপায় নেই। যুদ্ধের পরে পুর্নগঠনের কাজে জর্মনদের মধ্যে যে একাগ্রতা দেখা দিয়েছিল, তা আর অবশিষ্ট নেই। কয়েকবছর প্রভূত পরিশ্রম ও নানা কষ্ট স্বীকার করে জর্মনরা দেশকে যুদ্ধের অভিশাপমুক্ত করে তুলেছেন। কিন্তু তারপরেই তাঁরা য়ুরোপের অন্যান্য জাতির মতই ভোগী আর বিলাসপ্রিয় হয়ে উঠেছেন।

॥ নয় ॥

কলকাতায় বসে কথায় কথায় সেদিন ডাক্তার অমিতাভ সেন বলেছিলেন, আবার যখন জর্মনী যাচ্ছেন এবারে ব্ল্যাক ফরেস্ট বেরিয়ে আসুন। সেই কথা থেকেই আমার এই বেলজিয়াম থেকে বাভেরিয়া ভ্রমণ।

ডাক্তার সেন ছাড়াও কয়েকজনের কাছে আমি ব্ল্যাক-ফরেস্ট বা কৃষ্ণারণ্যের কথা শুনেছি। তাদের মধ্যে আমার ফরাসী বোন গাব্রিয়েল রিফ্‌স্থাল অন্যতমা। তার দাদু দিদিমা ও মা যুদ্ধের সময় সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানেই জন্ম হয় গ্যাব্রিয়েলের।*

আজ আমি সেই ব্ল্যাক ফরেস্ট দর্শন করব। পৌঁছব গাব্রিয়েলের জন্মস্থান উষ্ণ-প্রস্রবণের নগরী বাডেন-বাডেন (Baden-Baden)। আমি একজন নিতান্ত দরিদ্র হয়েও ধনীদের সেই বিলাস কেন্দ্রে পদার্পণ করতে পারছি। সত্যিই আমার প্রতি জীবন দেবতার করুণা সীমাহীন।

তাঁরই উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বিছানায় উঠে বসি। ঘড়ি দেখি। আরে, এ যে দেখছি আটটা বাজে! কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলাম। তাহলেও এত বেলা অবধি ঘুমনো ঠিক হয় নি। জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে স্নান ও ব্রেকফাস্ট সারতে অন্তত ঘণ্টা দেড়েক দরকার। আমাদের দলে একটি বাচ্চা ও একজন মহিলা রয়েছে।

গৌর এখনও ঘুমুচ্ছে। এখুনি ওকে ডেকে কোন লাভ নেই। আমাদের তুজনের একটা বাথরুম। তার চেয়ে বরং শঙ্করদের তুলে দিয়ে আমি বাথরুম সেরে নিই।

পেন্‌সন ম্যানেজারের সঙ্গে কাজ মিটিয়ে 'টিপ্‌স' পর্ব সেরে নিয়ে

* লেখকের "এক ফরাসী নগরে' বইখানি দ্রষ্টব্য।

শঙ্কর গাড়িতে এসে ওঠে। গাড়ি চলতে শুরু করে। এখন সকাল পৌনে দশটা। আজ আমাদের ভ্রমণের তৃতীয় দিন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা বাড-ড্যুরখহাইম্ শহর ছাড়িয়ে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আঙ্গুরক্ষেত, পথের দু-পাশেই। এটি একটি প্রায় সমতল উপত্যকা। পাহাড় বেশ খানিকটা দূরে। পথটি প্রশস্ত এবং মসৃণ।

গৌর মানচিত্র দেখে বলে—২৭২ নম্বর জাতীয় সড়ক।

শঙ্কর যোগ করে—এ পথের পাশে আপনি মাঝে মাঝেই সুন্দর-সুন্দর গ্রাম দেখতে পাবেন। গ্রামগুলো খুবই সমৃদ্ধ। মদ এবং পর্যটন শিল্পই এ সমৃদ্ধির কারণ।

—প্রকৃতপক্ষে এই পথটাকেই ভাইন স্ট্রাসে বলে। দেখছ না পথের পাশে কি রকম আঙ্গুর ক্ষেত? গৌর আবার বলে।

আমি মাথা নাড়ি। কিন্তু ভেবে চলি অন্যকথা। মদ ও পর্যটনের মধ্যে কোন বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে কি? মদের জন্যই কি এত বেশি পর্যটক এ অঞ্চলে আসেন?···

ভাবনায় ছেদ পড়ে। হঠাৎ দেখতে পাই ওকে, জনৈক জর্মন যুবককে। তার মাথায় একটা সাদা টুপি, পরনে কালো প্যাণ্ট, চোখে কালো চশমা, খালি গা।

পথের পাশে প্রকাণ্ড একটা 'রক্' (পাথর) পড়ে আছে। তারই সামনে একটা কাঠের প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে সে যেন কি করছে? সে একা, কাছে-পিঠে আর কোন লোক দেখছি না। কেনই বা দেখব? বেশ চড়া রোদ উঠেছে। পাথরটাও বিস্ময়কর। এই সবুজ কোমল সমতলে এত বড় একটা পাথর এলো কোথা থেকে?

যেমন করেই এসে থাকুক। যুবকটি একা এখানে কি করছে?

—আর্টিস্ট, স্কাল্‌পটার। পাথরে মূর্তি খোদাই করছে। জয়া বলে ওঠে।

শঙ্কর গাড়ি থামায়। সে ক্যামেরা হাতে নিয়ে নেমে পড়ে। আমরাও তাকে অনুসরণ করি। শিল্পীর কাছে আসি।

হাতের কাজ বন্ধ করে সে উঠে দাঁড়ায়। তার হাতে হাতুড়ি ও বাটালি। পাশে একটা ঝোলায় কিছু জিনিস রয়েছে। বোধকরি আরও কিছু যন্ত্রপাতি এবং খাবার ও পানীয়। রয়েছে একখানি সাইকেল।

জয়ার প্রশ্নের উত্তরে তরুণ শিল্পী বলে—ক্লান্ত পথচারীদের ক্লান্তি বিনোদন ও মানসিক শান্তির জন্য আমি এখানে প্রেমময়ী ও কল্যাণ-ময়ী মাদোনা-র (Madona) একটি মূর্তি খোদাই করছি।

জয়া তাকে অভিনন্দিত করে। গৌর তার সঙ্গে কথা বলে। আমি করমর্দন করে তাকে ধন্যবাদ দিই। শঙ্কর তার ছবি নেয়। অমৃত আপন সঞ্চয় থেকে তাকে একটি টফি খেতে দেয়। শিল্পী খুশি হয়ে অমৃতকে চুমু খায়।

ওব কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে ফিরে আসি। গাড়ি চলতে শুরু করে। অমৃত হাত নাড়ে। শিল্পী সাড়া দেয়।

সত্যই জাত শিল্পী। বিনা পারিশ্রমিকে এই জনহীন প্রান্তরে একাকী পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কবছে।...

গৌর বলে যুবকটি গাঁয়ের ছেলে। থাকে এখান থেকে প্রায় পনেরো কিলোমিটার দূরে। ট্যুবিংগেন (Tubingen) আর্টস কলেজ থেকে পাশ করে পেটের দায়ে লান্‌ডাউ-তে (Landau) একটা বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করছে। সে কাজ ভাল লাগে না বলে মাঝে মাঝেই ছুটি নিয়ে এই ধরনের কাজে লেগে যায়। এর আগে লান্‌ডাউ-য়ে একটা খোদাই কাজ করেছে। এ কাজটা নাকি তার চেয়ে ভাল হবে। কারণ এটা চুণা পাথর এবং অনেক বড়। তাছাড়া অবস্থানটিও চমৎকার। জনহীন প্রান্তরে দূর থেকে মোটর-চালকরা মূর্তিটি দেখতে পাবেন, কাছে এসে গাড়ি থামিয়ে দেবেন। দু-মিনিট দাঁড়িয়ে মূর্তিটা দেখবেন, কল্যাণময়ী মাদোনার মূর্তি দর্শন করে তাঁরা শিল্পীর কল্যাণ কামনা করবেন।

আর তাই তরুণ শিল্পী রোদে পুড়ে জলে ভিজে এই মূর্তি খোদাই করে চলেছে। সাবাস শিল্পী! আপনার আনন্দে সবাইকে আনন্দিত

করে তোলাতেই তো শিল্পীর সাফল্য, তার সৃষ্টির সার্থকতা।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। একটু বাদেই একটা গ্রাম। বেশি বড় নয়। এক জায়গায় পথের দুধারে কয়েকখানি ছোট-ছোট দোতলা বাড়ি। গ্রামের সীমা থেকে আঙ্গুর ক্ষেত। একেবারে দূরের পাহাড় পর্যন্ত প্রসারিত। সত্যই ভাইন স্ট্রাসে।

আমরা এগিয়ে চলেছি। পথের প্রকৃতি একই রকম। কয়েক কিলোমিটার বাদে বাদেই ছোট-ছোট গ্রাম। ছবির মতো মনোরম। গ্রামের কোন কোন বাড়ির সামনে মদের বিজ্ঞাপন। য়ুরোপে মদ এখনও একটি শ্রেষ্ঠ কুটিরশিল্প।

কোন বাড়িতে 'পেনসন' কিম্বা 'সীমার ফ্রাই'-য়ের পরিচয় পত্র গৌর ঠিকই বলেছে, মদ আর পর্যটক দিয়েই এঁরা বেঁচে আছেন। কেবল বুঝতে পারছি না, পর্যটকরা মদশিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, না মদ পর্যটকদের বাঁচিয়ে রাখছে?

বাড্-ড্যুরখাইম্ থেকে রওনা হবার মাত্র মিনিট বিশেক বাদে আমরা একটা ছোট শহরে এলাম। পথের দুপাশেই বাড়ি-ঘর ও দোকান-পাট। কয়েকটা স্কাই-স্ক্র্যাপারও রয়েছে। আর সেই সঙ্গে আঙ্গুর ক্ষেত। ঘরের পাশে দ্রাক্ষাবন।

গৌর বলে—এ রাস্তাটা হল ৩৮ নম্বর জাতীয় সড়ক। এখান থেকে লান্ডাউ মাত্র ১৬ কিলোমিটার আর আপনার স্ত্রাসবুর্গ-ও খুবই কাছে।

আমার স্ত্রাসবুর্গ! তাই বটে। গত তিন সপ্তাহ সেখানে আমার ফরাসী বোন গাব্রিয়েল রিফ্স্থাল-য়ের কাছে বাস করে সত্যই দু-হাজার বছরের পুরনো সে শহরটাকে নিজের বলে ভাবতে শুরু করেছি কিন্তু সেকথা স্বীকার করা যাবে না। ওরা ঠাট্টা করবে। অতএব চুপ করে থাকি।

বাইরে তাকাই। পথের ডানদিকে খানিকটা দূরে আঙ্গুরক্ষেতের মাঝে একটা সবুজ টিলা। তার ওপরে একটা প্রাচীন দুর্গ। এখনও কি কেউ বাস করেন ওখানে? কিম্বা ওটি শুধুই দর্শনীয়স্থল?

জানা নেই আমার। কেবল জানি একদিন এই আঙ্গুরক্ষেতের দখল নিয়ে বহু রক্তপাত হয়েছে। তখন ঐ দুর্গের একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

দশ মিনিট পরে আরেকটা ছোট শহর। নাম এডেস্‌হাইম্ (Edesheim)।

শঙ্কর বলে—এখানে 'জিলেট' ব্লেড তৈরির কারখানা। ঐ দেখুন, দেখা যাচ্ছে।

আমি দেখি, তেমন বড় নয়। আশ্চর্য, এতটুকু কারখানায় সেই বিশ্ববিখ্যাত ব্লেড ও র‍্যাজর উৎপন্ন হয়!

শহর ছাড়িয়ে আসতেই আবার শুরু হল আঙ্গুর ক্ষেত। যন্ত্র-শিল্পে জর্মনীর খ্যাতির কথা শুনে আসছি আশৈশব। কিন্তু এ দেশটি যে কৃষি সম্পদে এমন সম্পদশালী, তা জানা ছিল না। পরশু বিকেলে কোব্‌লেঞ্জ ছাড়ার পর থেকে আঙ্গুরক্ষেত আমাদের সঙ্গী হয়েছে। গতকাল সারাদিন সে আমাদের সঙ্গে ছিল, আজও রয়েছে। অথচ ইতিমধ্যে আমরা কম করেও শ'সাতেক কিলোমিটার পথ পার হয়ে এসেছি। ফরাসী দেশেও আমি আঙ্গুর ক্ষেত দেখেছি। দেখছি শ্যাম্পেন ও এ্যালজ্যাস অঞ্চলে। কিন্তু তা এমন বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়ে নয়। তাছাড়া শঙ্কর বলছে এ আঙ্গুর নাকি আরও ভাল জাতের।

জাত বিচারের কথা থাক। আমি ভাবছি ভগবানের কথা। তাঁর কি আশ্চর্য পক্ষপাতিত্ব এই দেশটির প্রতি। যেমন শ্রমশীল ও মেধাবী মানুষ, তেমনি উর্বরা প্রকৃতি। আর তাই এ দেশকে ভাগ না করে উপায় কি? আবার যদি কখনও দুই জর্মনী এক হয়ে যায়, তাহলে মিলিত জর্মনী পুনরায় সাম্যবাদী ও পুঁজিবাদী উভয়েরই রাতের ঘুম কেড়ে নেবে। তাহলেও বোধকরি এ মিলন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। এবং আমরা সেদিন সেই মিলনকে অবশ্যই স্বাগত জানাবো। কারণ দেশবিভাগের জ্বালায় আমরাও যে জ্বলছি চল্লিশ বছর ধরে।

লান্‌ডাউ এসে গেল। বেশ বড় শহর। জেলাসদর। এখন

সকাল সাড়ে দশটা। সুতরাং খুবই কর্মব্যস্ত। তার চেয়ে বড় কথা, শহরটা গড়ে উঠেছে মদশিল্পকে অবলম্বন করে।

শহরের জনবহুল পথ পেরিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। পথের দুপাশেই বাড়ি। সেকালের বাড়ির সংখ্যাই বেশি।

গৌর বলে—বাড়িগুলোর গড়ন আধুনিক না হলেও, এগুলি খুব একটা পুরনো নয়। কারণ ১৬৮৯ সালে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে এই শহরের তিন চতুর্থাংশ বাড়ি পুড়ে গিয়েছিল। তারপরে চতুর্দশ লুই-য়ের আদেশে স্থপতি ফাউবান্ (Vauban) শহরের নতুন নক্সা তৈরি করেন. সেই নক্সা অবলম্বনে এই নতুন শহর। কেবল জর্মন ও ফরাসী তোরণ দুটি আজও সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীর স্মৃতি রক্ষা করে চলেছে।

তোরণ দুটি ছাড়া এখানে দুটি পুরনো গীর্জা আছে। ১২৭৬ সালে স্থাপিত ও চতুর্দশ শতকে নবনির্মিত প্রোটেস্টান্ট প্যারিশ চার্চ। ১৮৯৭ সালে গীর্জাটির আমূল সংস্কার সাধন করা হয়েছে।

আছে একটি ক্যাথোলিক প্যারিশ চার্চ। সেটি পঞ্চদশ শতকে স্থাপিত। কিন্তু বিগত বিশ্বযুদ্ধে বোমা পড়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখন আবার আগের মতো করে তৈরি করা হয়েছে।

একবার থামে গৌর। তারপরে বলে—এই রাস্তাটার নাম মার্টিন লুথার স্ট্রাসে। এই পথের ওপরে পুরনো বাড়িগুলো সবই সপ্তদশ কিম্বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত। বাড়িগুলোয় ফরাসী প্রভাব নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছ?

আমি মাথা নাড়ি। গৌর বলতে থাকে—আর এই দেখো, টাউন হল। এটি ১৮২৭ সালে নির্মিত। আগে গ্যারিসন হেড কোয়ার্টার্স বা নিরাপত্তারক্ষীদের প্রধান ঘাটি ছিল।...

—শুনেছি এখানে একটা ছোট যাদুঘর আছে? জয়া জিজ্ঞেস করে।

গৌর মাথা নাড়ে।

আমরা শহর ছাড়িয়ে অটোবান ধরেছি। ঝড়ের বেগে গাড়ি

চলেছে। ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটার।

পথের পাশে বোর্ড—স্ত্রাসবুর্গ ৮০ কিলোমিটার।…৭৫ কিলোমিটার…৭৩ কিলোমিটার।

আমরা অটোবান থেকে নেমে এসে অন্যপথ ধরলাম। গৌর বলে অটোবান রাইন পার হয়ে স্ত্রাসবুর্গ চলে গেল।

আমি বলি—হ্যাঁ, এপথে শেষ জর্মন শহর কেল (Kehl)। সেখানে গাব্রিয়েলের দিদিমা থাকেন। আমি একদিন এসেছিলাম।

জয়া জিজ্ঞেস করে—ওখান থেকে স্ত্রাসবুর্গ কত কিলোমিটার দেখলেন ?

—তিয়াত্তর।

—তার মানে মাত্র আধঘণ্টায় আমরা স্ত্রাসবুর্গ পৌঁছে যেতে পারতাম।

আমি মাথা নাড়ি।

শঙ্কর সহাস্যে বলে ওঠে—শঙ্কুদা, হোম সিক্‌নেস হচ্ছে নাকি ?

—না, না। হোম সিক্‌নেস হবে কেন ? স্ত্রাসবুর্গে তো আমার বাড়ি নয়।

শঙ্কর আর কিছু বলে না। কিন্তু আমি ওর কথাটাই ভাবতে থাকি। স্ত্রাসবুর্গে আমার বাড়ি নয়। কিন্তু সেখানে যে গাব্রিয়েল থাকে। থাকে সের্জ, এলেন, জানিন, সারদা আরও অনেকে। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও তারা আমার আত্মীয়, পরমাত্মীয়। মাত্র সাতদিন আগে সজল চোখে যাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি, মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে তাদের কাছে ফিরে যাওয়া যায়।

কিন্তু না। আমি যে পথিক। সকল কালের সকল দেশের পথিক। শ্রান্তি ক্লান্তিহীন পথিক। মায়া মমতাহীন পথিক।

আমি তাই চলেছি এগিয়ে। চলেছি কৃষ্ণারণ্যের পথে। একদিন এ চলাও শেষ হয়ে যাবে। তখন আবার আজকের এই সঙ্গীদের কাছ থেকেও নিতে হবে বিদায়। আমি এক সঙ্গীহীন পথিক।

আমার নীরবতা বোধকরি গৌরকে বিচলিত করে তুলেছে। তাই

সে অন্যকথা বলে আমাকে অন্যমনস্ক করে তুলতে চায়। বলে—আমরা এখন সোজা দক্ষিণে যাচ্ছি, চলেছি কার্লশ্রুহে শহরের দিকে। সেখানে গিয়ে আবার অটোবানের সঙ্গে দেখা হবে।

দেখা হলেও আমরা বেশিক্ষণ অটোবান দিয়ে পথ চলব না। কার্লশ্রুহে হল হ্যানোবার, মুনসেন ও বাজেল অটোবানের মিলনস্থল। সেখানে বাজেল অটোবান ধরে কেবল কয়েক মিনিট দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হব, তারপরেই বাডেন-বাডেন মানে ব্ল্যাক-ফরেস্টের পথ ধরব।

বাডেন-বাডেন! আবার গাব্রিয়েলের কথা মনে পড়ে। বাডেন বাডেন গাব্রিয়েলের জন্মস্থান। ভালই হল গাব্রিয়েলের সঙ্গে দেখা না হলেও আজ তার জন্মস্থান দেখা হবে।

গৌর আবার ম্যাপ দেখে। বলে—এটি দশ নম্বর জাতীয় সড়ক। আমরা এখন পুলে উঠছি।

—পুল ?

—হ্যাঁ। রাইনের পুল। গৌর উত্তর দেয়।

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। আজ আবার দেখা হল রাইনের সঙ্গে। এ যাত্রায় তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছে স্ত্রাসবুর্গে। রাইন সেখানে ফ্রান্স ও জর্মনীর সীমারেখা। এক তীরে স্ত্রাসবুর্গ আরেক তীরে কেল্। গাব্রিয়েলের কাছ থেকে বিদায় নেবার পরে আমি রেলে চড়ে রাইনের পুল পেরিয়ে ফ্রান্স থেকে জর্মনীতে প্রবেশ করেছি। কিন্তু সে পুল, এ পুল নয়। এখানে রাইনের দু-তীরেই জর্মনী।

জর্মনীতে এসে আমার রাইনের সঙ্গে দেখা হয়েছে বন্ এবং কোব্‌লেঞ্জ শহরে। রাইন ও মোজেলের সঙ্গমে আমরা নৌবিহার করেছি। আজ আবার রাইনের সঙ্গে দেখা হল এখানে। তাকে যত দেখছি, ততই ভাল লাগছে। রাইন যে য়ুরোপের গঙ্গা। গঙ্গার মতই তাকে ভালোবেসে ফেলেছি আমি।

বেলা এগারোটার সময় আমরা কার্লশ্রুহে শহরে প্রবেশ করলাম।

কিন্তু শঙ্কর গাড়ি থামালো না। গতিবেগ কমিয়ে শহরের পথ দিয়ে এগিয়ে চলল।

—এখানে কি আমরা এক কাপ কাফি পেতে পারি? জয়া জিজ্ঞেস করে।

—জয়া কিন্তু একটা ভাল প্রশ্ন করেছে শঙ্কর! গৌর জয়াকে সমর্থন করে।

—কিন্তু গৌরদা আমরা তো আধঘন্টার মধ্যেই বাডেন-বাডেন পৌঁছে যাবো। এখানে এখন গাড়ি থামলে অযথা দেরি হয়ে যাবে।

—তাহলে থাক। জয়া বলে।

—তার চেয়ে বরং গৌরদা কার্লশ্রুহের কথা বলুন। শঙ্কুদার ভাল লাগবে।

—তাই ভাল। গৌর শুরু করে—কার্লশ্রুহে বর্তমান পশ্চিম-জর্মনীর একটি বড় শহর। পৌনে তিন লক্ষ মানুষের বাস। জনসংখ্যার বিচারে এর স্থান তেইশ। এটি রেল ও মোটরপথের একটি আন্তরাষ্ট্রীয় জংশন। নৌবাণিজ্যেরও একটি প্রধান ঘাটি। তাহলেও তুমি দেখতে পাচ্ছ মূল-শহরটি রাইনের তীরে নয়, রাইন থেকে কয়েক কিলোমিটার পুবে অবস্থিত।

আমি মাথা নাড়ি। গৌর বলতে থাকে—কেবল যাতায়াত ও আমদানী-রপ্তানী নয়, এখানে প্রচুর কল-কারখানা রয়েছে। তার মধ্যে কয়েক ডজন বিয়ারের কারখানা। মদ চোলাইয়ের জন্য কার্ল-শ্রুহের বেশ নাম আছে। কিন্তু কার্লশ্রুহে পুরনো শহর নয়। বয়সে কলকাতার থেকেও ছোট। এখন দু'শ' সত্তর বছর চলেছে।

একবার থামে গৌর। তারপরে পথের পাশের বাড়িগুলোর দিকে ইসারা করে বলে—অধিকাংশ জর্মন শহরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের অট্টালিকা রোমান গথিক স্থাপত্যে নির্মিত। কিন্তু এখানে দেখো অধিকাংশ পুরনো বাড়ি 'নিও-ক্লাসিক' অর্থাৎ গ্রীক স্থাপত্য কলায় তৈরি করা হয়েছে।

বিষয়টি সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং বৃথাই বাড়িগুলোর

দিকে তাকাই। কিছুই বুঝতে পারি না। চুপ করে থাকি।

গৌর বলে চলে—বিগত বিশ্বযুদ্ধে বোমা পড়ে এ শহরের খুবই ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু সেসব এখন অতীতের দুঃস্বপ্ন মাত্র। যুদ্ধের পরে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সমস্ত ভাঙ্গা বাড়িগুলো আবার আগের মতো করে তৈরি করা হয়েছে। নির্মিত হয়েছে অনেক আধুনিক বহুতল বাড়ি ও কলকারখানা। আর এইসব সুন্দর সুন্দর সবুজ পার্ক ও ছায়াসুনিবিড় প্রশস্ত পথ।

—এ শহরটা কি শুধু মদশিল্প এবং অবস্থানের জন্যই এত উন্নত? জিজ্ঞেস করি।

গৌর উত্তর দেয়—না। আরও একটা কারণ রয়েছে। ১৯৫১ সালে এখানেই ফেডারেল সরকার সুপ্রিম কন্‌স্টিটিউশন্যাল কোর্ট স্থাপন করেছেন।...

হঠাৎ আমার নজর পড়ে পথের পাশে। একটা বাজার। বাজারের সামনে পার্ক, বেশ বড়। সেখানে একটা পিরামিড! মিশরের পিরামিডের অনুকরণে পাথরের পিরামিড। আমি তাকিয়ে থাকি।

শঙ্কর গাড়ি থামিয়ে দেয়। বলে—প্রথমে এই পিরামিডটি কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল, পরে পাথর দিয়ে নির্মিত হয়েছে। পিরা-মিডের তলায় রয়েছে এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল ভিল্‌হাইম্‌-য়ের (Karl Wilheim) সমাধি। আর পিরামিডের পাশে দেখুন, নিও-ক্লাসিক স্থাপত্যে নির্মিত টাউন হল এবং প্রোটেস্টান্ট চার্চ।

আমরা দেখি। শঙ্কর গাড়ি ছাড়ে।

গৌর বলে—এই শহরে আরও দুটি দর্শনীয় স্থান রয়েছে। শোয়ার্জ ভাল্ডহালে (Schwarzwaldhalle) মানেব্ল্যাক-ফরেস্ট হল এবং স্টাড্‌টগার্টেন (Stadt garten) সিটি পার্ক। হলটি প্রকাণ্ড এবং বিলাসবহুল। সেখানে নিয়মিত কনসার্টের আসর বসে এবং বাৎসরিক বল নাচ অনুষ্ঠিত হয়। আর পার্কটি যেমন বিশাল তেমনি মনোরম। এই পার্কের ভেতরেই রয়েছে চিড়িয়াখানা ও বটানিক্যাল গার্ডেন্‌স। সেখানকার গোলাপ বাগানটি দেখবার মতো।

—আমরা দেখতে পাবো না? জয়া জিজ্ঞেস করে।

শঙ্কর সবিনয়ে উত্তর দেয়—না গো! তাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তোমাকে আমি আজ আরও সুন্দর গোলাপ কানন দেখাবো।

—কোথায়?

—বাডেন-বাডেনে।

গৌর আরার শুরু করে—এই কার্লশ্রুহে শহবে যেসব বিখ্যাত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন কিম্বা দীর্ঘকাল বসবাস করেছেন, তাঁদের মধ্যে সুলেখক য়োহান্ পেটের (Johann Peter) এবং কবি ও উপন্যাসিক য়োজেফ ভিক্টর ফন্ শ্যেফেল (Joseph Victor Von Scheffel) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

—এবারে তুমি সংক্ষেপে এই শহর পত্তনের ইতিহাস বলো। গৌরকে অনুরোধ করি।

গৌর শুরু করে—১৬৮৯ সালে ফরাসী আক্রমণের পরে এই অঞ্চলের জনপদগুলি প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা শহর ছেড়ে বনজঙ্গলে আশ্রয় নেয়। গৃহহীন হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

এইভাবে পঁচিশ বছর কেটে যায়। তারপরে ১৭১৫ সালে স্থানীয় শাসক কার্ল ভিলহাইম্ তাঁর মৃগয়াভূমিতে একটি নতুন জনপদের পত্তন করলেন। তিনি প্রথমে একটি অষ্টকোণ দুর্গ (Octagonal Tower) নির্মাণ করেন। সেই দুর্গ থেকে চারিদিকে বত্রিশটি পথ প্রসারিত হয়। ন'টি পথ নতুন জনপদের চারিদিকে বিস্তৃত হল আর বাকি তেইশটি বনভূমির ভেতর দিয়ে দেশের চারিদিকে চলে গেল।

কার্ল নতুন জনপদের নাম রাখলেন, 'Carols Ruhe' বা "Charle's Rest" মানে কার্লের বিশ্রামনিবাস।

বাড়ি-ঘর তৈরি করার পরে কার্ল বনবাসীদের জনপদে এসে বসবাস করার আমন্ত্রণ জানালেন। বলা বাহুল্য গৃহহীন মানুষগুলি সানন্দে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। নতুন নগরী অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ধনে-জনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

১৭৩৮ সালে কার্ল দেহরক্ষা করলেন। তখন কার্লশ্রুহে এ অঞ্চলের সবচেয়ে সুন্দর শহর। এবং প্রতিষ্ঠাতার পরলোক গমনের পরেও নতুন নগরীর বিস্তার বন্ধ হল না।

গৌর থামলে শঙ্কর যোগ করে—কার্লশ্রুহে এখন কেবল সমৃদ্ধ শিল্পনগরী নয়। সেইসঙ্গে জর্মনীর একটি শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও বটে।

প্রতি তিনবছর অন্তর এখান থেকেই দেওয়া হয় বিখ্যাত হেরমান হ্যেসে (Hermann Hesse) সাহিত্য পুরস্কার। পুরস্কারের মূল্য দশ হাজার মার্ক। ১৯৫৬ সাল থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

কার্লশ্রুহে রয়ে গেল পেছনে, আমরা এগিয়ে এলাম সামনে। শহরের পথ থেকে উঠে এলাম অটোবানে। অটোবান কখনো শহরে প্রবেশ করে না, শহরের বাইরে থাকে। আমাদের ইস্টার্ন বাইপাসের মতো অটোবানের পাশে কোন বস্তি গড়ে উঠতে দেওয়া হয় না। কারণ বসতি গড়ে উঠলেই মানুষ রাস্তা পারাপার করতে চাইবে। আর তাহলেই দুর্ঘটনা ঘটবে। অটোবানের ওপর দিয়ে কখনও মানুষ যাতায়াত করে না। যেখানে পারাপারের একান্ত প্রয়োজন. সেখানে টানেল বা সুড়ঙ্গ রয়েছে।

শঙ্কর ঠিকই বলেছিল। আমরা সত্যই অটোবান দিয়ে বেশিক্ষণ পথ চললাম না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নেমে এলাম জাতীয় সড়কে। গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে শঙ্কর বলে—ঐ অটোবান দিয়ে মাত্র ১৮০ কিলোমিটার এগিয়ে গেলেই সুইজারল্যাণ্ডের বাজেল।

—রিয়েলী! জয়া জিজ্ঞেস করে।

—ও ইয়েস। শঙ্কর মাথা নাড়ে।

—তার মানে মাত্র ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আমরা সুইজারল্যাণ্ড চলে যেতে পারতাম।

শঙ্কর আবার মাথা নাড়ে।

আমি ভাবি অন্যকথা। দু-বছর আগে সুইজারল্যাণ্ড থেকেই

* লেখকের 'জয়ন্তী জুরিখ' বইখানি দ্রষ্টব্য।

শুরু হয়েছিল আমার য়ুরোপ ভ্রমণ। *এবারে ভিসা নিয়ে এসেও সময়াভাবের জন্য যাওয়া হল না সে-দেশে। অথচ আজ আমি তার কত কাছে এসে পড়েছি। মাত্র দেড় ঘণ্টার পথ।

তাহলেও দুঃখ করার কিছু নেই। যা পেলাম না, তার জন্য দুঃখ না করে, যা পেয়েছি তা নিয়েই আনন্দে থাকলেই জীবনদেবতা খুশি হন। তাঁর করুণায় যে জীবনে আমি অনেক পেয়েছি। পেয়েছি অসংখ্য মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা। আর তা পেয়েই চলেছি। আজ আমার সুইজারল্যাণ্ডে যাওয়া হল না কিন্তু আমি যে ব্ল্যাক-ফরেস্ট চলেছি।

—ব্ল্যাক-ফরেস্ট আরম্ভ হয়ে গেল। শঙ্কর সহসা বলে ওঠে।

সুইজারল্যাণ্ডের ভাবনা যায় হারিয়ে। তাড়াতাড়ি বাইরে তাকাই। ঘন বনের ভেতর দিয়ে গাড়ি চলেছে। কোথাও পাহাড়ের গা বেয়ে, কোথাও বা সমতল উপত্যকার ওপর দিয়ে। চড়াই-উৎরাই মসৃণ পথ। খুব চওড়া নয়, পাশাপাশি খানতিনেক ছোট গাড়ি যেতে পারে। পথের দু-পাশেই বড় বড় গাছ। অধিকাংশই ওক্ এবং বীচ্ (Beech)। শুনেছি কৃষ্ণারণ্যের নিচু অঞ্চলে এই গাছ। কিন্তু চার হাজার ফুট থেকে শুধুই ফার (Fir) অর্থাৎ দেবদারু জাতীয় মোচাকার বৃক্ষরাজি, পাতাগুলো কালচে সবুজ। কালো ভাবটা খুবই স্পষ্ট। আর তাই নাকি জর্মনীর এই বনাঞ্চলের নাম ব্ল্যাক-ফরেস্ট।

॥ দশ ॥

গৌর বলতে শুরু করে—ব্ল্যাক ফরেস্ট বা কৃষ্ণারণ্যের জর্মন নাম শোয়ার্জভাল্ড (Schwarzwald)। এটি দক্ষিণ-পশ্চিম জর্মনীর বাডেন-ভ্যুরটেনবের্গ (Baden-Wurttenberg) প্রদেশের বনময় উচ্চভূমি। আয়তন ২৩২০ বর্গমাইল। লম্বায় শ'খানেক মাইল আর চওড়ায় দশ থেকে ত্রিশ মাইল।

ব্ল্যাক ফরেস্ট প্রধানত গ্রানাইট উচ্চভূমি। তার কোথাও কোথাও উঁচু পর্বতচূড়া। বনময় অঞ্চলের উত্তরাংশ জুড়ে চুনাপাথর। কৃষ্ণারণ্যের উচ্চ-বনভূমি অকস্মাৎ নিম্নগামী হয়ে রাইন উপত্যকায় মিশে গিয়েছে। আর সেখানেই অর্থাৎ সেই দক্ষিণসীমা জুড়েও সংকীর্ণ একফালি চুনাপাথর অধ্যুষিত উর্বরভূমি।

কিনজিশ (Kinzig) উপত্যকা কৃষ্ণারণ্যকে দুটি অংশে বিভক্ত করেছে। এই উপত্যকার উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি পাহাড়। সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টি ৪৯০৫ ফুট, নাম ফেল্ডবের্গ (Feldberg)। অন্য দুটির নাম হের্সোগেনহর্ন (Herzogenhorn) ও ব্লোসলিং (Blossling)। উচ্চতা যথাক্রমে ৪৬৪২ ও ৪২৯৫ ফুট।

কৃষ্ণারণ্যের উত্তরাংশ অর্থাৎ আমরা এখন যে অংশে রয়েছি, এর গড় উচ্চতা দু' হাজার ফুট। এই অংশের উপত্যকাগুলি বেশ গরম। এখানে ভাল ফসল উৎপন্ন হয়। উচ্চতর অংশের জলবায়ু কিন্তু বেশি স্বাস্থ্যকর। তবে সেখানে সামান্যই ফসল হয়।

কাঠ কৃষ্ণারণ্যের প্রধান সম্পদ। রাইন এবং অন্যান্য নদীতে ভাসিয়ে এই কাঠ নিচে নিয়ে যাওয়া হয়। তাছাড়া মোটরপথ তো দেখতেই পাচ্ছ, কেমন চমৎকার।...

আমি মাথা নাড়ি। গৌর বলতে থাকে—ঘড়ি, খেলনা ও বাদ্য যন্ত্র নির্মাণের জন্য ব্ল্যাক-ফরেস্ট খুবই বিখ্যাত। বিশেষ করে ঘড়ি। ব্ল্যাক ফরেস্ট ক্লক 'কাক্কু' ও 'ফোর্‌হাণ্ড্রেড ডে টাইমপিস' জগদ্বিখ্যাত।

এই অরণ্যাঞ্চলে অনেকগুলি উষ্ণপ্রস্রবণ রয়েছে। প্রস্রবণগুলির জল স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভাল। তাই সেগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে স্বাস্থ্যনিবাস। বাডেন-বাডেন ও ভাইল্ডবাড (Wildbad) এগুলির অন্যতম। বাডেন-বাডেন য়ুরোপের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ বিলাস-বহুল স্বাস্থ্যাবাস। অন্যান্য স্বাস্থ্যকর স্থানগুলি হল ফ্রাইবুর্গ (Freiberg), ব্রেইস্‌গাউ (Breisgau), ওফেনবের্গ (Offenburg) রাস্টাট্ (Rastatt) এবং লাহ্‌র (Lahr) ইত্যাদি।

উচ্চতা যা-ই হোক কৃষ্ণারণ্যের পাহাড়গুলিতে শীতকালে খুবই

বরফ পড়ে। পাহাড়গুলির ঢাল স্কী করার বড়ই উপযোগী। তাই শীতকালেও কৃষ্ণারণ্যে প্রচুর উৎসাহী পর্যটকদের আগমন ঘটে।

এবারে নদীর কথায় আসছি। এ অঞ্চলের প্রধান নদী রাইন। পশ্চিম প্রবাহিনী রাইন জর্মনী ও সুইজারল্যাণ্ডের সীমারেখা স্থির করে দিয়ে বাজেল-এর কাছে এসে হঠাৎ ডাইনে বাঁক নিয়ে উত্তর প্রবাহিনী হয়েছে। সেখান থেকেই রাইনের নতুন ভূমিকা, সে জর্মনী ও ফ্রান্সের সীমান্ত রেখা আর সেই সঙ্গে কৃষ্ণারণ্যের প্রাণধারা।

য়ুরোপের প্রধান নদী তিনটি, ভোল্‌গা, রাইন ও দানিউব। ভোল্‌গার সঙ্গে কৃষ্ণারণ্যের কোন সম্পর্ক নেই। রাইনের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাও আমরা জানি। অতএব দানিউবের কথায় আসছি। দানিউবের সঙ্গে এই অরণ্যের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। কারণ কৃষ্ণারণ্যই দানিউবের জন্মভূমি। কৃষ্ণারণ্যের আপন স্রোতস্বিনী ব্রেগ্ (Breg ও ব্রিগাখ্ (Brigach) এই অরণ্যভূমির পূর্বদিকে ডোনাউএশিংগেন (Donaueschingen) নামে একটি জায়গায় মিলিত হয়েছে। তাদের মিলিত ধারাই দানিয়ুব। আর তার সেই জন্মভূমির উচ্চতা ২১৮৭ ফুট।

দানিউবের জর্মন নাম ডোনাউ (Donau), চেকোশ্লোভাকীয় নাম 'ডুনা', বুলগেরীয় নাম 'ডুনাজ', রুমানীয় নাম 'ডুনরিয়া' আর রাশিয়ান নাম 'ডুনায়'। দানিউব মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব য়ুরোপের প্রধান নদী। জর্মনীর ব্ল্যাক-ফরেস্ট থেকে উৎপন্ন হয়ে সে রাশিয়ার ভেতর দিয়ে 'ব্ল্যাক-সী' তথা কৃষ্ণসাগরে পতিত হয়েছে। অর্থাৎ 'ব্ল্যাক' বা কালোর সঙ্গে দানিউবের জনম-মরণের সম্পর্ক।

দৈর্ঘ্যে দানিউব য়ুরোপের দ্বিতীয় নদী। এটি ১৭৭৬ মাইল দীর্ঘ। ভোল্‌গা এর চেয়ে দীর্ঘতর। কিন্তু দানিউব ভোলগার চেয়ে বেশি জল পরিবহণ করে। ৩, ১৫, ৪৪৪ বর্গমাইল এলাকাকে দানিউব জলসিক্ত করেছে। প্রায় তিন শ' উপনদী এই মহানদীকে সমৃদ্ধ করছে।

কৃষ্ণারণ্য থেকে দানিউব দক্ষিণ-পূর্ব প্রবাহিনী হয়ে বোহেমিয়ান অরণ্যে (ফরেস্ট) প্রবেশ করেছে। তারপরে চেকোশ্লোভাকিয়া ও

অস্ট্রিয়ার সীমা নির্ধারণ করে হাঙ্গেরীতে গিয়েছে। হাঙ্গেরী থেকে উত্তর প্রবাহিনী হয়ে যুগোস্লাভিয়া এবং রুমানিয়ার সীমা স্থির করে বুলগেরিয়ায় পৌঁছেছে। তারপরে দক্ষিণ বাহিনী হয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় উপস্থিত হয়েছে। অবশেষে পূর্বপ্রবাহিনী হয়ে কৃষ্ণসাগরে মিশে গিয়েছে।

দানিউব ছাড়াও কৃষ্ণারণ্য আরও একটি উল্লেখযোগ্য নদীর জন্ম-স্থান। তার নাম নেকার (Neckar)। প্রাদেশিক রাজধানী স্টুটগার্ট এই নদীর তীরে অবস্থিত।

এই অরণ্যাঞ্চলের শোয়েনিংগেন (Schwenningen) নামে একটা জায়গায় উৎপন্ন হয়ে সে রাইনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এব দৈর্ঘ্য ২৩০ মাইলের মতো। সে হাইডেলবার্গ-অঞ্চলকে জলসিক্ত করেছে। এই নদী থেকে খাল কেটে স্টুটগার্টের সঙ্গে উল্ম নদীকে (ulm) যুক্ত করা হয়েছে। সেই খালে এক হাজার টনের জলযান যাতায়াত করতে পারে।

একবার থামে গৌর। তারপরে আবার বলতে থাকে—তুমি জানো শঙ্কুদা, অরণ্যঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। তাই য়ুরোপে শস্য-ক্ষেতের মাঝে কিছু বড়-বড় গাছ লাগানো হয়। অরণ্য ধ্বংস করে ফেলার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বৃষ্টিপাত কমে যাচ্ছে। জর্মনরা এ ব্যাপারে খুবই সচেতন। তাই তাঁরা কৃষ্ণারণ্যকে সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন। আর তারই ফলে এই অঞ্চলের বৃষ্টির জল য়ুরোপের মূল ভূখণ্ডকে সুজলা ও সুফলা করে রেখেছে।

কৃষ্ণারণ্যের উত্তরাংশের শতকরা ষাট ভাগে এখনও গভীর বন। তবে দক্ষিণাংশের বেশির ভাগ জায়গা জুড়েই এখন কৃষিক্ষেত্র। তাহলেও সারা ব্ল্যাক-ফরেস্ট অঞ্চলেই বেশ বৃষ্টি হয়। ওপরের দিকে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮০ ইঞ্চি। ফলে বসন্তকালে ব্ল্যাক-ফরেস্ট খুবই মনোরম। তাছাড়া এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বড় বড় হ্রদ রয়েছে।

ব্ল্যাক ফরেস্ট অঞ্চলের পাহাড়গুলি কিন্তু কোন সংযুক্ত পর্বতমালা

নয়। তারা বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত এবং আল্পস পর্বতশ্রেণীর অন্তর্গত নয়।

কৃষ্ণারণ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রধানত বনসম্পদ অর্থাৎ কাঠের ওপরে নির্ভরশীল। কাঠ ও কাঠের জিনিসের পরে যেসব শিল্প এই অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে, তা হল যান্ত্রিক খেলনা, ঘড়ি, বাদ্য যন্ত্র, মোটর ও পর্যটনশিল্প প্রভৃতি। এই প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই ভাল। বাস্তবিক পক্ষে এটি ফেডারেল সরকারের সমৃদ্ধতম বাণিজ্যিক প্রদেশ। ব্ল্যাক-ফরেস্ট অঞ্চলের প্রধান শিল্প-নগরীগুলি হল মান্‌হাইম (Mannheim), কার্লস্রুহে, পফোর্সহাইম (Pforzheim), হাইলব্রোণ (Heilbron), স্টুটগার্ট ও উল্ম।

এই প্রদেশের দুটি উৎপাদন বিশ্ববিখ্যাত মার্সেডিজ (Daimler Benz) গাড়ি আর ব্ল্যাক-ফরেস্ট ঘড়ি, কাক্কু ক্লক ও ফোর হাণ্ডেড ডে টাইম্‌পিস। শুনলে অবাক হবে চাষীরা এই ঘড়ির আবিষ্কর্তা। অত্যধিক শীত ও তুষারপাতের জন্য তখন শীতকালে চাষীদের ঘরে বসে থাকতে হত। তাঁরা হাতুড়ি আর বাটালি দিয়ে নানা রকম কাঠের জিনিস তৈরি করতেন। এইভাবেই ১৬৫১ সালে কাঠের ক্লক তৈরি হল। বসন্তকালে তাঁরা সেই ঘড়ি পিঠে বেঁধে ফেরী করে বিক্রি করতেন। এইভাবে চলল সোয়া দু'শ বছর। কাঠের ঘড়িতে ততদিনে ধাতবীয় কলকব্জা যুক্ত হয়েছে। ১৮৮০ সালে ঘড়িতে কোকিলের কণ্ঠস্বর সংযোজিত করার পরে ঘড়ির নাম হল কাক্কুক্লক।

ফোর হাণ্ডেড ডে টাইমপিস তৈরি হয়েছে আরও দশ বছর পরে ১৮৯০ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত দুটি ঘড়িই সারা বিশ্বে জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু তারপরে আধুনিক রচনাশৈলীর অভাবে এই শিল্পে মন্দা দেখা দেয়। ১৯৪৫ সাল থেকে নির্মাতারা সেই অপবাদ দূর করতে সমর্থ হয়েছেন। এখন ট্রিবের্গ-এর (Triberg) আধুনিক কারখানায় এই ঘড়ি তৈরি হয়। কিন্তু আজও চাষীরা কাঠের ওপর খোদাই করে কাক্কু ক্লকের আধারটি তৈরি করছেন।

কৃষ্ণারণ্যের কৃষকরা ঘড়ি তৈরি ছাড়াও গো-পালনের যে উন্নত

পদ্ধতির প্রচলন করেছেন, তা আজ সারা দেশে সমাদৃত। খাদ্যশস্য ফল, শাক-সবজি, তামাক ও প্রচুর মদ এ অঞ্চলে উৎপন্ন হয়।

ব্ল্যাক-ফরেস্টের উচ্চভূমিতে কেবল কিছু যব জাতীয় খাদ্যশস্য ও উচ্চ-পার্বত্য অঞ্চলের শাক-সবজি ও ফল-মূল উৎপন্ন হয়। কিন্তু নিম্নাঞ্চলে বিশেষ করে উপত্যকাগুলিতে প্রচুর ফসল হয়।

পশ্চিম-জর্মনীর এই বাডেন-ভ্যুরটেনবের্গ প্রদেশটি ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডের উপকণ্ঠে অবস্থিত। আগেই বলেছি রাইন নদী এখানে ঐ দুটি দেশের সঙ্গে জর্মনীর সীমা নির্ধারণ করেছে। এই প্রদেশের অধিবাসীদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অসাধারণ। বিগত বিশ্ব-যুদ্ধের পরে এই প্রদেশকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু জনগণ সেই বিভাজনের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তোলেন। বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ ১৯৫১ সালে এক গণভোটের ব্যবস্থা করেন। বিচ্ছিন্নতা-বাদের সকল প্ররোচনা উপেক্ষা করে জনগণ মিলনের পক্ষে নিজেদের নিষ্ঠা প্রকাশ করেন। ফলে আবার এটি এক রাজ্যে রূপান্তরিত হয়।

আমরা যদি এই মানসিকতার অধিকারী হতে পারতাম, তাহলে ভারতবর্ষ আজ সত্যই জগৎসভায় প্রথম সারিতে বসতে পারত।...

কিন্তু থাকগে, এখন আর এসব কথা নয়। আমরা বাডেনবাডেন পৌঁছে গিয়েছি। এবারে তাকিয়ে দেখো, শহরটা কি আশ্চর্য সুন্দর।

আমি দেখি, গৌর ঠিকই বলেছে। পথের দু-পাশেই বাড়ি। না বাড়ি নয়, বাগানবাড়ি। কোথাও বা দোকান-পাট। কিন্তু দোকান কিম্বা বাগান নয়, বাড়িগুলিই দেখবার মতো, রীতিমত তাকিয়ে থাকবার মতো। সবই বাংলো টাইপের। পাথর কিম্বা টালির চাল—চৌচালা। কাঠের দেওয়াল, ভারী সুন্দর রঙ করা। কাঁচের দরজা-জানলা। বাড়িগুলো দোতলা। নিচের তলায় সামনে খোলা বারান্দা, দোতলায় ঝুলনো ব্যালকনী।

প্রতি বাড়িতেই বাগান, সামনে ফুল পেছনে ফল। নানা রকমের ফুল, তবে গোলাপের সংখ্যাই বেশি। কোন বাড়ির সামনে ঝরণা বয়ে যাচ্ছে কোন বাড়ির পেছনে সবুজ ক্ষেত আর দূরে ধূসর পাহাড়।

মনে হচ্ছে আমার সামনে একের পরে এক রঙীন ছবি সরে সরে যাচ্ছে আর আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো রয়েছি তাকিয়ে।

জুরিখ, লণ্ডন, পারি, বার্লিন, রোম, এথেন্স প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন বৃহৎ, আধুনিক ও প্রাচীন নগরীর পথে পথে পদচারণা করেছি। প্রাচীনতম প্রাসাদ থেকে আধুনিকতম আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকা দেখে এসেছি। কিন্তু এমন কাব্যময় পরিবেশে ছন্দময় বাড়ি-ঘর খুব কমই দেখেছি।

শঙ্কর বলে—আগে গাড়ি পার্ক করে নেওয়া যাক, তারপরে ক্যাজিনো (Casino) দিয়ে শুরু করা যাবে।

গৌর হাসতে হাসতে বলে—ওভাবে ব'লো না, শঙ্কুদা হয়তো ভাববে আমরা জুয়াখেলার জন্য ওকে নিয়ে এসেছি এখানে।

আমি কিন্তু কিছুই ভাবি নি। কারণ ক্যাজিনো সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নেই। তবু শঙ্কর ভরসা দেয়—আপনি ভয় পাবেন না, আমরা ক্যাজিনোর বাড়িটা দেখব, জুয়া খেলব না। কারণ সেটা কোটিপতিদের বিলাসকুঞ্জ।

জয়া জানায়—বাডেন-বাডেন হচ্ছে জর্মনীর একটি সর্বশ্রেষ্ঠ 'কুরোট' (Qurot) মানে Cure village. সেই সুদূর অতীতেও দূরদূরান্তর থেকে মানুষ এখানে রোগমুক্ত হতে আসতেন।

আমাদের গাড়ি পথের পাশে একটা টানেলের ভেতর প্রবেশ করে। আলো ঝলমল সুড়ঙ্গ পার হয়ে আমরা গেটের সামনে আসি। পথ বন্ধ। যেমন মোটা পাইপ দিয়ে রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং বন্ধ করা হয়, তেমনি একটা পাইপ আমাদের সামনে। আর পাশে স্বয়ংক্রিয় ওজন যন্ত্রের মতো একটি যন্ত্র। শঙ্কর জানলা খুলে হাত বাড়িয়ে সেই যন্ত্রের একটা বোতাম টিপে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে টং করে একটা শব্দ হয় আর যন্ত্রের গায়ে একটা ফুটো দিয়ে একটুকরো কাগজ বেরিয়ে আসে। শঙ্কর সেই কাগজটা ছিড়ে নিতেই গেট খুলে যায়। আমরা পাতালপুরীতে প্রবেশ করি। না, পাতালপুরী নয়, বেস্‌মেণ্ট গ্যারেজ, আলো ঝলমল কার-পার্ক। দু-পাশে সারি সারি গাড়ি। তারই

মাঝে প্যাসেজ। আমাদের গাড়ি সেই প্যাসেজ ধরে এগিয়ে চলে।

জিজ্ঞেস করি—সর্বত্রই তো গাড়ি। জায়গা খালি আছে কি?

—নিশ্চয়ই। নইলে দরজাই খুলত না।

—কিন্তু তুমি যে কাগজটুকু ছিড়ে নিলে সেটা কি?

—টিকেট। এর মধ্যে কখন আমরা এখানে এলাম, সে সময়টা লেখা থাকল। যখন গাড়ি ফেরৎ নিতে আসব, তখন এর সাহায্যে পার্কিং ফি দিতে হবে।

—কিন্তু তুমি তো বললে জায়গা আছে! কোথায় জায়গা? তা ছাড়া এতবড় গ্যারাজে জায়গা খুঁজবেই বা কেমন করে?

—আমাদের খুঁজতে হবে না। ঐ দেখুন, ডানদিকে সিলিঙের গায়ে একটা আলোর তীর আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। ওর সঙ্গে এগিয়ে গেলেই একসময় আপনি জায়গা পেয়ে যাবেন।

এতক্ষণ খেয়াল করি নি, এবারে দেখতে পাই। আলোর তীরটা আমাদের ঠিক আগে আগে চলেছে। কখনো সোজা, কখনো বাঁয়ে, কখনও বা ডাইনে। ভারী মজা লাগছে দেখতে।

শুধু আমি নই, শ্রীমান অমৃতও মজা পেয়েছে। সে শিশু, তার মজা লাগতেই পারে। কিন্তু আমি যে এই বুড়ো বয়সেও এঁদের কাণ্ড-কারখানা দেখে শিশুর মতো আচরণ করছি। কি করব? আমি যে বরিশালের বাঙাল।

কিন্তু আর বেশিক্ষণ মজা পাওয়া গেল না। সহসা আলোর তীরটা দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখি সেখানে একটা জায়গা খালি পড়ে রয়েছে।

শঙ্কর বলে—ঐ দেখুন জায়গাটার ওপরে একটা নম্বর লেখা রয়েছে আমাদের টিকিটের মধ্যেও এই নম্বরটাই দেওয়া আছে!

—নইলে পরে গাড়ি খুঁজে পাবো কেমন করে? জয়া যোগ করে।

সত্যই চমৎকার ব্যবস্থা। এবং সবটাই যন্ত্রের সাহায্যে।

গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে আমরা পাতাল থেকে উঠে আসি। সহাস্যে জিজ্ঞেস করি—তোমাদের এই বাডেন-বাডেন শহরের অর্ধেকটা

জুড়েই বুঝি এই পাতাল গ্যারেজ ?

—না, না, তা নয়। তবে এ কার-পার্কটা সত্যিই খুব বড়। বড় না হয়ে যে উপায় নেই! এই জুন-জুলাই মাসের কথা বাদ দিন। সারা বছর, এমনকি শীতকালেও এখানে প্রতিদিন অসংখ্য গাড়ি আসে। সেসব গাড়িকে যদি পথের পাশে পার্ক করা যায়, তাহলে আর পথে গাড়ি চলতে পারবে না।

আজ জয়া সালোয়ার কামিজ পরে নিয়েছে। আগেই বলেছি জয়া একটি ছোট-খাটো সুশ্রী শ্যামলা মিষ্টি মেয়ে। আজ ওকে একেবারে কিশোরী বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে না অমৃত ওর ছেলে।

আমরা একটা প্রাসাদোপম অট্টালিকার সামনে আসি। বাড়িটার গায়ে লেখা—Kurhaus (কুরহাউস), Baden Baden.

পথের পাশে গাছের সারি। বাড়ির সামনে সবুজ 'লন'। সেখানেও বেশ কয়েকটি বড় বড় গাছ। তবে ফুলই বেশি। অনেকটা জায়গা জুড়ে ফুলবাগান। নানা রঙের জানা-অজানা অসংখ্য ফুল।

বাড়ির ভেতরে যাবার দুটি তোরণ, পথের ওপরে, দুই প্রান্তে। একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি কাকড় বিছানো পথ বাড়িটার সিঁড়ি ছুঁয়ে এদিকের তোরণ থেকে ওদিকের তোরণ পর্যন্ত প্রসারিত। পথটি সবুজ 'লন' আর রঙীন বাগানের সীমারেখা।

আমরা বাগান দেখতে দেখতে কাকড় বিছানো পথ দিয়ে বাড়িটার সামনে আসি। আটটি গোল স্তম্ভযুক্ত খোলা বারান্দা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি সেখানে।

এটাই মূল অট্টালিকা, প্রাসাদোপম। এর ডাইনে ও বাঁয়ে আরও দুটো বাড়ি। ডানদিকের বাড়িটায় কিছু দোকানপাট ও রেস্তরাঁ। সামনে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। সেখানে একটি মুক্ত মঞ্চ। শ'খানেক চেয়ার পাতা।

শঙ্কর বলে—এসময় ওখানে প্রতিদিন বিকেলে কোন না কোন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ব্ল্যাক-ফরেস্ট বা কৃষ্ণারণ্যের লোকগীতি ও লোকনাট্য-অর্চনাতে খুবই জনপ্রিয়।

—আর বাঁদিকের ঐ বাড়িটা কি? জিজ্ঞেস করি।

জয়া উত্তর দেয়—ওটাই ট্রিংখালে (Trinkhalle)। ওখানেই সেই উষ্ণ প্রস্রবণের জল। যে জলকে কেন্দ্র করে বাডেন-বাডেন আজ এমন সুন্দর আর এত জনপ্রিয়। আমরা ক্যাজিনো দেখে ওখানে গিয়ে বসব।

ক্যাজিনো! হ্যাঁ, আমরা যে স্তম্ভযুক্ত বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি, এখানেই লেখা—CASINO. অর্থাৎ এই বড় বাড়িটাই ক্যাজিনো।

—ক্যাজিনো কি জানেন শঙ্কুদা? শঙ্কর জিজ্ঞেস করে।

স্বাভাবিক প্রশ্ন। শঙ্কর জানে আমি বরিশালের বাঙাল। সুতরাং না জানার সম্ভাবনাই বেশি। তাই সহাস্যে বলি—জানি, জুয়ার আড্ডা।

—আহা, ওভাবে বলো না শঙ্কুদা! গৌর হাসতে হাসতে বলে —জুয়ার আড্ডা বললে মনে হবে যেন একটা নিষিদ্ধ স্থান। এটা তো দেখতেই পাচ্ছ, একেবারেই প্রকাশ্য প্রাসাদ। মানে মহাভারতের সে দ্যুতক্রীড়ার মতো ব্যাপার আর কি? ক্যাজিনো মানে রাজা-রানী ও কোটিপতিদের জুয়াখেলা যেখানে অনুষ্ঠিত হয়। এঁরা বলেন আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে যেখানে আইনসিদ্ধ ভাবে 'Roulette' এবং 'Bacarat' খেলা হয়। এগুলো সবই Licensed. এসব জায়গায় Gambling বা জুয়া সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ।

বাডেন-বাডেনের এই ক্যাজিনো জর্মনীর প্রধান ও প্রাচীনতম দ্যুতক্রীড়া ভবন। দেশ বিদেশের শ্রেষ্ঠ ধনীরা এখানে জুয়া খেলতে আসেন। জর্মনীর প্রায় সব বড় শহরেই ক্যাজিনো আছে। তারমধ্যে এটাই সবচেয়ে জনপ্রিয়। এর পরেই বাড্-ড্যুরখাইম ক্যাজিনোটির স্থান।

—আমরা তো সেটি দেখি নি? জয়া বলে ওঠে।

—হ্যাঁ। দেখা হয়ে ওঠে নি। শঙ্কর যেন জবাবদিহি করে।

দরজা পার হয়ে ভেতরে আসি। প্রকাণ্ড একটা হলঘর। একপাশে 'বার', বাকি সব জায়গাটাই ফাঁকা। চমৎকার মসৃণ মেঝে।

ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই।

—এখানে কি হয়? জিজ্ঞেস করি।

—নাচ। গৌর বলে—এটা 'বলরুম'। এখানে সাপ্তাহিক সান্ধ্য নাচের আসর বসে। আর ঐ যে দরজার ওপাশে মহলটি দেখতে পাচ্ছ, ওটাই ক্যাজিনো।

—আমরা কি ওখানে যেতে পারি?

শঙ্কর উত্তর দেয়—পারেন। তবে তার জন্য প্রবেশমূল্য দিতে হবে, জনপ্রতি পাঁচ মার্ক।

—তাহলে আর দ্যূতক্রীড়াস্থলে গিয়ে কাজ নেই। চলো ফেরা যাক।

—হ্যাঁ, চলুন।

বেরিয়ে আসি ক্যাজিনো ভবন থেকে। সেই কাকড় বিছানো পথ পেরিয়ে এগিয়ে চলি ট্রিংখালের দিকে।

য়ুরোপ পর্যটকদের স্বর্গ। কিন্তু পর্যটন এখানে একটি শ্রেষ্ঠ ব্যবসা। সুতরাং সর্বত্র দর্শনী। অতএব জনপ্রতি পাঁচ মার্ক প্রবেশ-মূল্য দিয়ে ট্রিংখালের ভেতর আসা গেল। তবু মন্দের ভাল, অমৃতের জন্য টিকেট কিনতে হল না।

এটাও বেশ বড় হলঘর। কিন্তু ফাঁকা নয়, সারা ঘর জুড়েই টেবিল-চেয়ার পাতা। ছোট-ছোট গোলটেবিল আর তার চারিপাশে পাঁচখানি করে চেয়ার। অধিকাংশ টেবিলেই লোক রয়েছে। বোধ করি এঁরা সবাই পর্যটক।

—কিন্তু এতো দেখছি রেস্তরাঁ! কোথায় সেই হট্-স্প্রিং? আমি জিজ্ঞেস করি।

শঙ্কর উত্তর দেয়—শঙ্কুদা এটা জর্মনী। এখানে কি হট্স্প্রিং-য়ের চেহারা রাজগীর কিম্বা বক্রেশ্বরের মতো হবে? ঐ দেখুন, হলঘরের প্রান্তে কাঠের সুদৃশ্য কাউন্টার আর জলের কল। ঐ কল থেকে হটস্প্রিং-য়ের জল পড়ছে। ওখানে গিয়ে দাঁড়ালেই ঐ ভদ্রমহিলা গ্লাশে ভরে আপনাকে জল দেবেন। আপনি জল নিয়ে এসে যেকোন

জায়গায় বসে পড়ুন। আরামে জল পান করুন, যে কয়গ্লাস ইচ্ছে।

আমরা তাই করি। কাউন্টারে গিয়ে ভদ্রমহিলার কাছ থেকে একগ্লাস করে জল নিয়ে এসে একটা টেবিলের সামনে বসি। বলা বাহুল্য শ্রীমান অমৃতর জন্যও শঙ্কর একগ্লাস জল নিয়ে এসেছে। জলটা বেশ গরম, তবে তেমন বিস্বাদ নয়। আমরা চায়ের মতো চুমুক দিয়ে জল পান করতে থাকি।

চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞেস করি—এই জলে স্নানের ব্যবস্থা নেই?

—আছে বৈকি! তবে বক্রেশ্বরের মতো কুণ্ড নয়, বাথরুম। সেখানে বাথটবে এই জল ভরে নিয়ে আপনি যতক্ষণ ইচ্ছে স্নান করতে পারেন। তার জন্য অবশ্য চার্জ দিতে হবে। শঙ্কর উত্তর দেয়।

কথায় কথায় গৌর বলে—তুমি তো জানো শঙ্কুদা। য়ুরোপের মানুষ জল খুব কমই খায়। যা খায়, তাও মিনারেল ওয়াটার। এই জলও মিনারেল ওয়াটার এবং বিশেষ গুণ সম্পন্ন। এ জলে সোডিয়াম, ক্যাল্‌সিয়াম, আয়রণ, লেড ও জিন্‌ক প্রভৃতি মিনারেল্‌স মানে অজৈব প্রাকৃতিক পদার্থ রয়েছে। আর তাই বহুকাল ধরেই সারা য়ুরোপ থেকে দলে দলে মানুষ স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ছুটে আসছেন এখানে। ধনীরা ভিলা তৈরি করেছেন, বড় বড় হোটেল আর স্বাস্থ্যাবাস গড়ে উঠেছে। বাডেন-বাডেন রূপান্তরিত হয়েছে সমৃদ্ধ জনপদে।

আগেই শুনেছি, এখানে যত ইচ্ছে জল নেওয়া যায়। কিন্তু নিলেই তো হবে না, খেতে হবে। কত আর জল খাওয়া যায়? আমি জয়া ও গৌর দু-গ্লাশের বেশি খেতে পারলাম না। কেবল শঙ্কর তিন গ্লাশ গলাধঃকরণ করল। আর অমৃত একগ্লাশও শেষ করতে পারল না। ওর নাকি ভাল লাগছে না। লাগার কথাও নয়। কোকা-কোলার জিভে কি মিনারেল ওয়াটার ভাল লাগে?

অনেকে দেখছি ওয়াটার বটল নিয়ে এসেছেন। বলা বাহুল্য তাঁরা জল খেয়ে জল ভরে নিচ্ছেন। আমরা ওয়াটার বটল গাড়িতে

রেখে এসেছি। জয়া আপসোস করছে। মেয়েরা সঞ্চয় করতে বড় বেশি ভালোবাসে।

জলপান শেষ করে বেরিয়ে আসি ট্রিংখালে থেকে। বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে চলি বাজারের দিকে। কিছুদূর এগিয়েই শহরের ঘনবসতি অঞ্চল। পথের দু-পাশেই বড়-বড় বাড়ি, পাঁচ-ছ'তলা উঁচু। প্রায় প্রতি বাড়িতেই কিছু কিছু পাথরের অলঙ্করণ, সামনের দিকে সুন্দর-সুন্দর ব্যালকনী। কোন বাড়ির ছাদে মোচাকৃতি গম্বুজ। বলা বাহুল্য এগুলো সবই পুরনো অট্টালিকা। কিন্তু এরা সংখ্যায় বেশি হলেও সব নয়। আধুনিক ডিজাইনের নতুন বহুতল বাড়িও দেখতে পাচ্ছি মাঝে মাঝে। সত্যই সমৃদ্ধ শহর।

পথটা খুব প্রশস্ত নয়। তবে ভারী পরিচ্ছন্ন আর মসৃণ। ঠিক মাঝখানে একটা সাদা সরলরেখা টেনে পথটি দুভাগ করা হয়েছে। নিশ্চয়ই গাড়ি যাতায়াতের জন্য। কিন্তু এখন একখানিও গাড়ি দেখছি না। বোধকরি পর্যটন-ঋতু বলে গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

গাড়ি নেই বলে অধিকাংশ পথচারী পথের ওপর দিয়েই আসা-যাওয়া করছেন। অথচ পথের পাশে বেশ চওড়া ফুটপাথ রয়েছে। এবং সেখানে দু-চারটি দোকানও বসেছে। যাক্ গে, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, এদেশেও তাহলে হকার আছে।

দু-পাশের বাড়িগুলোতেও দোকান। ভারী সুন্দর করে সাজানো সব দোকান। ছোট-বড় নানা রকমের দোকান। দুয়েকটি ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরস-ও দেখতে পাচ্ছি। দোকানগুলো জুরিখ, লণ্ডন, পারি আর বার্লিনের মতো 'এস্ক্যালেটার' সমৃদ্ধ বহুতল না হলেও বেশ বড় এবং সুসজ্জিত।

একটা রেস্তরাঁর সামনে শঙ্কর দাঁড়িয়ে পড়ে। তাকিয়ে দেখি লেখা রয়েছে—WIENERWALD. ভিনেয়ারভাল্ড।

গৌর বলে—এটা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ রেস্তরাঁ। এঁদের মুরগীর রোস্ট, খুবই বিখ্যাত। তোমাকে আজ কিন্তু মাংস খেতে

হবে শঙ্কুদা, এখানে নিরামিষ পাওয়া যায় না।

—ঠিক আছে। হেসে বলি—ছোটবেলায় বরিশালে থাকতে একজন মুসলমান দারোগা তাঁর বাড়িতে আমাকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। সবিনয়ে বলেছিলেন, নিরামিষ খাওয়াবেন। আমি খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু খেতে বসে দেখি দুটি পাত্রে দু-রকমের মুরগীর মাংস পরিবেশিত হয়েছে। তাড়াতাড়ি তাঁকে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। দারোগাসাহেব জিভে কামড় দিয়ে বললেন—আইজ্ঞা নিরামিষই তো খাওয়াইতে আছি। কচি মুরগা নিরামিষ।

আমার গল্প শুনে ওরা হেসে ওঠে। হাসি থামলে আমি গম্ভীর স্বরে যোগ করি—সুতরাং বুঝতে পারছ, নিরামিষ পছন্দ করলেও এই জগদ্বিখ্যাত রেস্তরাঁয় মুরগীর রোস্ট খেতে আপত্তি নেই আমার।

আপত্তি না করে ভালই করেছি। ভারী সুস্বাদু খাবার পাওয়া গেছে। মাংস তো মুখে দিতেই প্রায় গলে যাচ্ছে।

খাবাব পরে বেরিয়ে আসি পথে। শঙ্কর বলে—এখানে একটা 'রোজেনমেসে' বা গোলাপ ফুলের প্রদর্শনী চলেছে। চলুন, হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে দেখে আসা যাক। বাডেন-বাডেন ফুলের জন্য বিখ্যাত।

জনৈক জর্মন পথচারীর কাছে শঙ্কর পথ জেনে নেয়। তারপরে ছেলের হাত ধরে এগিয়ে চলে। আমরা ওদের অনুসবণ করি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘনবসতি অঞ্চল ছাড়িয়ে আসি। একটা গাছে ছাওয়া পাহাড়ে পৌঁছই। তারই গা বেয়ে সামান্য চড়াই-উৎরাই পথ। এগিয়ে চলি। পথের পাশে মাঝে মাঝেই কৃষ্ণারণ্যের সেই নিজস্ব বাড়ি। কাঠ আর টালির দোতলা বাংলো। গায়ে ভারী সুন্দর রঙ। প্রায় প্রতিটি বাংলো অনেকখানি জায়গা জুড়ে। বাংলোর সামনে ও পেছনে বাগান, ফুল আর ফলের বাগান।

অবশেষে এসে পৌঁছই প্রকাণ্ড একফালি সবুজ সমতলে। এখানেও একটি বাংলো রয়েছে। তবে সেটি পথ থেকে বেশ খানিকটা দূরে। বাংলোর সামনে বিশাল এলাকা জুড়ে বাগান, গোলাপ বাগান। কোন গাছটি একফুট, কোনটি বা দশফুট উঁচু। কিন্তু

সব গাছেই গোলাপ ফুটেছে। নানা আকারের গোলাপ, ছোট বড় মাঝারী। তাদের গড়নেও নানা বৈচিত্র্য। আর রঙ? জগতে যত রঙ হতে পারে, তা সবই বুঝি রয়েছে এই বাগানে, হাজার হাজার ফুলের মাঝে।

আমরা দেখি আর দেখি। আমরা কেউ শাহজাহান কিম্বা জওহরলাল নই। তবু আমরা গোলাপ ভালোবাসি। আর গোলাপ তো দেখছি জ্ঞানলাভের পর থেকেই। কিন্তু সে দেখার সঙ্গে এ দেখার যেন পার্থক্য রয়েছে। এত গোলাপ যেমন একসঙ্গে কোথাও দেখি নি, তেমনি গোলাপের গন্ধে এমন মাতোয়ারাও হই নি কখনো। শুনেছিলাম, ফুলের গন্ধে মানুষ নাকি মাতাল হয়। কথাটা বিশ্বাস করি নি। আজ নিজেই মাতালের মতো ফুলবনে পদচারণা করে চলেছি।

॥ এগারো ॥

বেলা তিনটের সময় আবার পাতাল-প্রবেশ করতে হল। গাড়িতে এসে বসা গেল। এবারে গৌর চালকের আসনে বসেছে। শঙ্কর বসল পেছনে, ছেলের কাছে, ম্যাপ হাতে নিয়ে। শ্রীমান আহ্লাদে আটখানা, প্রায় দুদিন পরে গাড়িতে বাপকে পাশে পেয়েছে।

জয়া মন্তব্য করে—বাপ-সোহাগী ছেলে আমার।

ঠাট্টা কি হিংসে বুঝতে পারি না।

গৌর গাড়ি স্টার্ট দেয়। ভিন্ন পথে গাড়ি উঠে আসে ওপরে। তেমনি গেট বন্ধ। গেটের পাশে একই আকারের একটা যন্ত্র। শঙ্কর পকেট থেকে সেই টিকেটটা বের করে গৌরের হাতে দেয়। গৌর সেটি যন্ত্রের ভেতর গলিয়ে দেয়। তারপরে একটা বোতাম টেপে। টং করে শব্দ হয় আর যন্ত্রের গায়ে লেখা পড়ে ০৯.০০ মার্ক।

মার্কগুলিও সে একইভাবে যন্ত্রের ভেতরে গলিয়ে দিল। আবার

টং করে ওঠে, একটুকরো কাগজ বেরিয়ে আসে। গৌর রসিদটা ছিঁড়ে নেয়। ব্যাস, গেট খুলে যায়। আমরা বেরিয়ে আসি বাইরে।

এতবড় কার-পার্ক। কত গাড়ি আসছে, যাচ্ছে। কত ভাড়া আদায় হচ্ছে। কিন্তু মানুষের মুখ দেখতে পেলাম না। দারোয়ান নেই, কেরাণী নেই, ক্যাশিয়ার নেই। যন্ত্রমানব সবার সব কাজ সুষ্ঠু-ভাবে সুসম্পন্ন করে চলেছে।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। বেশ বড় শহর। তাহলেও শহর ছাড়িয়ে আসতে সময় বেশি লাগে না।

শঙ্কর বলে—আমরা এখন ৫০০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে দক্ষিণে চলেছি। এই পথটি ফ্রয়েডেনস্টাড্ট্ (Freudenstadt) হয়ে ফ্রাই-বের্গ চলে গিয়েছে। আমরা অবশ্য অতদূর যাবো না। ফ্রয়েডেনস্টাড্ট্ থেকে কিছুটা উত্তরপুবে এগিয়ে ট্যুবিংগেন। সেখানেই আজকের যাত্রায় যতি পড়বে। আশা করি ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে মানে বিকেল ছ'টা নাগাদ ট্যুবিংগেন পৌঁছে যাবো।

এসব কথা আমাকে বলা নিষ্প্রয়োজন, তবু ওরা বলে। কারণ ওরা আমাকে দেশ দেখাতে নিয়ে বেড়িয়েছে। আমি সবই শুনি কিন্তু কিছুই মনে রাখতে চাই না। আমি শুধুই দেখি।

এখনও তাই দেখছি। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে গাড়ি চলেছে ছুটে। চড়াই-উৎরাই পথ, তবে ভারী মসৃণ। পাহাড়ী পথের তুলনায় বেশ চওড়া। খানতিনেক গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে।

পথের চাইতে বন সুন্দর। পথের দু-পাশেই পাহাড়ের গায়ে গাছের সারি। সেই ওক এবং বীচ গাছ। ফার গাছও দেখতে পাচ্ছি অল্প-স্বল্প। সবে শুরু হয়েছে। পাতাগুলি সত্যই কালচে। আর তাই এ বনের নাম ব্ল্যাক-ফরেস্ট।

ভারী সুন্দর বন। বার বার যমুনোত্রী পথের সিলকিয়ারী আর গঙ্গোত্রী পথের ভৈরবঘাটির কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে মানালীর কথা। কিন্তু এ বনের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি, গাছগুলো অমন অযত্নে বড় হয়ে ওঠে নি, পরম স্নেহে লালিত-পালিত হচ্ছে।

বাডেন-বাডেনের জলপান করে মুরগীর রোস্ট ভোজন করেছি। সুতরাং হজমের অসুবিধে হবার কথা নয়। তবে পিপাসা পেয়েছে। তাই পথের পাশে একটা ঝর্ণা পেয়ে গাড়ি থামানো হল।

জায়গাটি সুন্দর। পথের বুক থেকে পাহাড়ের ঢাল আস্তে আস্তে উঁচু হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে ঝোপঝাড় আর বড় বড় গাছ। তারই মাঝে নেমে এসেছে একটি ঝর্ণা। জলটা এসে জমা হচ্ছে পথের পাশে একটা পাথরের জলাধারে। বোধকরি গাড়ি আর তার আরোহীদের তেষ্টা মেটাতে।

আমরা কিন্তু জলাধারের শরণ নিলাম না। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বেশ খানিকটা ওপরে উঠে এলাম। বলা বাহুল্য শ্রীমান অমৃত আমাদের এই পর্বতারোহণে নেতৃত্ব দান করল।

ঝর্ণার তীরে দাঁড়িয়ে ভরপেট জলপান করা গেল। তারপরে নেমে এসে আবার গাড়িতে উঠে বসি। গাড়ি এগিয়ে চলে। এখন বিকেল চারটে।

মিনিট বিশেক বাদে একটা বাঁকের মুখে এলাম। পথটা অনেকখানি চওড়া এখানে। পথের পাশে পাহাড়ের গয়ে আধুনিক ডিজাইনের ছোট একটি গির্জা। পাশে রেস্তরাঁ ও টেলিফোন বুথ। সামনে খানিকটা জায়গা জুড়ে কার-পার্ক।

গৌর গাড়ি পার্ক করে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে বাঁকের মুখে আসি। রেলিং ধরে দাঁড়াই। পাহাড়টা এখান থেকে আস্তে আস্তে নেমে নিচের উপত্যকায় মিশেছে। চমৎকার সবুজ উপত্যকা। পাহাড়টাও গাছে ছাওয়া, অপরূপ।

গৌর বলে—এটা একটা 'ভিউ পয়েন্ট'। দেখতেই পাচ্ছো, চারিদিকের কি চমৎকার দৃশ্য। যাওয়া-আসার পথে সবাই এখানে গাড়ি থামিয়ে একটুকাল এই প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করে নেয়।

আমরাও তাই নিচ্ছি।

গৌর যোগ করে—সারা বছরই কিন্তু এখানকার দৃশ্য দর্শনীয়। এখন সবুজ, শীতকালে সাদা। তখন স্কী করার ব্যবস্থা হয়। নিচের

উপত্যকা থেকে ছেলে-মেয়েরা লিফ্‌টে করে এখানে উঠে আসে। এখান থেকে স্কী করে আবার উপত্যকায় নেমে যায়।

অনেকটা এসেছি এগিয়ে। কিন্তু পথের সৌন্দর্য অপরিবর্তিত। কেবল ফার গাছের সংখ্যা বেড়েছে। তাই বনকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। পথের দুপাশেই গাছের সারি আর গাছগুলি সমান উঁচু। দূরে তাকালে মনে হয় যেন দুটি সবুজ পাঁচিল পথটিকে কোলে করে রয়েছে দাঁড়িয়ে।

এখন বিকেল সাড়ে চারটা! আমরা মালভূমির মতো উঁচু একটা জায়গায় উঠে এলাম। শঙ্কর বলে—এ জায়গায় ১০৮০ মিটার উঁচু। দেখছেন না গাছপালা কেমন কমে গিয়েছে।

সত্যিই তাই।

এ অঞ্চলে দেখছি গ্রাম কম, শুধুই বন। প্রায় ঘণ্টাখানেক বন-পথ পার হবার পরে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় একটি শহর পাওয়া গেল। নাম আল্টেনস্টাইন (Altenstein)। মানে ওল্ড স্টোন, পুরনো পাথর। কে এই নাম রেখেছেন জানি না। তবে আমার মতে শহরটার নাম হওয়া উচিত ছিল পুরনো বন। কারণ সারা শহরটাই বনের মাঝে।

আমরা শহরের ভেতর দিয়ে চলেছি। ছোট শহর। একটু বাদেই শেষ হয়ে যায়। শুরু হয় বন আর ক্ষেত। তারই বুক চিরে ছবির মতো মনোরম পথ।

পথ পরিবর্তিত হয়। পুরনো পথ ছেড়ে গৌর নতুন ধরে। শঙ্কর বলে—এটি ২৮ নম্বর জাতীয় সড়ক।

পথের সঙ্গে দিক পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা এখন দক্ষিণে চলেছি। ট্যুবিংগেন পর্যন্ত এইভাবে চলতে হবে।

দুটি যুবক-যুবতী বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে গাড়ি থামাতে বলছে। ওরা 'হিচ্‌-হাইকিং' করছে। 'লিফ্‌ট' চাইছে। কিন্তু আমাদের গাড়িতে যে জায়গা নেই! অমৃতকে নিয়ে আমরা পাঁচজন।

শঙ্কর জানলা খুলে হাত দেখিয়ে বুঝিয়ে দেয়।

বন সুন্দর কিন্তু পথও কিছু কম সুন্দর নয়! যেমন প্রশস্ত তেমনি পরিচ্ছন্ন ও মসৃণ। এত মসৃণ যে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে যেন পালিশ করা হয়েছে।

পথের একপাশে বনময় পাহাড় আরেক পাশে রেলিং দিয়ে ঘেরা। পথের নাম ফালিড (Valid) স্ট্রাসে।

এবারে কিন্তু মাত্র মিনিট পনেরো বাদেই আরেকটা শহর এলো। নাম 'নাগোল্ড'। এ শহরটাও বনের ভেতরে। তেমন বড় নয়, তবে কয়েকটা বহুতল বাড়ি দেখতে পাচ্ছি। আর রয়েছে প্রকাণ্ড একটা কাঠের কারখানা। শঙ্কর বলে—আসবাবপত্র সহ কাঠের যাবতীয় জিনিস তৈরির কারখানা। এখানকার আসবাবপাত্রের খুব নাম, বিদেশে রপ্তানী হয়। কাঠের কাজ কিম্বা চাষাবাদই শহরবাসীদের প্রধান জীবিকা।

আমাদের আগে একটা খোলা ভ্যানগাড়ি চলেছে। গাড়িতে কয়েকজন বন্দুকধারী পুলিশ। তাঁদের দুজনের হাতে দুটি বাইনো-কুলার। তাঁরা মাঝে মাঝেই বনের ভেতরে কি যেন দেখছেন। এঁরা কারা?

গৌর উত্তর দেয়—ফরেস্ট গার্ড। এঁরা বন পাহারা দিচ্ছেন।

তার মানে এদেশেও চোর আছে!

আবার একটা শহর। নামটা শঙ্কর তখন বলেছিল, ফ্রয়েডেন-স্টাড্‌ট। শহরটা ছোট নয়। পথের পাশে প্রচুর সীমার-ফ্রাই ও পেনসন দেখতে পাচ্ছে। তার মানে এখানে নিয়মিত পর্যটক আসেন। আসতেই পারেন। শহরটির অবস্থান ভারী চমৎকার।

—আমরা এখন ২৮ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে চলেছি। এই পথটাই ট্যুবিংগেন হয়ে স্টুটগার্ট চলে গেছে। ট্যুবিংগেন এসে গেল।

এলেই ভাল। সেখানে আজকের যাত্রাবিরতি। ছ'টা বাজে।

কিন্তু তার আগে আরেকটা পাহাড়ী শহরে এলাম। নাম হেরেনবের্গ (Herrenberg)। শঙ্কর অর্থ বলে—জেন্ট্‌লমেন্'স হিল। মানে ভদ্রলোকদের পাহাড়।

—তার মানে এখানে যাঁরা বাস করেন, সবাই ভদ্দরলোক ?

—বাসিন্দারা তাই দাবী করেন।

—একবার পরোখ করলে হত ?

—না শঙ্কুদা ! গৌর আপত্তি করে—আমরা একেবারে ট্যুবিংগেন গিয়ে থামব, এখনও বিশ কিলোমিটার বাকি। ছ'টা বেজে গেছে।

স্টুটগার্টের জাতীয় সড়ক ছেড়ে দিয়ে একটি ছোটরাস্তা ধরলাম। এতক্ষণে উত্তর-পুবে এসেছি। এবারে চলেছি দক্ষিণে।

ছোট হলেও রাস্তাটি ভারী সুন্দর। দু-পাশেই ক্ষেত, সবুজ অথবা সোনালী। আর ক্ষেতের শেষে, বহুদূরে পাহাড়ের সারি।

বিশ কিলোমিটার আসতে সময় সামান্যই লাগল। বিকেল সোয়া ছ'টা নাগাদ আমরা ট্যুবিংগেন পৌঁছে গেলাম। গতকালের তুলনায় আজ অবশ্য কম দূরত্ব অতিক্রম করেছি। বোধকরি শ'-তিনেক কিলোমিটার হবে। তা হোক্ গে, তবু ক্লান্ত লাগছে। গতিতে যেমন উত্তেজনা, তেমনি ক্লান্তি। এবারে যাত্রার যতি আসন্ন। সুতরাং বেশ কিছুক্ষণ গতিহীন হয়ে থাকা যাবে। আরামে বিশ্রাম করতে পারব।

শহরের ভেতর দিয়ে পথ চলেছি। ছোট শহর। গৌর গাড়ির বেগ কমিয়ে বলতে থাকে—এই বাডেন-ভ্যুরটেনবের্গ প্রদেশে ট্যুবিংগেন একটি শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। শহরটি সুপ্রাচীন, ১০৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। তবে ১৪৭৭ সাল অবধি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়-শহর হিসেবেই পরিচিত ছিল। ১৫৩৬ সালে এখানে একটি প্রোটে-স্টান্ট্ থিওলজিকাল সোসাইটি স্থাপিত হয়। তাঁরা সমাজ সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে শহরের উন্নয়নে মনযোগী হন। এই সংস্থায় Kepler ও Hegel-এর মতো মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। শহরের পুরনো কবরখানায় তাঁদের সমাধি রয়েছে। এখানকার একটি প্রকাশন সংস্থা সেকালের শ্রেষ্ঠ লেখক ও কবিদের রচনা প্রকাশ করে চলেছেন। এখানে বটানিক্যাল গার্ডেনস রয়েছে। কিন্তু সব কিছুর ওপরে স্থান হল বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগারটির।

শুনলে অবাক হবে, সেখানে পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থের সংখ্যা বিশ লক্ষের ওপরে।

--বিশ লক্ষ!

-হ্যাঁ। টু-উ মিলিয়ন। গৌর আবার বলে।

তবু আমার বিস্ময় কাটে না। এতটুকু একটা শহরে বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগারে বিশ লক্ষ বই!

গৌর গাড়ি থামায়। শঙ্করকে বলে– এখানে একটা পেনসন রয়েছে। নেমে দেখো, দুটো ঘর পাওয়া যায় কিনা?

শঙ্কর নেমে যায়। বলা বাহুল্য শ্রীমান অমৃত তার সঙ্গী হয়। আমরা গাড়িতে বসে থাকি।

মিনিট পনেরো পরে শঙ্কর ফিরে আসে। বলে—না জায়গা নেই। এঁরা বললেন, এখানে আজ জায়গা পাওয়া যাবে না। কি একটা এডুকেশন্যাল কন্‌ফারেন্স হচ্ছে। বহু ডেলিগেট এসেছেন। তাঁরা সব হোটেল ও পেনসন দখল করে নিয়েছেন।

মনটা খারাপ হয়ে যায়। ভেবেছিলাম, এখানেই দিনের যাত্রায় যতি টানা যাবে। কিন্তু তা বোধকরি আর হয়ে উঠল না। তবু গৌর খানিকটা এগিয়ে আবার গাড়ি থামায়। এখানে একটা হোটেল রয়েছে। শঙ্কর গাড়ি থেকে নেমে যায়।

বেজার মুখে ফিরে আসে মিনিটকয়েক পরে। গৌর বলে- -পেলে না তো!

--না পেয়েছি।

—পেয়েছো! তিনজনে তারস্বরে বলে উঠি।

—হ্যাঁ। তবে সে পাওয়া না-পাওয়ারই সামিল। জনপ্রতি দেড়শ' মার্ক করে দিতে হবে।

—দেড় শ' মার্ক। একটা রাতের জন্য একজনকে!

শঙ্কর গাড়িতে উঠে আসে। গাড়ি এগিয়ে চলে।

ওরা সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নয়। তাই আরও একটি পেনসন ও হোটেলে ঘর খোঁজা হল। পাওয়া গেল না। অবশেষে নিরুপায়

স্বরে গৌর বলে—তাহলে বরং ঐ হোটেলটাতেই চলো।

—আপনি কি বলছেন দাদা! জয়া যেন আঁতকে ওঠে—একটা রাতের জন্য ছ'শ মার্ক ঘর ভাড়া দেবেন!

—কি আর করবে বলো? পাওয়া না গেলে···

—পাওয়া যাবে গৌরদা! শঙ্কর বলে—তবে এখানে নয়, সামনেব নুর্টিংগেন (Nurtingen) বা অন্য কোন শহর কিম্বা গ্রামে।

—কিন্তু ইচ্ছে ছিল, আমরা ব্ল্যাক-ফরেস্টের ভেতরে কোন জায়গায় আজকের রাতটা কাটাবো। গৌর একটু আপত্তি করে।

—নুর্টিংগেন তো ব্ল্যাক-ফরেস্টের মধ্যেই।

—তাহলে চলো। গৌর গাড়ি স্টার্ট দেয়। গাড়ি এগিয়ে চলে।

সাতটা নাগাদ আমরা নুর্টিংগেন পৌঁছলাম। খুবই ছোট শহর। তবে হোটেল রয়েছে। গৌর গাড়ি থামায়।

হঠাৎ জয়া বলে ওঠে—শুধু হোটেল নয়. ঐ দেখুন সীমার-ফ্রাই পর্যন্ত আছে।

তাই তো! আমরাও দেখতে পাই। না, মেয়েদের চোখ বটে!

গৌর জয়াকে বলে—শঙ্করকে দিয়ে তো হল না। এবারে চলো আমরা ছ'ভাই-বোন মিলে ঘর ঠিক করে আসি।

—তাই চলুন! অমৃতকে নিয়ে জয়া গাড়ি থেকে নেমে পড়ে।

গৌর ওদের সঙ্গী হয়।

ওরা চলে যায়। আমরা আশায় থাকি, আজ রাতটা এখানে অর্থাৎ এই ব্ল্যাক-ফরেস্টে কাটাতে পারব।

শঙ্কর সহসা জিজ্ঞেস করে—শঙ্কুদা বিরক্ত হচ্ছেন তো?

—বিরক্ত! কেন বলো তো?

—সারাদিন ধকল সইবার পরে রাতের আশ্রয় মিলছে না।

—ধকল! তেলের মতো মসৃণ ও ছবির মতো সুন্দর পথে গাড়ি চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছি, বাডেন-বাডেনের মতো বিশ্ববিখ্যাত স্বাস্থ্যাবাসে লাঞ্চ করেছি। একে কি ধকল সওয়া বলে ভাই?

তবু শঙ্কর জবাবদিহি করে—এসব জায়গায় সাধারণত আশ্রয়ের

অভাব হয় না। তবে ঐ যে শুনলেন ট্যুবিংগেনে কি একটা কনফারেন্স না সেমিনার হচ্ছে, তারই জন্য এই অবস্থা।

—এখানে নিশ্চয়ই ঘর পেয়ে যাবো। ওকে আশ্বস্ত করি।

—আমিও তাই আশা করছি।

কিন্তু আমাদের আশা সফল হয় না। ওরা ফিরে এসে জানায়—ঠিকমত ঘর পাওয়া গেল না। জয়া বলে।

—কি পাওয়া গেল? শঙ্কর জিজ্ঞেস করে।

—সীমার-ফ্রাই খুবই বাজে। দাদা সেখানে থাকতে পারবেন না! আর হোটেলে একটা থ্রি-বেডেড রুম আছে, কমন বাথ। চারজনকে থাকতে দেবে কিন্তু, ভাড়া চাইছে চারশ' মার্ক, ব্রেক-ফাস্ট দেবে না।

—কি আর করা যাবে ব'লো। সঙ্গে একটা বাচ্চা রয়েছে, আমরাও ক্লান্ত। চলো, ঐ ঘরটাই নেওয়া যাক। গৌর বলে।

—আপনি কি বলছেন গৌরদা! এই রকম একটা ছোট জায়গায় একটা বাজে হোটেলে রাত কাটানাব জন্য চারশ' মার্ক গুণাগার দেব।

—অবস্থার বিপাকে তাই দিতে হবে।

—না, না। আমরা এমন কোন দুরবস্থায় পড়ি নি। আপনি পেছনে এসে বসুন, আমি গাড়ি চালাচ্ছি। সামনে আরও দু-তিনটে ছোট শহর রয়েছে। সেগুলোতে যুক্তিসঙ্গত ভাড়ায় কোন ঘর পেলে থেকে যাবো, না পেলে অটোবান ধরে সোজা ম্যুন্‌শেন (Munchen)।

—মুন্‌শেন! ইউ মিন্ ম্যুনিক?

—ইয়েস। সেখানে আশ্রয়ের অভাব হবে না।

—কিন্তু ম্যুনিক তো এখন থেকে আরও অন্তত আড়াই শ' কিলোমিটার!

—তা হক্ গে। অটোবানে আর কতক্ষণ লাগবে? এখন সাড়ে সাতটা সন্ধ্যে দশটার মধ্যেই আমরা মুন্‌সেন পৌঁছে যাবো।

তবু গৌর আপত্তি করে—প্ল্যান ছিল আজ রাতটা ব্ল্যাক-ফরেস্টে কাটিয়ে কাল সকালে ডাখাউ (Dachau) দেখে ম্যুনিক যাবো।

—ব্ল্যাক-ফরেস্টে হয়তো রাত কাটানো হবে না, কিন্তু কাল সকালে ম্যুন্শেন থেকে এসে ডাখাউ দেখে তারপরে আবার ম্যুন্শেন হয়ে গার্মিশ (Garmisch) চলে যাবো। ৩৪ কিলোমিটার বাড়তি পথ সফর করতে হবে। কিন্তু কি আর করা যাবে ?

গৌর শেষ পর্যন্ত শঙ্করের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। সে পেছনে এসে বসে। শঙ্কর গাড়ি ছাড়ে।

আমাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হয়েছে এই ভ্রমণ। কিন্তু ভ্রমণের পরিকল্পনা প্রনয়ণ কিম্বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমার কোন ভূমিকা নেই। অতএব আমি চুপ করে আছি। জয়াও কোন কথা বলছে না। কেবল নীরব থাকে না অমৃত। সে গৌরকে বলে—তাই ভাল জেঠু, চলো আমরা ম্যুন্শেন চলে যাই।

—কেন বলো তো ? গৌর সহাস্যে বলে—সেখানে ভাল আইস-ক্রিম পাওয়া যাবে, তাই ?

ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জা পায় অমৃত। সে মায়ের কোলে মুখ লুকোয়। আমরা তিনজনেই সোচ্চার স্বরে হেসে উঠি। মানে মনের গুমট কেটে গেল। ছোট ছেলেটা আমাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল।

পথে দুটো ছোট শহর পাওয়া গেল। কিন্তু লাভ হল না কিছুই। সেখানেও মনের মতো আশ্রয় মিলল না। সুতরাং শঙ্কর স্টুটগার্টের উত্তরমুখী পথ ছেড়ে দিয়ে গাড়ি অটোবানে নিয়ে এলো, কার্লশ্রুহে—ম্যুন্শেন—জালসবুর্গ (Salzburg) অটোবান। অর্থাৎ এ পথটি অস্ট্রিয়ায় চলে গেছে। তা যাক্ গে, আপাতত আমাদের গন্তব্যস্থল ম্যুনশেন বা ম্যুনিক। সেখানে রাতের আশ্রয় ও খাদ্য পাওয়া যাবে।

আটটা বেজে গিয়েছে। কিন্তু এখনও চারিদিকে চক্চকে রোদ। সেই রুপোলী রোদে পথের পাশের সোনালী ক্ষেতগুলি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে দিগন্তব্যাপী সোনার সাগর। মাঝে মাঝে মত্ত পবন সেই শান্ত সাগরের বুকে ঢেউ তুলছে। সোনার ঢেউ দিগন্তে পৌঁছে কালো পাহাড়ের পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ছে। কি করবে ? জগতের প্রায় সবদেশেই সব পাহাড় হিমালয়ের মতো পবিত্র, দেব-

ভূমি রূপে সমাদৃত। সেখানে দেব-দেবী আর পরীরা বসবাস করেন। তাই তো সোনার সাগর পাহাড়ের পায়ে আত্মনিবেদন করছে।

দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। আজ তিনদিন হল এই দেখার পালা চলেছে। তবু ভাল লাগছে। প্রকৃতি যে অকৃপণ করুণায় এই দেশটাকে সুজলা ও সুফলা করেছে। তাই এই ঐশ্বর্যশালী দেশের পথে পথে ভ্রমণ করে এমন আনন্দ লাভ করছি। আমি সত্যই ভাগ্যবান।

বিকেল ন'টা নাগাদ আমরা একটা পেট্রোল পাম্পে গাড়ি থামালাম। জায়গাটার নাম লাইপহাইম্ (Leipheim)। ম্যুনশেন এখনও অনেক দূর। তাই শঙ্কর তেল নিয়ে নিচ্ছে। অবশ্য পথে আরও পাম্পিং স্টেশন পাওয়া যেত।

পরের পেট্রোল পাম্প কতদূরে, তাও লেখা আছে এখানে। লেখা আছে আরও অনেক সংবাদ। ঠিক লেখা নয়। অটোবান আন্তর্জাতিক মোটরপথ বলে ভাষা বিভ্রাট এড়াবার জন্য এপথে সবকিছুই ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া আছে। এখানেও ছবি আঁকা আছে। আর সেই ছবি দেখেই জয়া একেবারে আনন্দে ফেটে পড়ে। বলে ওঠে

-এখানে মোটেল রয়েছে।

--মোটেল!

হ্যাঁ। ঐ দেখুন না গাড়ি বিছানা আর কাঁটা-চামচের ছবি।

তাই বটে।

অতএব গাড়ি থেকে নেমে শঙ্কর প্রায় ছুটে যায় পেট্রোল পাম্পের রেস্তরাঁয়। সেখানে কি জিজ্ঞেস করে ছেলেকে সঙ্গে নিয়েই পেছনের লম্বা একতলা বাড়িটার দিকে ছোটে।

আমরা গাড়িতে তেল ভরে ওদের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। এসব পাম্পে নিজেরাই নিজেদের গাড়িতে তেল ভরে নিতে হয়। দাম কিছু কম লাগে।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয় না। একটু বাদেই ছেলের হাত ধরে হাসিমুখে ফিরে আসে শঙ্কর। বলে—মোটেলটা চমৎকার। পাশা-

পাশি দুখানা ডাব্‌ল-বেড রুম পাওয়া গেছে। ঘরের সামনে খোলা বারান্দা আর গাড়ি রাখার ফাঁকা জায়গা। ভাড়াও বেশি নয়, জনপ্রতি দৈনিক ৭৬ মার্ক। আর রেস্তরাঁটা তো সামনে দেখতেই পাচ্ছেন।

আমি মাথা নাড়ি। আর ভাবি- জীবন দেবতা কবে কোথায় কার জন্য আশ্রয় বরাদ্দ করে রেখেছেন, তা কেউ আগেব থেকে জানতে পারে না।

গোধূলি ঘনিয়ে আসছে জর্মনীর আকাশে। আজ ঠিক পাঁচ-সপ্তাহ হল ঘর ছেড়েছি। এরই মধ্যে আমি কৃষ্ণারণ্য ভ্রমণ শেষ করে বাভেরিয়ায় পৌঁছে গিয়েছি। আগামীকাল সকাল থেকে শুরু হবে বাভেরিয়ার পথ পরিক্রমা।

কিন্তু বাভেরিয়ার কথা এখন থাক। তার চেয়ে মোটেলে যাওয়া যাক। সেখানে বসে ব্ল্যাক-ফরেস্ট ভ্রমণের এই আনন্দময় দিনটির স্মৃতিচারণ করে নিই।

॥ বারো ॥

ব্রেক-ফাস্ট্‌ সেরে রওনা হতে সকাল পৌনে দশটা বেজে গেল। আজ আবার গৌর চালকের আসনে বসেছে। রাতে শঙ্করকে গাড়ি চালাতে হবে বলে সে দিনে শঙ্করকে বিশ্রাম দিতে চাইছে।

ব্যাপারটা একটু খুলে বলা দরকার। আমরা এখন হের হিট-লারের কুখ্যাত বন্দীনিবাস ডাখাউ দেখতে চলেছি। সেখান থেকে ম্যুনিক হয়ে অস্ট্রিয়া সীমান্তের জর্মন শৈলশহর গার্মিশ যাবো। তার-পরে আবার ফিরে আসব ম্যুনিক। গৌর নেমে যাবে বিমান বন্দরে। সে বিমানে করে আজ রাতেই বার্লিন ফিরে যাবে। আগেই বলেছি যে বৃটিশ নাগরিক বলে গৌর কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া স্থলপথে পূর্ব জর্মনীর ভেতর দিয়ে পশ্চিম-বার্লিনে যেতে পারে না। সে বৃটিশ

এয়ারওয়েজের অফিসার। সুতরাং বিমানে যাতায়াত করতে তার কোন অসুবিধে নেই।

গৌর বিমানবন্দরে নেমে যাবার পরে শঙ্করকে চালকের আসনে বসতেই হবে। আমরা ম্যুনিক থেকে বার্লিন রওনা হব। দূরত্ব ৫৮০ কিলোমিটার। তার মধ্যে ৩৬০ কিলোমিটার পূর্ব-জর্মনী। ছ'শ' কিলোমিটার পথ একটানা গাড়ি চালানো সম্ভব নয়, পথে বিশ্রাম নিতেই হবে। তাছাড়া পূর্ব-জর্মনীর অটোবানের রক্ষণাবেক্ষণ পশ্চিম-জর্মনীর মতো নয়। সেখানে গড়ে ঘণ্টায় ষাট/সত্তর কিলোমিটারের বেশি গাড়ি চালানো যাবে না। ফলে শঙ্করকে প্রায় ঘণ্টা বারো গাড়ি চালাতে হবে। তাই তাকে বিশ্রাম দেবার জন্য গৌর এখন চালকের আসনে বসেছে।

কিন্তু থাকগে রাতের কথা, সকালের কথায় ফিরে আসা যাক। লাইপহাইম মোটেল থেকে সকাল পৌনে দশটায় আমরা অটোবানে উঠে এলাম। গাড়ি পুবে এগিয়ে চলেছে।

গতকাল রাতে দেখেছি বেশ বৃষ্টি হয়েছে। পথের দুপাশে বর্ষণের চিহ্ন রয়ে গেছে। তাই বলে পথে জল দাঁড়ায় নি। এদেশে বসে এসব কথা ভাবাও অন্যায়।

এখন বৃষ্টি পড়ছে না তবে আকাশ মেঘলা. রোদ ওঠে নি। গাড়িতে ঘুরে বেড়াবার পক্ষে আদর্শ আবহাওয়া। রোদ উঠলে গরম লাগে। অবশ্য গাড়িতে ঠাণ্ডা অথবা গরম হাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

পথের দু-পাশেই ক্ষেত। ভুট্টা ক্ষেতই বেশি, মাঝে মাঝে গম। না. আজ আর আঙ্গুর ক্ষেতের সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। দ্রাক্ষাবন কি দেখতে পাবো আবার?

তবে যা দেখছি, তাও কিন্তু কিছু কম সুন্দর নয়। পথের দু-পাশেই সবুজ অথবা সোনালী ক্ষেত, দূর দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। সেখানে আঁকাবাঁকা ধূসর পাহাড় কিম্বা সবুজ বনের রেখা। মাঝে মাঝে মনোরম গ্রাম।

স্কেলের মতো মসৃণ পথ দিয়ে ঝড়ের বেগে গাড়ি চলেছে। গাড়ির

গতিবেগ ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার। আর ম্যুনিক এখান থেকে মাত্র শ'খানেক কিলোমিটার। কিন্তু আমরা সোজা ম্যুনিক যাচ্ছি না, পথে ডাখাউ দেখব।

সোজা পথ। ম্যাপ দেখার কিছু নেই। সুতরাং শঙ্কর কর্মহীন। সে আমাকে পশ্চিম-জর্মনীর কথা বলে চলেছে—আপনি জানেন শঙ্কুদা, বিগত বিশ্বযুদ্ধের পরে বার্লিন সহ জর্মনীকে দু-ভাগ করা হয়েছে. আপনি পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিন দেখেছেন।

আমি মাথা নাড়ি। শঙ্কর বলতে থাকে—পূর্ব ও পশ্চিম জর্মন রাষ্ট্রের পোশাকী নাম জর্মন ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক বা সংক্ষেপে জি. ডি. আর. এবং ফেডারেল রিপাবলিক অব জর্মনী। দুটি রাষ্ট্রের সীমান্ত ১৩৭৮ কিলোমিটার দীর্ঘ। আমরা প্রায় এক সপ্তাহ ধরে পশ্চিম-জর্মনীর ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আজ রাতে সীমান্ত পার হয়ে পূর্ব-জর্মনীর ভেতর দিয়ে দিয়ে পশ্চিম-বার্লিনে যাবো। পশ্চিম-বার্লিন পূর্ব-জর্মনীর মধ্যে একটি দ্বীপের মতো, পশ্চিম-জর্মনী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

পশ্চিম-জর্মনীর আয়তন ২, ৪৮, ৭০৬ বর্গ কিলোমিটার। দেশের উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমের দীর্ঘতম দূরত্ব যথাক্রমে ৮৬৭ ও ৪৬৩ কিলোমিটার। দেশের যে জায়গাটি সবচেয়ে সংকীর্ণ তার দৈর্ঘ্য ২২৫ কিলোমিটার। এই দেশের স্থল ও জল সীমান্তের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৪২৩১ ও ৫৭২ কিলোমিটার।

পশ্চিম-জর্মনীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তো দেখতেই পাচ্ছেন, ভারী সুন্দর।…

আমি আবার মাথা নাড়ি। শঙ্কর বলে চলে—এদেশের ভূ-প্রকৃতিও খুবই বৈচিত্র্যময়। যেমন আল্পস পর্বতমালা রয়েছে, তেমনি রয়েছে উচ্চ ও নিম্ন সমভূমি। আছে অনেক নদী আর বেশ কয়েকটি বড় বড় হ্রদ।

আপনি সুইস-আল্পস দেখেছেন, সে তুলনায় জর্মন-আল্পস কম উল্লেখযোগ্য।. জর্মন-অল্পস-এর উচ্চতম শিখরটির নাম জুগস্পিৎসে

(Zugspitze)। উচ্চতা ২৯৬২ মিটার।

জর্মনীর বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির দুটি শ্রেষ্ঠ অবদান ব্ল্যাক-ফরেস্ট ও বোহেমিয়ান-ফরেস্ট। আমরা ব্ল্যাক-ফরেস্ট দেখে এলাম। বোহেমিয়ান-ফরেস্ট অত সুন্দর ও ঐশ্বর্যময় না হলেও অবশ্যই দর্শনীয়। আর সেটি এই বাভেরিয়ার অন্তর্গত এবং ম্যুনিক থেকে খুব দূরে নয়। তবু সময়াভাবের জন্য এবারে আমরা যেতে পারলাম না সেখানে।

—বোহেমিয়ান-ফরেস্টের ভূ-প্রকৃতি কি ব্ল্যাক-ফরেস্টের মতই? জিজ্ঞেস করি।

গৌর উত্তর দেয়—অনেকটা। তবে আবহাওয়া অত শুকনো নয়, একটু স্যাঁতসেঁতে। সেখানেও পাহাড়ী অঞ্চলে ভ্রমণ করতে হত।

—উচ্চতা কি রকম?

সবচেয়ে উঁচু যে অঞ্চলটা পার হতে হত, সেটা ১৪৫৬ মিটার।

—ব্ল্যাক-ফরেস্টে আমরা কতটা উচ্চতা অতিক্রম করেছি?

—একটু বেশি, ১৪৯৩ মিটার।

—আচ্ছা, বোহেমিয়ান-ফরেস্ট পশ্চিম-জর্মনীর ঠিক কোন অংশে অবস্থিত?

—একেবারে পুবদিকে চেকোশ্লোভাকিয়া সীমান্তে। দানিউব ও তার শাখা-নদীসমূহ দিয়ে সিক্ত এই বনাঞ্চল।

গৌর থামতেই শঙ্কর শুরু করে। সে অন্যকথা বলে— এখন সম্মিলিত জর্মন জাতির জনসংখ্যা ৭ কোটি ৪০ লক্ষ। তার মধ্যে পশ্চিম-জর্মনীর জনসংখ্যা ৫ কোটি ৭০ লক্ষ আর পূর্ব জর্মনীর ১ কোটি ৭০ লক্ষ। পশ্চিম-জর্মনীতে আমাদের মতো ৪৪ লক্ষ বিদেশী স্থায়ী-ভাবে বসবাস করছেন। তার মানে পশ্চিম-জর্মনীর মোট জনসংখ্যা ৬ কোটি ১২ লক্ষ।

একশো বছর আগে জর্মন জাতির জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২ কোটি। তখন প্রতি বর্গকিলোমিটারে মাত্র ৮৫ জন মানুষ বাস করতেন। আর এখন বাস করেন ২৪৭ জন। নেদারল্যাণ্ডস ও বেলজিয়ামকে

বাদ দিলে য়ুরোপের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ পশ্চিম-জর্মনী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শুধু পশ্চিম-জর্মনীতেই এক কোটির মতো মানুষ মারা গেছেন। কিন্তু যুদ্ধ থেমে যাবার কিছুকালের মধ্যেই এ দেশের জনসংখ্যা বেড়ে যায়। কারণ পূর্ব-জর্মনী ও প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ শরণার্থী এদেশে চলে আসেন। তাছাড়া যুদ্ধে কর্মক্ষম পুরুষদের অকালমৃত্যুর জন্য এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে বহু শ্রমিক জর্মনীতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৬১ সালে বার্লিন প্রাচীর নির্মাণের পরে পূর্ব-জর্মনী থেকে শরণার্থী আসা বন্ধ হয়। এখন বাইরের শ্রমিক আসাও বন্ধ হয়েছে।

১৯৭৪ সাল থেকে জর্মনীর জনসংখ্যা আর তেমন বাড়তে পারে নি। কারণ পরিবার পরিকল্পনা ও সমাজের বিবর্তনের ফলে এখন এদেশের জন্মহার হাজারে মাত্র ৯.৫ জন। এবং এটি বিশ্বের সবচেয়ে কম জন্মহার।

এবার ভাষার প্রসঙ্গে আসছি। জর্মন ভাষা দশকোটি মানুষের মাতৃভাষা। এ ছাড়া অস্ট্রিয়া, লিচটেনস্টাইন ও সুইজারল্যাণ্ডের সরকারী ভাষা জর্মন। জনপ্রিয়তা, সাহিত্যমূল্য ও আভিজাত্যের বিচারে জর্মন পৃথিবীর তৃতীয় ভাষা, ইংরেজী ও ফরাসীর পরেই এর স্থান। পৃথিবীতে প্রায় দু-কোটি বিদেশী নিয়মিত জর্মন শেখেন।...

—শঙ্কর, উল্‌ম এসে গেল। সহসা গৌর বলে ওঠে।

শঙ্কর কি যেন বলতে যাচ্ছিল আমি তাকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করি উল্‌ম মানে আইনস্টাইনের জন্মস্থান?

—হ্যাঁ। গৌর উত্তর দেয়। তার পরে বলে—শুধু জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের জন্মস্থান বলে নয়, তাকিয়ে দেখো শহরটিও ভারী সুন্দর।

আমি দেখি। সত্যই তাই। নদীর তীরে ভারী সুন্দর শহর। জিজ্ঞেস করি—এটা কোন্ নদী?

—দোনাউ।

—তার মানে দানিউব?

—হ্যাঁ।

আমি আবার দেখি। প্রাণ ভরে দেখি। আমি নদীমাতৃক পূর্ব-বঙ্গের মানুষ। নদীর সঙ্গে আশৈশব সখ্য আমার। দেশ বিভাগের পরেও এ সখ্যের অবসান হয় নি। কেবল কীর্তনখোলা ছেড়ে এসে গঙ্গার তীরে বাসা বেঁধেছি। তারপরে বার বার আমি গঙ্গার উৎস আর সঙ্গমে ছুটে গিয়েছি। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছি। আর আমার জীবন দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে কামনা করেছি, আমার এই মরদেহ যেন গঙ্গাতীরেই পঞ্চভূতে মিশে যায়।

য়ুরোপে এসে রাইনকে দেখে গঙ্গার কথা মনে হয়েছে। এখন দেখা হল দানিউবের সঙ্গে, যে দানিউবের তীরে ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ আলবার্ট আইনস্টাইন প্রথম চোখ মেলেছিলেন, পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন।

আমি সেই দানিউবকে দেখি। প্রাণ ভরে দেখি আর বারবার পূর্ব-য়ুরোপের এই প্রাণধারাকে প্রণাম করি। মনে মনে বলি—দানিউব তুমি গাঙ্গেয় বাংলার এই নগণ্য পর্যটকের বিনম্র প্রণাম গ্রহণ করো।

গৌরের কথায় আমার ভাবনায় ছেদ পড়ে। গৌর বলে—দানিউব এখানে উত্তর প্রবাহিনী। এর পরে পূর্ব প্রবাহিনী হয়ে বোহেমিয়ান ফরেস্ট-কে সিক্ত করে সে চেকোশ্লোভাকিয়া ও রাশিয়া হয়ে কৃষ্ণসাগরে পতিত হয়েছে।

ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার বেগে গাড়ি চলেছে। সুতরাং কয়েক মিনিটের মধ্যেই উল্‌ম আর দানিউব দুই-ই গেল হারিয়ে। এখন আমাদের দু-দিকেই বনাঞ্চল, বাভেরিয়ার নামহীন বন। আমি সেই কাঠ-পেন্সিলের দেশ বাভেরিয়ার বনপথে পথ চলেছি। আমার শৈশব স্বপ্ন সত্য হল।

গৌর বলে—বাভেরিয়ার জর্মন নাম বায়েরন্ (Bayern)।

—আমরা ম্যুনিকের অর্ধেক পথ পার হয়ে এসেছি। তাহলেও ম্যুনিক পৌঁছতে দেরি আছে। কারণ আমরা ডাখাউ হয়ে ম্যুনিক যাবো। ডাখাউ ম্যুনিকের ১৭ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।...

কিন্তু ডাখাউ কিম্বা ম্যুনিক নয়, এমনকি উল্‌ম অথবা দানিউবের কথাও নয়। আমি মনে মনে ভেবে চলি সেই বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের কথা।

আর ঠিক তখুনি জয়া হঠাৎ বলে ওঠে—শঙ্কুদা, একটু আইন-স্টাইনের কথা বলুন না।

কোনরকম প্রস্তাবনা না করেই শুরু করি—উলম্‌ শহরে জন্মলাভ করলেও আলবার্ট ম্যুনিক গিয়ে স্কুলে ভর্তি হলেন। সেখানে কয়েক বছর পড়াশুনা করে চলে গেলেন সুইজারল্যাণ্ডে, আরাউ শহরে। স্কুলের পড়া শেষ করে জুরিখ গিয়ে কলেজে ভর্তি হলেন, গণিত ও পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করলেন। তারপরে ১৯০৫ সালে ছাব্বিশ বছর বয়সে জুরিখ থেকেই ডক্টরেট হলেন। সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী বার্ণ-এর একটা অফিসে বছর চারেক কাজ করে ১৯০৯ সালে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদ লাভ করেন। কিন্তু পরের বছরই প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেন। দু-বছর বাদে ১৯১২ সালে আবার ফিরে গেলেন জুরিখ কিন্তু এক বছর পরেই যোগদান করলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপরে বিশ বছর দেশেই ছিলেন। ম্যুনিকে কাইজার ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ইন্‌স্টিটিউটের ডিরেক্টর ও প্রুসিয়ান বিজ্ঞান আকাদেমীর সমস্য মনোনীত হলেন। ১৯২১ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন।

আইনস্টাইন ছিলেন প্রগতিপন্থী সমাজবাদী। সুতরাং নাৎসি অভ্যুত্থানে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। বুঝতে পারলেন হিটলার বিজ্ঞানের অবদানকে অপব্যবহার করবেন। তার ওপরে তিনি এক-জন ইহুদি। তাই হিটলার চ্যান্সেলার হবার পরেই গভীর দুঃখের সঙ্গে ১৯৩৩ সালেই তাঁকে দেশত্যাগী হতে হল। তিনি চলে গেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটনে, ইন্‌স্টিটিউট অব্‌ এ্যাডভান্সড্‌ স্টাডিজে যোগদান করলেন। সাতাত্তর বছর জীবনের বাকি তেইশ বছর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই অতিবাহিত করেন। ১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল এই মানবতার পূজারী প্রাতঃস্মরণীয় বিজ্ঞানী মহাপ্রয়াণ করেন।

আমি থামতেই জয়া সহাস্যে বলে ওঠে—খুবই ভাল লাগল, শুনতে তবে বড়ই সংক্ষেপ করলেন।

—সংক্ষেপ না করে উপায় কি, তাঁর মহাজীবন যে সীমাহীন সাগরের মতো। সেকথা বলে কি শেষ করা যাবে? আর সে চেষ্টা না করাই কেন? আমরা তাঁর জন্মস্থান দর্শন করে শিক্ষাতীর্থ ও কর্মক্ষেত্র ম্যুনিকের দিকে এগিয়ে চলেছি। আগামীকাল সকালে আমরা তাঁর অপর কর্মক্ষেত্র বার্লিন পৌঁছব, তাই তাঁর মহাজীবনের সামান্য স্মৃতিচারণ করে নিলাম। এখন শঙ্কর আবার শুরু করো।

-আর কি বলব? শঙ্কর মৃদু প্রতিবাদ করে।

-কেন? যুদ্ধের কথা, হিটলারের কথা, কনসেণ্ট্রেশান ক্যাম্পের কথা। গৌর পরামর্শ দেয়।

—সে তো আমরা দেখতেই যাচ্ছি।

—তাহলেও সংক্ষেপে বলো, শঙ্কুদার সুবিধে হবে।

আর আপত্তি না করে শঙ্কর শুরু করে—১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী এ্যাডলফ হিটলার জর্মনীর চ্যান্সেলার হলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্য সব রাজনেতিক দলকে নিষিদ্ধ করে দিলেন, ট্রেড-য়ুনিয়নগুলি ধ্বংস করে ফেললেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হল। মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে কিছুই থাকল না।

চ্যান্সেলার হবার মাত্র পাঁচ সপ্তাহ পরে ১৯৩৩ সালের ১০ই মার্চ হিটলার ডাখাউতে কনসেণ্ট্রেশান ক্যাম্প খুলে ফেললেন। যাঁরাই তাঁর স্বৈরতন্ত্রী শাসনের সামান্যতম প্রতিবাদ করলেন, তাঁদেরই সেখানে কিম্বা পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত অন্য কোন ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হল।

কিন্তু এসব কথা এখন নয়, কারণ আমরা সেই বধ্যভূমি দর্শন করতে যাচ্ছি।...

আমি মাথা নাড়ি। শঙ্কর বলতে থাকে—১৯৩৪ সালে হিণ্ডেনবুর্গের (Hindenburg) মৃত্যুর পরে চ্যান্সেলার হিটলার প্রেসিডেন্ট পদটিও অধিকার করে নিজেকে জর্মনীর ফ্যুরার (Furher) বা

সর্বেসর্বা বলে ঘোষণা করলেন। তিনি তখন দেশের প্রধান শাসক এবং সেনাবাহিনীর প্রধান।

১৯৩৫ সালে জর্মনী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হারানো 'জার' অঞ্চল ফেরৎ পেলো। যুদ্ধের পর থেকে 'লীগ অব্ নেশন' এই অঞ্চল শাসন করছিলেন। ১৯৩৬ সালে জর্মন বাহিনী রাইনল্যাণ্ডের অধিকার গ্রহণ করলেন। ১৯৩৮ সালে অস্ট্রিয়া রাইখে (Reich) যোগদান করলেন এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গ হিটলারকে সুডেটানল্যাণ্ড (Sudetanland) অধিকার করতে দিলেন! যা চায়, তা পেলে, লোভীর লোভ বেড়ে যায়। নরখাদক নরমাংস পেলে আরও বেশি হিংস্র হয়ে ওঠে। হিটলার তা-ই হয়ে উঠলেন। ঐশ্বর্য আর সাম্রাজ্যের মোহে তিনি মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেললেন।

জর্মনীর অর্থনৈতিক অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। একদিকে যুদ্ধ ও পরাজয় আরেক দিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও পুঁজিপতিদের শোষণ। রাজকোষ শূন্য। মুদ্রাস্ফীতির ফলে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস। দেশের সমস্ত সম্পদ গিয়ে সঞ্চিত হয়েছে ধনিকগোষ্ঠীর কোষাগারে। এই গোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিলেন ইহুদি। দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য হিটলার দায়ী করলেন গোটা ইহুদিজাতিকে। খেটে খাওয়া সাধারণ ইহুদিরা যেমন তাঁর রোষবহ্নি থেকে নিস্তার পেলেন না, তেমনি পরিত্রাণ পেলেন না ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার শিক্ষক লেখক অভিনেতা গায়ক ও বিজ্ঞানীরা। আলবার্ট আইনস্টাইনের মতো বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিককে পর্যন্ত দেশত্যাগী হতে হল।

হিটলার সমস্ত ইহুদি জাতটাকেই ধ্বংস করে ফেলবার নিষ্ঠুর নেশায় মেতে উঠলেন। সেই সঙ্গে শক্তিমদে মত্ত হিটলারকে সাম্রাজ্যলিপ্সা অস্থির করে তুলল। তিনি চাইলেন সারা পশ্চিম-য়ুরোপ তাঁর পদানত হোক, সারা পৃথিবী জর্মনীকে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে বরণ করে নিক। তাই ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করলেন। আর তারই ফলে শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

সাড়ে পাঁচ বছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছে। সাড়ে পাঁচ কোটি

মানুষ মরেছে। আহত হয়েছে আর বাস্তু ত্যাগ করেছে তার কয়েক গুণ। সারা য়ুরোপই প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জর্মনী পরাজিত হলেও, তার প্রাথমিক সাফল্য অভূতপূর্ব। সামান্য কিছুদিনের মধ্যেই হিটলার পোলাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, যুগোশ্লাভিয়া এবং গ্রীস অধিকার করে নিয়েছিলেন। জর্মন বাহিনী রাশিয়া আক্রমণ করে মস্কোর উপকণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছিল আর উত্তর আফ্রিকায় প্রায় সুয়েজ খাল পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল।

আমি মাথা নাড়ি। শঙ্কর বলে চলে—এদিকে ১৯৪২ সালে হিটলার তাঁর ইহুদি সমস্যার শেষ সমাধানে মনযোগী হলেন। ঐতিহাসিকদের ভাষায়—'Final solution of the Jewish question'.

মৃত্যুপথযাত্রী অসহায় ইহুদিদের অন্তিম প্রার্থনা বুঝিবা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের কানে পৌঁছে থাকবে। কারণ এই ১৯৪২ সাল থেকেই যুদ্ধের চাকা ঘুরতে শুরু করল।

ধীরে ধীরে জর্মনীর ভেতরেও হিটলারের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হয়ে উঠল। সেনাবাহিনীর মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দিল। ১৯৪৪ সালের ২০শে জুলাই সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসারের নেতৃত্বে এক ব্যর্থ বিদ্রোহ সংগঠিত হল। অল্পের জন্য হিটলার এক প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণের কবল থেকে রক্ষা পেলেন। তাঁর প্রতি সেনাবাহিনীর এই আনুগত্যহীনতায় হিটলার খুবই ক্ষেপে গেলেন। চার হাজার মানুষকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। কিন্তু জনসাধারণের অসন্তোষ প্রশমিত হল না।

ততদিনে কিন্তু জর্মনী কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। একদিকে বৃটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের মিলিত বাহিনী আরেকদিকে রাশিয়া। অবশেষে বার্লিনের পতন ঘটল। তার আগেই ১৯৪৫ সালের ৩০শে এপ্রিল আত্মহত্যা করে হিটলার তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হয়েও জর্মনীকে বিশ্বইতিহাসের শোচনীয়তম

পরাজয় বরণ করতে হল। দেশের সমস্ত শহর বিধ্বস্ত এক চতুর্থাংশ বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত। পরিবহণ ব্যবস্থা অচল, অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত। কোটি মানুষ মৃত, কোটি কোটি গৃহহীন। লক্ষ মানুষ বন্দী, লক্ষ লক্ষ দেশত্যাগী। তখন সবাই মনে করেছিলেন, জর্মনীর আর ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই।

তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ খনরাড আডেনাউর্ (Konrad Adenaur) তখন পরপদানত ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের দায়ভার গ্রহণ করলেন। চোদ্দ বছর প্রাণপাত পরিশ্রম করে এই কর্মবীর যুদ্ধের যাবতীয় ক্ষত ধুয়ে-মুছে সাফ করে উন্নতির পথ মুক্ত করে দিয়ে গেলেন। ফলে চল্লিশ বছরের মধ্যে পশ্চিম-জর্মনী আবার জগৎসভায় নিজের আসন অধিকার করে নিয়েছে। এখন সে বিশ্বের সমৃদ্ধতম দেশগুলির অন্যতম।

থামল শঙ্কর। আমি ওর দিকে তাকাই। সে বলে—এখন আর ইতিহাসের কথা নয়। আউগ্‌সবুর্গ (Augsburg) এসে গেল। একটু দেখে নিন।

আমি দেখি। পথের ডানদিকে বেশ খানিকটা দূরে শহর অউগ্‌সবুর্গ। আগেই বলেছি, অটোবান কখনো শহরে প্রবেশ করে না, বাইরে দিয়ে চলে যায়। শহরে ঢোকার জন্য ভিন্ন পথ থাকে।

আমরা দূর থেকে আউগ্‌সবুর্গকে দেখি আর পেরিয়ে আসি একটি নদী। নাম লেশ (Lech), দানিউবের শাখানদী।

দানিউব ইতিমধ্যে আমাদের বাঁয়ে অর্থাৎ উত্তরে চলে গিয়েছে। লিশ সেই দানিউব থেকে সৃষ্ট হয়ে দক্ষিণবাহিণী হয়ে সুইজারল্যাণ্ডের দিকে চলে গেল। তারই তীরে ছবির মতো সুন্দর শহর আউগ্‌সবুর্গ।

আউগ্‌সবুর্গ পড়ে থাকে পেছনে, আমরা চলি এগিয়ে। আগেই বলেছি, সেই অটোবানটি ম্যুনিক হয়ে অস্ট্রিয়া চলে গেছে। তাহলেও আমরা এখন ম্যুনিক পর্যন্ত যাবো না। তার আগেই আরেকটি পথ ধরে পৌছব ডাখাউ।

॥ তেরো ॥

বেলা পৌনে এগারোটার সময় আমরা ডাখাউ শহরে প্রবেশ করলাম। তার মানে লাইফহাইম থেকে ডাখাউ আসতে ঠিক এক-ঘণ্টা লাগল।

ছোট ও সাধারণ জর্মন শহর গত কয়েকদিন ধরে আমরা বোধকরি প্রতি ঘণ্টায় একটি করে এমন শহরে পদার্পণ করছি। তবু এই শহরে এসে কেমন যেন গা ছমছম করছে। একটা ভয়ঙ্কর অনুভূতি হচ্ছে। অথচ সুন্দর শহর। পথের পাশে সেই সারি সারি গাছ আর বাড়ি-ঘর। মোটেই ঘনবসতি নয়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বাড়ি-গুলিও নয় তেমন বড়-বড়।

শঙ্কর বলে—১৯৬৯ সালে জনসংখ্যা ছিল ৩৩,০৯৩ জন। এবং বিগত ষোলো/সতেরো বছরে বোধকরি তা বেড়ে হাজার পঁয়ত্রিশ হয়েছে। টুরিস্ট অবশ্য প্রচুর আসেন, সারা বছর ধরেই আসেন। এবং তাঁরা প্রায় সবাই বিদেশী। জর্মন টুরিস্টরা বড় একটা আসেন না এ শহরে। কারণ এখানে দর্শনীয় স্থান বলতে কনসেণ্টেশান ক্যাম্প। সেটি জর্মন ইতিহাসের কলঙ্ক। সুতরাং জাত্যভিমানী জর্মনরা বেড়াতে আসেন না এখানে।

পাশের পাহাড়টার চূড়ায় অবশ্য ভিটেলস্‌বাখের (Wittelsbacher) নামে একটি প্রাচীন দুর্গ ও ১৬২৫ সালের একটি প্যারিশ চার্চ রয়েছে। কিন্তু কেবল সে দুটির আকর্ষণে কোন পর্যটক এখানে আসেন না।

শঙ্কর থামতেই গৌর বলে—ডাখাউ ছোট শহর হলেও এখানে বেশ কয়েকটি বড় কারখানা রয়েছে। তার মধ্যে কাগজের কল ও ইলেক্ট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানাই বেশি। আগে সামরিক সম্ভার তৈরির কারখানাটিও উল্লেখযোগ্য ছিল। কিন্তু হিটলার সে-

টিকেই কনসেণ্টেশান ক্যাম্পে রূপান্তরিত করেন। আর তারপরেই মানে সেই ১৯৩৪ সালে ডাখাউকে শহরের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

শহরের বাড়ি-ঘর ও কল-কারখানা ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলেছে। আমি ভয়ে ভয়ে দেখছি আর শুনছি। গৌর বলছে—এই শহরটা যে বাভেরিয়ার অন্তর্গত, তা তুমি জানো শঙ্কুদা?

—হ্যাঁ। আমরা তো গতকাল বিকেলেই বাভেরিয়ায় পৌঁছে গিয়েছি।

—এগজাক্টলী। এবং আজ সারাদিন আমরা বাভেরিয়াতে ভ্রমণ করব। রাতে তোমরা বাভেরিয়া থেকেই ইস্ট-জর্মনীতে ঢুকবে। কিন্তু বাভেরিয়ার কথা পরে হবে, এখন ডাখাউ সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা বলে নিই।

আমি মাথা নাড়ি। গৌর বলতে থাকে—ম্যুনশেন বা মুনিক হল বাভেরিয়ার রাজধানী। ম্যুন্‌শেনের মাত্র ১৭ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এই শহর।

—মাত্র ১৭ কিলোমিটার! আমি বলে উঠি।—তাহলে তো আমরা ম্যুন্‌শেন এসে গেলাম!

—হ্যাঁ। গৌর জবাব দেয়। তারপরে আবার বলতে থাকে—১৯১৭ সালে মানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে সেই সামরিক সম্ভার তৈরির কারখানাটি স্থাপিত হয়েছিল। সেই থেকে সেটি তার কাজ করে যাচ্ছিল। কিন্তু চ্যান্সেলার হবার মাত্র পাঁচমাস পরেই হিটলার সেই কারখানা বন্ধ করে দিয়ে কারখানার বাড়িগুলোতেই জর্মনীর প্রথম কন্‌সেণ্টেশান ক্যাম্প শুরু করলেন। ব্যাপারটায় এমন গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছিল যে ডাখাউ শহরের অধিবাসীরাও জানতেন না যে তাঁদের শহরে এমন একটি নরক গড়ে তোলা হয়েছে। তাঁরা শুধু দেখতেন, গাড়ি আসছে আর যাচ্ছে, সদর দরজাটা খুলে যাচ্ছে আর বন্ধ হচ্ছে।

—আমি শুনেছি দাদা, ডাখাউ কেবল বন্দী শিবির কিম্বা বধ্য-ভূমি ছিল না। এস. এস. (Schutzstaffel) অর্থাৎ ফ্যুরারের

নিজস্ব বাহিনী, যারা এইসব শিবিরে অমানুষিক তাণ্ডব চালাতো, তাদের নাকি এখানেই ট্রেনিং দেওয়া হত? জয়া জিজ্ঞেস করে।

গৌর উত্তর দেয়—তুমি ঠিকই শুনেছো। চ্যান্সেলার হবার পর থেকে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পূর্ব পর্যন্ত দক্ষিণ জর্মনী, পোলাণ্ড, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়াতে হিটলার প্রায় দেড়শো বন্দীশিবিরে খুলেছিলেন। সেগুলির অধিকাংশই এখান থেকে শাসিত হত। শুধু তাই নয়, মধ্য এবং উত্তর-জর্মনীর বন্দীশিবির শিজেন-হাউসেন (Schsenhausen) এবং বুখেনভাল্ড প্রভৃতি শিবির পরিচালনার নির্দেশও এখান থেকেই দেওয়া হত।

একবার থামে গৌর। তারপরে আবার শুরু করে—ডাখাউ-য়ের বিস্তৃত ইতিহাস আজও জানা যায় নি। কোনদিন বোধকরি জানা যাবে না।

—কেন বলুন তো? জয়া মাঝখান থেকে জিজ্ঞেস করে।

—প্রথমত ইতিহাস রাখা হয় নি। দ্বিতীয়ত কাগজপত্র যা কিছু ছিল, তা প্রায় সবই পালিয়ে যাবার আগে এস. এস. সৈন্যরা নষ্ট করে গেছে। তবু যতটা খবর পাওয়া গিয়েছে, তাতে জানা যায়, এই ডাখাউ শিবিরে অন্তত আড়াই লক্ষ বন্দী এসেছে তার মধ্যে নব্বই হাজারকে অন্যান্য শাখা শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার মানে ১,৬০,০০০ বন্দী এখানে বছরের পর বছর ধরে অমানুষিক নির্যাতন সয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত ৩২,০০০ মারা গিয়েছেন।...

—মারা গিয়েছেন বলছেন কেন দাদা! বলুন মেরে ফেলা হয়েছে। জয়া প্রতিবাদ করে।

গৌর মাথা নেড়ে বলে—ব্যাপারটা সত্যই তাই। কারণ এঁদের মধ্যে যাঁদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, তাঁরাও মারা গেছেন অনাহার, অপুষ্টি, অসুখ ও চিকিৎসার অভাবে, নিরাশা ভয় এবং দৈহিক নিপীড়নের জন্য।

থামে গৌর। আমি ওর দিকে তাকাই। না, সে নিজেই

আবার বলে—কিন্তু এই আড়াই লক্ষ কিম্বা বত্রিশ হাজার হিসেবটাই সব নয়। এই হিসেবের বাইরে যে সংখ্যাটি আছে সেটা অনেক বড়।

—মানে ?

—মানে, খাতা-পত্তর যতটুকু পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় আড়াই লক্ষ বন্দী এই শিবিরে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে বত্রিশ হাজার মারা গিয়েছেন। কিন্তু আসল সত্য হল, খাতাপত্তরে না লিখে তার কয়েকগুণ বন্দীকে এখানে এনে মেরে ফেলা হয়েছে। আর তার বহুগুণকে হত্যা করা হয়েছে পোল্যাণ্ডের আশ্বিৎস (Aschwitz) নামে একটা জায়গায়।

—আশ্বিৎস শিবির কি এর চেয়ে বড় ছিল ?

—নিশ্চয়ই। তবে সেটাকে শিবির না বলে বধ্যভূমি বলাই উচিত হবে। আমি সেখানে যাই নি, তবে শুনেছি পোল্যাণ্ডের সুন্দর শহর ক্রাকো থেকে ৭৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই জায়গাটি ছিল এক বনময় গ্রাম। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে সেখানে ৪০ লক্ষ ইহুদি এবং ৫ লক্ষ পোলিশ ও রাশিয়ান যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা হয়েছে।

—৪০ লক্ষ শুধু ইহুদি মারা হয়েছিল! তখন য়ুরোপে কত ইহুদি ছিলেন ? জয়া জিজ্ঞেস করে।

গৌর উত্তর দেয়—৯০ লক্ষ। তাঁরা অধিকাংশই জর্মনী অথবা হিটলারের অধিকৃত দেশসমূহে বাস করতেন। হিটলার তাঁদের ৬০ লক্ষকেই মেরে ফেলেছিলেন।

—তার মানে বর্তমান ইজরাইলের জনসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ! আমি আঁতকে উঠি।

গৌর মাথা নাড়ে। বলে—আশ্বিৎস ছাড়াও অন্যান্য শিবিরে যেমন এই ডাখাউ এবং বুখেনভাল্ড, টেব্লিনকা প্রভৃতি বন্দী শিবিরেও লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছে।...

আবার সেই প্রশ্নটা আমার মনে জেগে ওঠে, পাঁচ বছর ষাট মাসে ষাট লক্ষ লোককে অর্থাৎ প্রতি মাসে এক লক্ষ মানুষকে মেরে

ফেলা হয়েছে। তাহলে কত গ্যাস-চেম্বার আর ফার্নেস বানাতে হয়েছিল? কত মানুষকে নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল সেই কবাই-এর দল? আর আমরা, যারা নিজেদের সভ্যমানুষ বলে পরিচয় দিই, তারা কি জগতের হিংস্রতম ও নিষ্ঠুরতম প্রাণী নই?

কিন্তু থাক্‌গে এসব কথা। ডাখাউ এসেছি, ডাখাউ-এর কথাই শোনা যাক। গৌর বলছে—এখানে ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকরা মানুষকে গিনিপিগ (Guinea-pig) করে মনুষ্যদেহের ওপরে নানা পরীক্ষা চালাতেন।

—যেমন?

—মনুষ্যদেহের ওপরে আকস্মিক আবহাওয়ার চাপ হ্রাস ও বৃদ্ধির প্রভাব, বরফ ও শীতের প্রভাব। বন্দীদের দেহে ম্যালেরিয়া ও নানা সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু ইঞ্জেকশন করে তারপরে তাঁদের ওপরে গবেষণারত ওষুধের পরীক্ষা এবং সমুদ্রের জল পান করার পরিণতি প্রভৃতি নানা পরীক্ষা করা হয়েছে এখানে।

—সেইসব ডাক্তার ও বিজ্ঞানীদের শাস্তি দেওয়া হয় নি?

—সবাইকে শাস্তি দেবার প্রশ্ন ওঠে নি। কারণ তাঁদের অনেকেই ইহুদি অথবা যুদ্ধবন্দী। রিভলবার পিঠে ঠেকিয়ে তাঁদের পরীক্ষা করতে বাধ্য করা হত। তবে যাঁরা জর্মন ও নাৎসি দলের সদস্য ছিলেন, নুর্ণবের্গ (Nurnberg) শহরে তাঁদের বিচার হয়েছে। "ডক্টরস' ট্রায়াল" নামে সে বিচার বিখ্যাত হয়ে আছে।

—বিচারের কি ফল হয়েছে?

—সাতজন ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।...

হঠাৎ থেমে যায় গৌর। তারপরে বলে ওঠে—আমরা কনসে-ণ্ট্রেশান ক্যাম্পের কাছে পৌঁছে গিয়েছি। এখানে গাড়ি রেখে বাকি পথটুকু হেঁটে যেতে হবে।

গৌর গাড়ি থামিয়েছে। এটাই কার-পার্ক। আমরা গাড়ি থেকে নেমে আসি।

বাঁধানো পথ দিয়ে হেঁটে চলি। পথের পাশে ডানদিকে প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড—

'Besuchen Sie Dachau den
1200 jahrigen Kunstlers
mit Schloss garten und
einmaligem Femblick'

জয়া অনুবাদ করে বলে—বারো শ' বছরের প্রাচীন তুর্গ সহ শিল্প-কেন্দ্র। তুর্গ এবং তাকে ঘিরে গড়ে তোলা মনোরম পার্ক থেকে চারিদিকের অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শন করুন।

বোধকরি দর্শনার্থীদের বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে এখানে কেবল বন্দী-শিবিরটাই একমাত্র দ্রষ্টব্যস্থল নয়, সামনের ঐ টিলার ওপরে অমূল্য চিত্রসম্পদে সুসজ্জিত সুপ্রাচীন তুর্গ এবং চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অবশ্যই দর্শনীয়।

কিন্তু এই প্রচারে কর্তৃপক্ষ কতখানি তাঁদের জাতীয়-কলঙ্ক গোপন করতে সক্ষম হচ্ছেন, তা বুঝতে পারছি না। কারণ কেউই টিলার দিকে যাচ্ছেন না, সবাই এগিয়ে চলেছেন বন্দীশিবিরের দিকে। আমরাও তাঁদের অনুসরণ করি।

এ পথটিও বাঁধানো, বেশ প্রশস্ত। তবু এখানে গাড়ি চলতে দেওয়া হয় না। পথের পাশে ফুলের বাগান, নানা রকমের নানা রঙের ফুল ফুটে আছে।

বাগান পেরিয়ে এসে একফালি বাঁধানো অঙ্গন। অঙ্গনের শেষে লোহার গেট। বেশ বড়। পাশাপাশি তুটি একতলা বড়-বাস যাতায়াত করতে পারে। খুবই স্বাভাবিক। লক্ষ লক্ষ বন্দীকে তো গাড়ি করেই ভেতরে নিয়ে যাওয়া হত।

গেটের তুদিকে উঁচু পাঁচিল। ডানপাশের পাঁচিলে গেটের অদূরে একটা বড় জানলা। তাতে তু-প্রস্ত লোহার গরাদ। বোধকরি কেউ এসে গেট খুলতে বললে আগে তাকে জানলা দিয়ে দেখে নেওয়া হত। দেখার আরও জায়গা রয়েছে, উঁচু ও চওড়া পাঁচিলের ওপরে

তিনটি 'ওয়াচ-টাওয়ার' বা প্রাচীর চৌকি।

আমরা গেট পেরিয়ে ভেতরে আসি। বিরাট এলাকা জুড়ে শিবির, চারিদিকেই উঁচু পাঁচিল। গেটের পরে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা, বাঁধানো। বোধকরি গাড়ি দাঁড় করিয়ে বন্দী নামানোর জন্য। জায়গাটার বাঁয়ে লোহার তারের উঁচু বেড়া, ডানদিকে শিবিরের পাঁচিল আর সামনে শিবিরের সবচেয়ে লম্বা বাড়িটার দেওয়াল, এটা পেছন দিক। দেয়ালে একটা বেশ বড় টিনের বোর্ডে একখানি নকশা। ওপরে ইংরেজীতে লেখা—

'Plan of the Dachau Concentration Camp

(Now Concentration Camp Memorial).

সেকালের শ্মশান-শিবির একালে শুধুই স্মারক—মনুষ্য সভ্যতার বর্বরতম অধ্যায়ের স্মারক।

আগেই বলেছি, সামনের বাড়িটাই সবচেয়ে বড়। লম্বা একতলা বাড়ি। আমাদের গাঁয়ের স্কুলের মতো। টালির চাল, ইটের দেওয়াল আর সামনে খোলা বারান্দা। সারা দেওয়াল জুড়ে বড়-বড় জানলা। বলা বাহুল্য লোহার গরাদ দেওয়া। এটা বাড়িটার পেছন দিক। এদিকে বাড়ির সঙ্গে আরেকটা পাঁচিল রয়েছে, বাইরের পাঁচিলের প্রায় অর্ধেক উঁচু হবে। তাহলেও ডিঙিয়ে আসা বেশ কঠিন।

বাঁধানো জায়গার শেষে ডানদিকে আরেকটা গেট। সেই গেট পার হয়ে আমরা শিবিরের ভেতরে আসি। বড় বাড়িটার পরে আরও অনেকগুলি বাড়ি। তেমনি টালির চাল আর ইটের দেওয়াল, তেমনি স্কুলবাড়ির মতো লম্বা গড়ন। এবং এ বাড়িগুলিও ছোট নয়, বেশ বড় বড়। বড় বাড়িটার সামনে আড়াআড়ি ভাবে সমান্তরাল করে তৈরি। দুটি বাড়ির মাঝে একফালি করে উঠোন। উঠোনগুলি আগে কি কাজে লাগানো হত জানি না। এখন ফুলের বাগান।

আমরা 'মেন ব্লক' তার মানে বড় বাড়িটার বারান্দায় উঠে আসি। কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করি। সঙ্গে সঙ্গে সহসা সারা

শরীর শিউরে ওঠে, শ্মশানের সেই পরিচিত গন্ধটা নাকে আসে। কিন্তু কথাটা বলতে পারি না কাউকে। চল্লিশ বছর বসে কত অসংখ্যবার কতরকম ওষুধপত্র দিয়ে নানা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা হয়েছে এ বাড়িটাকে। আজও কি এখানে সেই মানুষ-পোড়া গন্ধ থাকতে পারে?

জানি যুক্তি দিয়ে এ গন্ধের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারব না। তবু বলব আমি আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে সেই শ্মশানগন্ধ অনুভব করছি।

কেনই বা করব না? যে বন্দীশিবিরে বারো বছর ধরে প্রতিদিন শত শত মানুষ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, সেখান থেকে শ্মশানের গন্ধ কি চল্লিশ বছরে মুছে ফেলা যায়? মনে পড়ছে কয়েকদিন আগের কথা। আমার ফরাসী বোন গাব্রিয়েল এবং তার মা ও বোনের সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের একটি গির্জা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটা ঘরে স্তূপীকৃত মানুষের অস্থি দেখে চমকে উঠেছিলাম। গাব্রিয়েলের বোন এলেন বলেছিল—চেঙ্গিজ খাঁন তোমাদের দেশের মতো এখানেও হত্যালীলা চালিয়েছে। সে এসেছিল আঙুর সমৃদ্ধ এই সুন্দর উপত্যকা লুঠ করতে। তার সৈন্যরা হাজার হাজার নর-নারীকে হত্যা করেছে। তাদেরই কয়েকজনের অস্থি ও কঙ্কাল এখানে রেখে দেওয়া হয়েছে।*

সেদিন আমার ভ্রমণের সব আনন্দ মুছে গিয়েছিল। আর আজ? এখানে যা হয়েছে তার তুলনায় চেঙ্গিজ খান তো কিছুই করেন নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে চেঙ্গিজ যা করেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে হিটলার তার হাজার হাজার গুণ নিষ্ঠুর কাজ করেছেন। তাহলে কি সাত শতাব্দী ধরে সভ্যতার কোন অগ্রগতি হয় নি?

নিশ্চয়ই হয়েছে। জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে আমরা অভূতপূর্ব অগ্রগতি লাভ করেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে মানবতার অবনতি ঘটেছে,

* লেখকের 'এক ফরাসী নগরে' বইখানি দ্রষ্টব্য।

মনুষ্যত্ব মুছে গিয়েছে এই সুসভ্য মনুষ্যসমাজ থেকে।

তবু আমি সহযাত্রীদের সঙ্গে এগিয়ে চলি। আমি যে পথিক। পথচলা বন্ধ করার উপায় নেই আমার। লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের কান্নায় আজও যেখানে বাতাস ভারী হয়ে আছে, আমি সেখানে এগিয়ে চলি। হাজার হাজার অতৃপ্ত আত্মার দীর্ঘনিঃশ্বাস যেখানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, আমি সেখানে এগিয়ে চলি। দেখি সেই গ্যাস-চেম্বার্স আর ফার্নেস। 'সাইক্লন-বি' গ্যাস দিয়ে মানুষগুলোকে মেরে তাদের দেহ ঐ চুল্লির ভেতরে ফেলে দেওয়া হত। চুল্লির চিমনি দিয়ে যে ধোঁয়া বের হত, তা দেখে ডাখাউবাসীরা কোনদিন কল্পনাও করেন নি, ওটা মানুষ পোড়াবার ধোঁয়া। তাঁরা জানতেন এটা সমরাস্ত্র তৈরির কারখানা।

সহসা শঙ্কর বলে ওঠে—৬ কিলো সাইক্লন-বি ট্যাবলেট থেকে যে গ্যাস হত, তা দিয়ে ১৫০০ মানুষ মারা যেত। এর এক-একটি শিবিরে হাজার হাজার কিলোগ্রাম সাইক্লন-বি ট্যাবলেট খরচ হয়েছে।

—আর ফার্নেস? জয়া জিজ্ঞেস করে।

শঙ্কর উত্তর দেয়—এর একটা ফার্নেসে দৈনিক শতাধিক দেহ দাহ করা যেত।

কিন্তু তার জন্য কত কয়লা লাগত সেকথা বলতে পারে না শঙ্কর। আমারও জানা নেই কথাটা। আমি কেবল জানি যে সস্ত্রীক হিটলারকে দাহ করতে ১৮০ লিটার পেট্রোল লেগেছিল।

গ্যাস-চেম্বার্স ও ফার্নেস দেখে বেরিয়ে এলাম মেন-ব্লক থেকে। একটুকরো বাগান পেরিয়ে অন্য ব্লকে এলাম। অপেক্ষাকৃত ছোট ব্লক। শঙ্কর বলে—এটা মিউজিয়াম।

আমরা ভেতরে আসি। দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে সেকালের কিছু ছবি ও পোস্টার। জর্মন না জানায় পোস্টারের লেখা পড়তে পারি না, কেবল ছবিগুলো দেখি। আর তা দেখে বারবার শিউরে উঠি। হাড়সর্বস্ব মানুষের মিছিল। মানুষ না বলে বোধকরি জীবন্ত-কঙ্কাল বলাই ঠিক হবে।

মিউজিয়াম ব্লকের একাংশ জুড়ে ছোট একটি অডিটোরিয়াম। শ'খানেক দর্শক বসতে পারেন। শঙ্কর বলে—বসে পড়ুন। এখুনি একটা ডকুমেন্টারী দেখাবে। ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট ছবি, সঙ্গে ইংরেজী ধারাভাষ্য। ঠিক সময় এসে পৌঁছেছি, আমাদের ভাগ্য ভাল!

কিন্তু সত্যই কি তাই?

কয়েক মিনিট বাদে ছবি আরম্ভ হয়। এই বন্দীশিবিরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। মানুষের অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সামান্য কিছু নজির। দেখতে দেখতে চোখে জল এসে যায়। তবু দেখি—

১৯৪৫ সালের ২৯শে এপ্রিল। তখনও হিটলার আত্মহত্যা করেন নি। জর্মনী করে নি আত্মসমর্পণ। তবে তার ছ'দিন আগেই লালফৌজ বার্লিনে প্রবেশ করেছে। বৃটেন ফ্রান্স ও আমেরিকান বাহিনীও দেশের উত্তর দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল দিয়ে ঝড়ের বেগে বার্লিনের দিকে এগিয়ে চলেছে। ১৯শে এপ্রিল আমেরিকান বাহিনী লাইপ-জিগ দখল করেছে। আর তার ঠিক আগের দিন মানে ২৮শে এপ্রিল মুসোলিনী নিহত হয়েছেন।

কিন্তু কারাপ্রাচীরের অন্তরালে মৃত্যুর প্রতীক্ষারত মানুষগুলোর কাছে এসব খবর পৌঁছয় নি। তাঁরা কেবল কয়েকদিন ধরে কামানের গর্জন আর বোমার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন। সে-সব শব্দও সহসা থেমে গিয়েছে। বাইরের জগতে কি হচ্ছে, তাঁরা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না।

সেদিন সকালে হঠাৎ তাঁরা দেখতে পেলেন যে, এস. এস. সহ শিবিরের সব কর্মচারীরাই উধাও। বন্দী হবার পর থেকেই তাঁরা বেঁচে থাকার মতো খাবার পান নি। খাবার বলতে দুপুরে একমগ সুপ আর রাতে কয়েকটুকরো রুটি ও জল। এই খেয়েই ধুকতে ধুকতে বেঁচেছিলেন মানুষগুলো। সেদিন তাও পাওয়া গেল না। তার ওপরে সেদিন সকাল থেকে কলের জলও গেল বন্ধ হয়ে। বাইরে বেরুতে পারলে হয়তো কিছু পাওয়া যেতো। কিন্তু প্রহরী না থাকলেও বাইরে বেরুবার উপায় নেই। শিবির ছেড়ে চলে যাবার

সময় ওরা সদব দরজায় বড়-বড় তালা লাগিয়ে রেখে গেছে।

মৃতপুরীর মতো পড়ে ছিল বন্দী শিবিরটা। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর দুর্বল মানুষগুলো ধুকতে ধুকতে ভাবছিলেন, কি করা যায়?

অনেক আলাপ-আলোচনা ও ভাবনা-চিন্তার পরে তাঁরা স্থির করলেন, একবার বাইরের জগতের খবর নিতে হবে। কিন্তু কি করে? ফটকে তালা, তিন মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল। এমনকি চৌকি তিনটিতে ওঠার সিঁড়িঘরগুলো পর্যন্ত বন্ধ।

কিন্তু প্রাণের মায়ায় মানুষ জগতে কত অসাধ্য সাধন করেছে। তাছাড়া এখানে বসে অনাহারে তিল তিল করে মরার চাইতে মুক্ত হবার চেষ্টা করে গুলি খাওয়া অনেক ভাল। আর এখানে এভাবে বেঁচে থাকাব চেয়ে মরে যাওয়া যে বেশি শান্তির।

কিন্তু ফটক ভাঙা তো সহজ কাজ নয়। আর কি দিয়েই বা ভাঙবে? অনেক খোঁজাখুজির পরে একটা বেলচা ও একখানি গাঁইতি পাওয়া গেল। তাই দিয়েই ফটক ভাঙার চেষ্টা চলল বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী দুর্বল মানুষগুলোর সেই চেষ্টায় কি এমন শক্ত লোহার ফটক ভেঙে ফেলা সম্ভব?

অসম্ভব সম্ভব হল না। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা নিশ্চিত হলেন যে এস. এস. এবং বন্দীনিবাসের অন্যান্য কর্মচারীরা কেউ কাছাকাছি নেই, সবাই পালিয়েছে। না হলে, তারা ফটক ভাঙার চেষ্টায় বাধা দিত।

সে তো না হয় হল. কিন্তু এখন কি করা যায়। আবার চিন্তা-ভাবনা, আবার শলা-পরামর্শ। তাবপরে ঠিক হল দেওয়ালের ওপরে উঠতে হবে। তাহলে যেমন বাইরের অবস্থাটা জানা যাবে, তেমনি মুক্তির চেষ্টাও করা যাবে।

কিন্তু কেমন করে অত উঁচু পাঁচিলের ওপরে ওঠা যাবে আর কেই বা উঠবে? অত্যাচারিত আর অভুক্ত মানুষগুলোর যে ঠিকমত দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত নেই।

তাহলেও চেষ্টা করতে হবে। অপেক্ষাকৃত সুস্থ তিনজন যুবক

এসে দাঁড়ালেন দেওয়ালের ধারে। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পরে একজনকে কাঁধে নিয়ে আরেকজন উঠে দাঁড়ালেন। তারপরে আবার কিছুক্ষণ চেষ্টা করে তাদের কাঁধে নিয়ে দেওয়াল ধরে আরেকজন উঠে দাঁড়ালেন কোনমতে। ব্যস। ওপরের মানুষটা পাঁচিলের ওপর দিকটা হাতে পেলেন। হাতের ভড় করে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে তিনি কোনমতে উঠে বসলেন দেওয়ালের ওপরে। সমবেত বন্দীরা আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন।

ওপরে মানুষটা কয়েক বছর পরে বাইরের পৃথিবী দেখতে পেলেন। আর সেকথা তিনি সোচ্চার স্বরে সঙ্গীদের জানাতে থাকলেন। সেই সঙ্গে জানালেন বাইরে কোথাও কারাকর্মী কিম্বা এস এস দেখতে পাচ্ছেন না। আবার উল্লাস।

কিন্তু কাছাকাছি কোন মানুষজনও নেই যে! থাকবে কেমন করে? শিবিরটা শহরের সীমারেখা ছাড়িয়ে। আর কারখানার নিরাপত্তার নাম করে নাগরিকদের আসতেও দেওয়া হত না এদিকে।

কাছাকাছি কোন মানুষ না থাকলেও শহরের প্রধান পথে মানুষ দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে গাড়ি—মিলিটারী কনভয়। গাড়ি চলার শব্দও কানে আসছে। শুধু তাই নয়, ভাল করে লক্ষ্য করে মানুষটি দেখতে পেলেন, গাড়িগুলোর সামনে জর্মন নয় আমেরিকান পতাকা—রেখা ও তার।...

মানুষটা দেওয়ালের ওপর থেকে বেতার ঘোষকের মতো বলে যাচ্ছিলেন কথাগুলো। আর সেই কথা শুনে নিচের মানুষগুলো আবার উল্লাসে ফেটে পড়লেন। তাহলে তো হিটলার-হিমলার পরাজিত—রাশিয়া বৃটিশ ফরাসী আর আমেরিকানরা এসে গিয়েছেন! তারা তাঁদের মুক্ত করবেন। ওঁরা চিৎকার করে ওঠেন—তুমি চিৎকার করো। তোমাকে দেখতে পেলেই আমেরিকানরা এখানে আসবে। আমাদের মুক্ত করবে, খেতে দেবে।

মানুষটা চিৎকার করে।

কিন্তু সামান্যই শব্দ বের হয়। কি করবে? একজন অভুক্ত মানুষ আর কতজোরে চেঁচাতে পারে?

—তুমি গায়ের জামা খুলে তাই উড়িয়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করো।

মানুষটা তাই করতে থাকেন। সময় বয়ে চলে। অধৈর্য মানুষ-গুলো অস্থির হয়ে ওঠেন। কিন্তু কাজ কিছুই হয় না।

তবে তাঁরা বুঝতে পারেন, একা চিৎকার করে ওঁর পক্ষে অত দূরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং ওঁকে সাহায্য করা দবকার। যেভাবেই হোক দূরের ঐ গাড়িগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। নইলে তাঁরা মুক্তি পাবেন না, খেতে পাবেন না।

অতএব একই ভাবে আরও কয়েকজন উঠে গেলেন দেওয়ালের ওপরে। আর গলায় জোর নেই বলে তাঁরা থালা বাটি গ্লাস হাতে নিয়ে ওপরে ওঠলেন। উঠেই সেগুলো বাজিয়ে চিৎকার করতে থাকলেন। মানুষের জন্য মানুষের আর্ত আহ্বান।

সাড়া মিলল। আমেরিকান কনভয় দিক পরিবর্তন করল। তাদের সঙ্গে ছুটে এলেন কিছু নাগরিক। ওঁরা দেওয়ালের ওপর থেকে নিজেদের দুরবস্থার কথা জানালেন অশ্রুসিক্ত স্বরে।

বুলডোজার চালিয়ে বন্দীনিবাসের লোহার ফটক ভেঙে ফেলা হল। বন্দীরা মুক্ত হলেন। অভুক্ত মানুষগুলো খেতে পেলেন। মৃত-প্রায় মানুষগুলো বেঁচে উঠলেন। আর সেই সঙ্গে শেষ হল মনুষ্য সভ্যতার নিষ্ঠুরতম কলঙ্কের ইতিহাস!

॥ চৌদ্দ ॥

ছবি শেষ হয়ে যায়। আলো জ্বলে ওঠে। দর্শকরা তবু নির্বাক নিশ্চল। আমিও তাদেরই একজন। কেমন যেন বিভ্রান্ত বোধ করছি। মানুষ কি সত্যই বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী? বোধকরি নয়। নইলে কেমন করে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের ওপরে

এমন নিষ্ঠুর হতে পারে? এমন বর্বর হতে পারে, এমন পৈশাচিক আচরণ করতে পারে? এযে পশুর পক্ষেও সম্ভব নয়। তাহলে কি মানুষ জগতের নিষ্ঠুরতম পশু, বর্বরতম জানোয়ার?

সবার সঙ্গে আমারও সম্বিত ফিরে আসে। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াই। বেরিয়ে আসি অডিটোরিয়াম থেকে। সহযাত্রীদের সঙ্গে হাঁটতে থাকি। জানি না কোথায় চলেছি?

আগেই বলেছি বিরাট এলাকা নিয়ে বন্দীশিবির। অধিকাংশ জায়গা জুড়েই বড়-বড় বাড়ি। বাড়িগুলোর গড়ন প্রায় একই রকম—টালির চাল, ইটের দেওয়াল, সামনে খোলা বারান্দা। সবই একতলা। আমাদের দেশের স্কুলবাড়ির মতো।

বাড়িগুলো ছাড়িয়ে শিবিরের এক প্রান্তে আসি। লক্ষ লক্ষ নিহত মানুষের অমর আত্মার উদ্দেশে নিবেদিত মন্দির মেমোরিয়াল চ্যাপেল-এর সামনে এসে দাঁড়াই। নতমস্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তারপরে দেওয়ালের লিখন পাঠ করি—

'May the example of those who were exterminated here between 1933—1945 because they resisted Nazism help to unite the living for the defence of peace and freedom, aud respect for their fellowmen...'

লেখাটা মর্মস্পর্শী হলেও শেষাংশটুকু মেনে নিতে পারি না। যাঁরা নাৎসি শাসনের বিরোধিতা করেছিলেন, শুধু তো তাঁদেরই হত্যা করা হয়নি! তাঁরা ক'জন? আরও লক্ষ লক্ষ মানুষকে মেরে ফেলা হয়েছে। যাদের সঙ্গে রাজনীতি কিম্বা যুদ্ধের কোন সম্পর্ক ছিল না। এমনকি জর্মনীর সঙ্গে সম্পর্কহীন মানুষও হিটলারের বর্বরতার শিকার হয়েছেন। কয়েকবছর আগে শান্তির নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত ইহুদি লেখক এলি ভিজেল (Elie Wiesel) তাঁদেরই একজন। পনেরো বছরের সেই বালকটি তো তখন তাঁর বাবা মা ও বোনের সঙ্গে হাঙ্গেরীর সিংগেট (Singet) শহরে বাস করছিলেন। তাঁর বাবার একটা ছোট দোকান ছিল। সাধারণ

মধ্যবিত্তের মতই তাঁদের দিন কাটছিল। তাঁদের সঙ্গে তো নাৎসি জর্মনীর কোন সম্পর্ক ছিল না। তবু…

কিন্তু থাকগে। এই এক কথা আর ভাবতে ভাল লাগছে না। তাছাড়া বেলা সাড়ে বারোটা। এখানে আর অপেক্ষা কবা উচিত হবে না।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলি। গেটের কাছে আসি। কিন্তু গেট পার হতে পারি না। একপাশে সরে দাঁড়াতে হয়। একটা শোভা-যাত্রা ভেতরে আসছে।

ছোট শোভাযাত্রা। দু-সারিতে শ'খানেক মানুষ, সবই যুবক-যুবতী। সামনে ফেস্টুন হাতে দুটি জর্মন যুবতী। ইংরেজীতে লেখা —'International Youth Festival.'

তারপরেই দুজন যুবক প্রকাণ্ড একটা সাদা ফুলের মালা বয়ে নিয়ে চলেছেন। নিশ্চয়ই মেমোরিয়াল চ্যাপেলের শহীদবেদিতে নিবেদন করবেন।

—আরে তুমি! শঙ্কর প্রায় চিৎকার করে ওঠে।

যে দুটি যুবক মালাটি বয়ে নিয়ে চলেছেন, তাঁদেরই একজন বিশুদ্ধ বাংলায় উত্তর দেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারা বুঝি বেড়াতে এসেছেন? বার্লিন থেকে কবে এলেন?

শঙ্কর তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে শোভাযাত্রার সঙ্গে এগিয়ে চলে। আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুবকটির কথাই ভাবতে থাকি। যুবকটি শঙ্করের পরিচিত। কিন্তু তার চেয়ে বড়-কথা সে বাঙালী। সুদূর জর্মনীতে এসেও একটি বাঙালী যুবক মানবিকতা রক্ষার শোভাযাত্রায় সামিল হয়েছে। বুকখানি গর্বে ভরে ওঠে আমার।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। আমরা ডাখাউ থেকে ম্যুনিক চলেছি। মাত্র ১৭ কিলোমিটার পথ। যেতে সামান্যই সময় লাগবে। তাহলে চুপচাপ বসে থাকার কোন মানে হয় না। বিশেষ করে ডাখাউ দেখে সবারই মন ভারী হয়ে উঠেছে। সুতরাং শঙ্কর অন্য কথা শুরু

করেছে। শঙ্কর বলছে আমার সেই পেন্সিলের দেশ বাভেরিয়ার কথা, যে দেশে আমি এখন পথ চলেছি। চলতে চলতে শুনছি—

আয়তনের দিক থেকে বাভেরিয়া পশ্চিম জর্মনীর বৃহত্তম রাজ্য, জনসংখ্যার দিক থেকে অবশ্য দ্বিতীয়। আয়তন ৭০,৬০০ বর্গ-কিলোমিটার আর জনসংখ্যা ১ কোটি ২৫ লক্ষের মতো। এই প্রদেশের পুবে চেকোশ্লভাকিয়া আর দক্ষিণে অস্ট্রিয়া। অর্থাৎ এটি পশ্চিম-জর্মনীর দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ।

বাভেরিয়ার দক্ষিণাংশে আলপ্‌স পর্বতমালা আর পূর্বাঞ্চলে বোহে-মিয়ান ফরেস্ট (Bohmerwald)। দানিউব নদী মোটামুটি ভাবে এই প্রদেশকে উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত করেছে। দুটি অংশের প্রাকৃতিক পার্থক্য রীতিমত উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণাংশই বাভেরিয়ার উচ্চ-মালভূমি, আলপ্‌স পর্বতমালার পাদদেশ থেকে দানিউব পর্যন্ত প্রসারিত। দানিউবের তীরভূমি সমুদ্রসমতা থেকে ১৫০০ ফুট উঁচু আর আলপ্‌সের পাদদেশে ৩০০০ ফুট। তুলনায় এই অংশের আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হলেও আমাদের দেশের তুলনায় রীতিমত শীতল। বাৎসরিক তুষারপাতের গড় ২৮ দিন।...

—ম্যুনিক অর্থাৎ এই অঞ্চলে কি রকম তুষারপাত হয়? মাঝ-খান থেকে প্রশ্ন করি।

শঙ্কর উত্তর দেয়—বাৎসরিক গড় ৫৩ দিন।

—আর আলপ্‌স অঞ্চলে?

—জর্মনীর উচ্চতম শিখর স্যুগস্পিৎসে অঞ্চলে বছরে ১৮১ দিন।

—তার মানে বছরে ছ'মাসই বরফ পড়ে সেখানে! বিস্মিত স্বরে জয়া বলে ওঠে।

একটু হেসে বলি—স্যুগস্পিৎসে শিখরের উচ্চতা শুনেছি মাত্র ৯৭২১ ফুট। তাই সেখানে বছরে মাত্র ছ'মাস বরফ পড়ে। আরও উঁচু হলে বারোমাসই বরফ পড়ত। হিমালয়ের উঁচু শিখরগুলিতে তাই পড়ে।

আমি থামতেই শঙ্কর শুরু করে—মুানশেনের উচ্চতা ১৭৩৬ ফুট। বাভেরিয়ার বৃহত্তম নগর ও রাজধানী মুানশেন। এখন মানে এই জুলাই মাসে এখানকার গড় উচ্চতা ১৭° সেন্টিগ্রেড আর এখানে বাৎসরিক তুষারপাতের গড় ৯৩৫ মিলিমিটার।

—মুানিকের কথা এখন নয়। গৌর হঠাৎ বলে ওঠে—কয়েক মিনিট বাদেই তো মুানিক পৌঁছব আমরা। এখন বাভেরিয়ার কথা বলে নাও।

মাথা নেড়ে শঙ্কর শুরু করে—দানিউব ও তার শাখানদীরা বাভেরিয়ার সমতল অঞ্চলকে সুজলা ও সুফলা করে তুলেছে। তবে এই প্রদেশের এক-তৃতীয়াংশই বনভূমি। বনাঞ্চলে স্প্রুস্ ও বীচ অর্থাৎ দেবদারু জাতীয় গাছই বেশি। ব্ল্যাক ফরেস্টের মতো বাভেরিয়ার উচ্চ বনভূমিতেও কিছু ফাব গাছ রয়েছে। আর রয়েছে আলপাইন তৃণভূমি। অতএব বুঝতে পারছেন, বাভেরিয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্যও ভারী মনোরম।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। উত্তর দিই। তারপরে জিজ্ঞেস করি—আচ্ছা, বাভেরিয়াবাসীদেব প্রধান জীবিকা কি?

গৌর উত্তব দেয়—কল-কারখানা ও কৃষিকার্য দুটোতেই বাভেরিয়া খুবই উন্নত। অধিবাসীদের শতকরা পয়তাল্লিশজন কল-কারখানায় কাজ করেন। শতকরা ২২ জন অফিস-আদালতে, ১৬জন পরিবহন শিল্পে নিযুক্ত আর ১৭ জন চাষাবাদ করেন। পেট্রোলিয়াম শিল্পে ও বিদ্যুৎ-উৎপাদনে বাভেরিয়া খুবই উন্নত। পশ্চিম জর্মনীর এক-তৃতীয়াংশ এলুমিনিয়াম বাভেরিয়া উৎপন্ন করে। নানা রকমের উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্রপাতি, কল-কারখানার যন্ত্রপাতি, গাড়ি ও বিমান তৈরীর জন্য বাভেরিয়া বিশ্ববিখ্যাত।

ডেয়ারী শিল্পেও বাভেরিয়া খুবই উন্নত। ৫০ লক্ষের মতো গরু ও প্রায় ৩০ লক্ষ শুয়োর রয়েছে এই রাজ্যে।

—পঞ্চাশ লক্ষ গরু! সবিস্ময়ে বলে উঠি।

গৌর মাথা নেড়ে বলে—হ্যাঁ শম্ভুদা পঞ্চাশ লক্ষ, ফাইভ মিলিয়ান।

তাছাড়া বাভেরিয়ার কৃষিজাত উৎপাদনের পরিমান শুনলেও তুমি অবাক হবে।

—যেমন ?

—বাভেরিয়ায় বছরে ২০ লক্ষ টন গম, প্রায় ১৫ লক্ষ টন বার্লি, ৮০ লক্ষ টন আলু ও প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হয়। অথচ এই প্রদেশের প্রায় পঁচাত্তর ভাগ জমি পার্বত্য কিম্বা বনাবৃত।...

একবার থামে গৌর। তারপরে আবার বলে—মোটরপথ কেমন চমৎকার তো দেখতেই পাচ্ছ, রেলপথও খুবই উন্নত। তাছাড়া দানিউব এবং অন্যান্য নদীতে জল পরিবহন ব্যবস্থাও ভারী সুন্দর।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বাভেরিয়া অত্যন্ত অগ্রসর। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এ রাজ্যে। বলা বাহুল্য তার মধ্যে একটি এই ম্যুনিকে।

—বাকি দুটি বোধহয় নুর্নবের্গ (Nurnberg) এবং এরলাঙ্গেন (Erlangen) শহরে। জয়া বলে ওঠে।

গৌর মাথা নেড়ে বলতে থাকে—সাধারণতঃ স্থানের নাম থেকে অধিবাসীদের নাম হয়, কিন্তু বাভেরিয়ার ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটি হয়েছে।

—কি রকম ?

—মানে অধিবাসীদের নাম থেকে বাভেরিয়া নামটি হয়েছে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বাভেরিয়ান্স নামে এক জর্মন উপজাতি এই বনময় পার্বত্য অঞ্চলে স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে তাঁদের নাম থেকেই বাভেরিয়া নাম হয়েছে।

বাভেরিয়ানদের আচার-আচরণ অন্যান্য জর্মনদের চেয়ে বেশ খানিকটা অন্য রকম। আর ভাষার পার্থক্যের কথা তো আগেই বলেছি।...

আমি মাথা নাড়ি। এবারে আবার শঙ্কর শুরু করে—বাভেরিয়ানরা অন্যান্য জর্মনদের মতো নিয়মনিষ্ঠ নন। কিন্তু তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা অত্যন্ত প্রখর। বাভেরিয়ার শিল্প ও সাহিত্য আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। হিটলারের অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক দিক থেকেও বাভেরিয়া অনেকখানি স্বাধীন ছিল।

১৮৭১ সালে বাভেরিয়া 'সেকেণ্ড রাইখ' (Reich) বা দ্বিতীয় জর্মন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু জর্মনীর অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাভেরিয়া অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে আসছিল। যেমন বাভেরিয়ার পৃথক সেনাবাহিনী ও কুটনৈতিক ব্যবস্থা ছিল। ছিল নিজস্ব রেল ও ডাক বিভাগ।

হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরেই এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটালেন। কারণ হিটলার বাভেরিয়াকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি নিজেকে বাভেরিয়ান বলেই মনে করতেন। ভাগ্যহীন দরিদ্র অস্ট্রিয়ান হিটলার রুজিরোজগারের আশায় দেশ ছেড়ে একদিন জর্মনীতে চলে এসেছিলেন। ম্যুন্‌শেন্‌ সেদিন তাঁকে আশ্রয় দান করেছিল। তিনি এখান থেকেই জর্মন সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। যুদ্ধে আহত হয়ে আবার এখানেই ফিরে আসেন। নাৎসী দলে যোগদান করেন। এখান থেকেই তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করে। তিনি "মেইন ক্যাম্প" বইখানি রচনা করেন। তাঁর রাজনৈতিক উত্থান শুরু হয়।

১৯৩৩ সালে চ্যান্সেলার নির্বাচিত হবার পরেই হিটলার বাভেরিয়ার সর্বপ্রকার স্বায়ত্ত শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যটিকে সম্পূর্ণরূপে জর্মন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। সেই থেকে শুরু করে ১৯৪৫ সাল অর্থাৎ হের হিটলারের পতন পর্যন্ত বাভেরিয়া নাৎসি শাসনের একটি শক্তিশালী দুর্গ রূপে পরিচিত ছিল। ম্যুন্‌শেন্‌ শহরে বিশাল এক অট্টালিকা নির্মাণ করে হিটলার সেখানে তাঁর নাৎসি দলের প্রধান কর্মকেন্দ্র গড়ে তোলেন। ১৯৩৫ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর এই বাভেরিয়ার ন্যুর্নবের্গ শহরে হিটলার তাঁর কুখ্যাত জাতিগত আইন (Racial Laws) প্রনয়ণ করেন। আইনটি ন্যুর্নবের্গ আইন নামে পরিচিত। আবার হিটলারের পতনের পরে ঐ শহরেই মিত্রশক্তি জর্মন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেন। সুতরাং জর্মন ইতিহাসে বাভেরিয়ার স্থান অতিশয় উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বাভেরিয়ায় নতুন সংবিধান প্রণীত হয়।

এবং ১৯৪৯ সালের ২৩শে মে বাভেরিয়া দশম রাষ্ট্র রূপে পশ্চিম জর্মন ফেডারেল রিপাবলিকে যোগদান করে। সেই থেকে বাভেরিয়া পশ্চিম জর্মনীকে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য অবিরত কাজ করে চলেছে।...

একবার থামে শঙ্কর। তারপরে আবার বলে ওঠে—কিন্তু এখন আর বাভেরিয়ার কথা নয়। আমরা ম্যুন্‌শেন এসে গিয়েছি।

তাকিয়ে দেখি, সত্যই তাই। পথের তুপাশেই বড় বড় বাড়ি। দোকানপাট আর চওড়া ফুটপাথ। গৌর যে কথার ফাঁকে কখন গাড়িখানিকে অটোবান থেকে শহরের পথে নিয়ে এসেছে, টের পাই নি।

টের পাবোই বা কেমন করে? পথের চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই যে এটা অটোবান নয়। প্রায় তেমনি প্রশস্ত আর মসৃণ, আসা-যাওয়ার তুটি অংশের মাঝে ছোট-বড় গাছপালা। তবে তাকিয়ে বুঝতে পারছি না এটা অটোবান নয়। কারণ অটোবানের তুপাশে বাড়ি থাকে না, অটোবান কখনও শহরে প্রবেশ করে না।

যাক্‌গে, অটোবানের কথা। তার চেয়ে ম্যুনিককে দেখা যাক। য়ুরোপের যেকোন মহানগরীর মতই পথের তু-পাশে সুসজ্জিত দোকানের সারি আর আধুনিকতম হোটেল পেনসন্‌ ও রেস্তরাঁ। সবই ঝকঝকে তকতকে ও বিলাসবহুল। কেবল বাড়িগুলোর গড়ন দেখে মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে, গত শতাব্দীতে নির্মিত। তাহলে কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বোমা পড়ে নি এ শহরে?

প্রশ্নটা শুনে হেসে দেয় গৌর। তারপরে বলে—ম্যুনিক শুধু মহানগব নয়, সীমান্ত শহরও বটে। তার ওপরে ম্যুনিক দীর্ঘকাল নাৎসি দলের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। এখানে তো বোমা পড়বেই। পড়েছে এবং তা প্রচুর পবিমাণে। তবু কিছু কিছু বাড়ি দেখে তোমার মনে হচ্ছে ঊনবিংশ শতকে নির্মিত, এই তো?

আমি মাথা নাড়ি। গৌর বলতে থাকে—এটাই এ শহরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। আর তাই ম্যুনিককে বলা হয়, 'a light-

hearted, fun-loving City···with an atmosphere of 19th Century Europe.'

—তার মানে যুদ্ধের পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িগুলোকে আবার আগের মতো করে গড়ে তোলা হয়েছে।

গৌর মাথা দুলিয়ে বলে—যেমন পঞ্চদশ শতকে নির্মিত পুরনো শহরে তিনটি তোরণ, ঐ একই শতাব্দীতে তৈরি ক্যাথিড্রাল ও টাউন হল এবং গ্রীক্ অর্থোডক্স চার্চ সহ আরও বহু বড় বড় পুরনো বাড়ি দেখলে তোমার মনে হবে যেন তুমি মধ্যযুগে চলে গিয়েছো। অথচ সেগুলি প্রায় সবই যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কোনটি বা একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

গৌর থামতেই শঙ্কর শুরু করে—ম্যুনশেনের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য, শস্তার শহর। আপনি জর্মনীর সবচেয়ে ভাল 'বিয়ার' ও খাবার পাবেন এখানে এবং তা বেশ শস্তায়।

—এখানে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কত দূরে?

—খুবই কাছে, মাত্র ৮ কিলোমিটার দূরে, নাম রীম (RIEM) বিমানবন্দর। যাতায়াতেও খুবই সুবিধে। সিটি সেণ্ট্রাল রেল-স্টেশন থেকে প্রতি বিশ মিনিট অন্তর একখানি করে বাস ছাড়ে, স্যুটকেস নিয়ে উঠতে কোন আপত্তি নেই। ভাড়া পাঁচ মার্ক।

চুপ করে শঙ্কর। কেটে যায় কয়েকটি নীরব মুহূর্ত। তারপরে গৌর বলে—আমরা নিজেদের গাড়ি করে ম্যুনিক এলাম। কিন্তু ইচ্ছে করলে ট্রেনে করেও আসতে পারতাম। এখানকার সেণ্ট্রাল রেলস্টেশনটি সত্যই শহরের মাঝখানে অবস্থিত। শহরের সব অঞ্চলের বাস বা স্ট্রীটকার এবং মেট্রো সেখানে পাওয়া যায়। রেল-স্টেশন থেকেই এস্ক্যালেটর তোমাকে 'U-Bahn' অথবা 'S-Bahn' মানে মেট্রোরেল অথবা লোক্যাল ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাবে।

—এখান থেকে দূরপাল্লার রেলে অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের প্রধান প্রধান শহরে পৌঁছতে কত সময় লাগে?

—রেলে রোম যেতে চোদ্দ ঘণ্টা, ফ্লোরেন্স এগারো, মিলান নয়

আর ভিনিস নয় ঘণ্টা লাগে। জাল্‌সবুর্গ যেতে দুই আর ভিয়েনা পাঁচ ঘণ্টা। পারি অথবা আমস্টারডাম দশ আর জুরিখ যেতে পাঁচ ঘণ্টা লাগে।

গৌর থামতেই শঙ্কর বলে—Munchen শব্দের অর্থ Home of Monks, সন্ন্যাসীদের আপন আলয়। মনে হয়, স্বর্গীয় সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে প্রথমে সন্ন্যাসীরা এখানে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে দানিউবের শাখা ইজার্‌ নদীর (Isar) তীরে এই রমণীয় স্থানে জনপদ গড়ে ওঠে কিন্তু 'ম্যুনশেন' নামটা থেকে যায়।

—এখান থেকে আলপ্‌স কত দূর ?

—কত আর হবে, ৪০/৫০ কিলোমিটার। আর তাই এখানে বেশ শীত। বাৎসরিক গড় উত্তাপ ৭° সেন্টিগ্রেড। আর উচ্চতার কথা তো আগেই বলেছি ১৭০০ ফুট।

আমি মাথা নাড়ি। শঙ্কর বলতে থাকে—ইজার্‌ নদীর দুতীরেই শহর গড়ে উঠেছে। এখন বলা যায় নদীটি শহরকে মোটামুটি ভাবে দুটি প্রায় সমান অংশে বিভক্ত করেছে। কথিত আছে ১১৫৭/৫৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ হেনরী দা লায়ন নামে জনৈক নরপতি সেই সাধুদের কলোনীর কাছে বাজার বসবার অনুমতি দান করেন। সেই বাজারকে কেন্দ্র করেই কালক্রমে এই মহানগরী গড়ে উঠেছে। সুতরাং হেনরীকেই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ১৮৫৪ সালে ম্যুন্‌শেনের জনসংখ্যা একলক্ষে পৌঁছয়। ফলে সে বছর থেকেই ম্যুন্‌শেন মহানগরীর মর্যাদা লাভ করে! ১৯০০ সালে শহরের জনসংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ লক্ষ।

—আর এখন ?

—এখন মূল শহরের জনসংখ্যা হবে বিশ লক্ষের মতো আর বৃহত্তর ম্যুন্‌শেনের লোকসংখ্যা প্রায় পঁচিশ লক্ষ।

গৌর বলে—তুমি তো জানো শঙ্কুদা, অস্ট্রিয়ান যুবক এ্যাডলফ্‌ হিটলার পেটের দায়ে দেশত্যাগী হয়ে এই শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এখান থেকে তাঁর উত্থান শুরু হয়।...

আমি মাথা নাড়ি। গৌর বলতে থাকে—এখানেই তিনি নাৎসি (Nationalsozialistische) দলে যোগদান করেন এবং আপন প্রতিভাবলে কয়েক বছরের মধ্যেই নেতৃত্বের অধিকার অর্জন করেন। এখানেই এক সুবিশাল সমাবেশে দলীয় বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯২৩ সালের এখানেই তিনি বাভেরিয়ার শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব (Putsch) শুরু করেন। চ্যান্সেলার নির্বাচিত হবার পরে হিটলার এখানেই নাৎসি দলের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। আবার ১৯৩৯ সালে এখানেই তাঁকে হত্যা করার প্রথম ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

চুপ করে গৌর। শঙ্কর ছেলেকে শহর দেখাচ্ছে। আমিও আর কোন প্রশ্ন না করে শহর দেখতে থাকি। সেই প্রশস্ত ও মসৃণ পথ। পথের পাশে গাছের সারি। তারপরে চওড়া ফুটপাথ। ফুটপাথের পরে বাড়ি, বড়-বড় বাড়ি। অধিকাংশই বিশ-পঁচিশ তলা উঁচু। কোনটি বা আরও বেশি। বলা বাহুল্য এগুলো সবই নতুন। কিন্তু সেই সঙ্গে পুরোন বাড়িও প্রচুর। সেগুলো অমন উঁচু নয়। দেখে মনে হয় যেন উনবিংশ শতকে কিম্বা তারও আগে নির্মিত।

পথে প্রচুর গাড়ি। শুধু গাড়ি নয় সাইকেলও দেখতে পাচ্ছি। পথের একাংশ জুড়ে সাইকেল ট্র্যাক। বহুলোক সাইকেলে যাতায়াত করছেন। আর তাঁদের মধ্যে যুবক-যুবতীদের সংখ্যা লক্ষ্য করবার মতো।

মাঝে মাঝেই ফ্লাই-ওভার পার হচ্ছি। এখানে কিন্তু সাইকেল-ট্র্যাক নেই। সেটি গিয়েছে নিচের টানেলের ভেতর দিয়ে। মূল-পথটিকে বন্ধ করে দিয়ে এদেশে ফ্লাই-ওভার তৈরি করা হয় না। পথটিকে টানেলের ভেতর দিয়ে চালু রাখা হয়। সোজা পথের গাড়িগুলো সেই টানেল দিয়ে যাতায়াত করে।

সত্যই বড় শহর। এ যাত্রায় ব্রাসেলস ও লুক্সেমবুর্গ দেখার পরে আর এত বড় শহরে পদার্পণ করিনি। এবং বেশ বুঝতে পারছি এটি তাদের চেয়েও বড়।

—সওয়া আট শ' বছরের শহর। অনেক রক্ত ঝরেছে এর পথে। বহুবার একে ধ্বংস করে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ধ্বংসের চেয়ে সৃষ্টি অনেক বেশি শক্তিশালী। তাই যুগে যুগে এ শহর বড় হয়ে উঠেছে। আমরা এখন যে অংশ দিয়ে চলেছি, এটা শহরের নতুন অংশ। থামে শঙ্কর। ছেলেকে ছেড়ে সে এখন আমার দিকে নজর দিয়েছে।

আমি তাই শুনতে থাকি। শঙ্কর বলছে—পুরোন অংশ আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। পুরোন অংশ এখন ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। মানে আমাদের কলকাতার বড়বাজার অঞ্চল বলতে পারেন। অধিকাংশই ইতালিয়ান মডেলের ব্যারাক-বাড়ি। তাহলেও সেখানে প্রচুর দর্শনীয় স্থল রয়েছে। তোরণ, ক্যাথিড্রাল, টাউন-হল ও গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের কথা আগেই শুনেছেন।

আমি মাথা নাড়ি। শঙ্কর বলতে থাকে—রয়েছে Residenz Theater। এটি অষ্টাদশ শতকে নির্মিত। যুদ্ধের সময়ে বোমা পড়ে বাইরের দিকটা ভেঙে গেলেও ভেতরের মূল্যবান দেওয়ালচিত্র ও অন্যান্য অলঙ্করণ বেঁচে যায়। যুদ্ধের পরে থিয়েটারটিকে আবার ঠিক আগের মতো করে সারানো হয়। ১৯৫৮ সালে এই রঙ্গশালা জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

—আমরা দেখব না? জয়া বলে ওঠে।

—নিশ্চয়ই। গৌর বলে—তবে ফিরে এসে।

—এখন কি আমরা সোজা গার্মিশ্ (Garmisch) চলে যাচ্ছি?

—হ্যাঁ। কারণ আমাকে সন্ধ্যার ফ্লাইট ধরতে হবে। গার্মিশ্ এবং ইব্জে (Eibsee) দেখে বিকেল পাঁচটা নাগাদ এখানে ফিরে আসতে পারলে, আমিও তোমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ ম্যুনিক দেখার সময় পাবো।

—গার্মিশ্ ম্যুনিক থেকে কতদূর?

—মাত্র ৪৫ কিলোমিটার।

—আর ইব্জে?

—গার্মিশ্‌ থেকে ১২ কিলোমিটার।

—তাহলে চলুন তাড়াতাড়ি গার্মিশ চলা যাক।

—তাই চলেছি।

—কিন্তু গার্মিশ ও ইব্‌জের কথা পরে হবে এখন ম্যুন্‌শেন্‌ সম্পর্কে আরও কিছুকথা শুনে নিন। শঙ্কর আমাদের আলোচনায় বাধা দেয়।

জয়া কোন প্রতিবাদ করে না। শঙ্কর বলতে থাকে—

—রাজা প্রথম লুইজ্‌ (Louis)-এর আমলেই পুরোন শহরের সম্প্রসারণ অর্থাৎ নতুন শহরের পত্তন হয়। এখন যে বাড়িতে স্টেট লাইব্রেরী. সেই বাড়িটা নির্মাণ করেই রাজা শহর সম্প্রসাবণ শুরু করেন। পরবর্তীকালে তাঁবই নির্মিত একটি বাডিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে কোনিগ্‌সপ্লাটৎস (Kouigsplatz) অন্যতম। এই প্রাসাদে কিছু প্রাচীন ভাস্কর্য ও চিত্রসম্ভার অবশ্য দর্শনীয়।

এখন অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় (Ludwing Maxmilian University) আর সেই পুরোন বাড়িতে নেই, ১৮২৬ সালে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ম্যুনশেন শহরে একটি টেক্‌নিক্যাল কলেজ (Techni sche Hochs chule) এবং শিল্প ও সঙ্গীত আকাদেমী রয়েছে। রয়েছে মেডিক্যাল কলেজ সহ বেশ কয়েকটি ডিগ্রি কলেজ এবং বহু স্কুল।

ম্যুনশেন যে একটি বড় শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র সেকথা আগেই শুনেছেন। সংখ্যার দিক থেকে এখানে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক কাজ কাজ করেন ইলেক্‌ট্রিক, ইলেক্‌ট্রনিকস এবং ইন্‌স্ট্রুমেন্ট তৈরির কারখানাগুলোতে। মোট শ্রমিকদের ৩৭% কাজ করেন এইসব কারখানায়। শতকরা ২৯ জন শ্রমিক কাজ করেন জেনারেল ও ট্রান্সপোর্ট মেশিন তৈরির কারখানায়, ৯ জন কাগজকল ও ছাপাখানায়. ৭ জন কাপড়ের কলে, ৬ জন মদশিল্প, রাসায়নিক শিল্প, ক্যামেরা ও ফিল্মশিল্প প্রভৃতিতে নিযুক্ত রয়েছেন। সিমেন্স সহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিখ্যাত কম্প্যানীর প্রধান কর্মক্ষেত্র এই শহরে।

ম্যুনশেন পশ্চিম-জর্মনীর ব্যাঙ্ক ও ইনশিওরেন্স ব্যবসার একটি প্রধান কেন্দ্র। এখানে অনেকগুলি মিউজিয়াম রয়েছে। তার মধ্যে জর্মন মিউজিয়াম বাভেরিয়ান ন্যাশন্যাল মিউজিয়াম ও থিয়েটার মিউজিয়াম অবশ্য দর্শনীয়। আমরাও দেখব। এখানে বেশ কয়েকটি থিয়েটার মানে নাট্যশালা রয়েছে।...

—থেকে কি লাভ? আমরা তো আর নাটক দেখার সুযোগ পাচ্ছি না। জয়া যেন ক্ষোভ প্রকাশ করে।

কিন্তু শঙ্কর সেকথার কোন উত্তর না দিয়ে বলে চলে—আগেই বলেছি বাভেরিয়ার ডিউক হেনরী দা লায়ন এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। ১১৫৮ খ্রীস্টাব্দে এই নগরীর পত্তন হয়। পরবর্তী শতাব্দী অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতক থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত ম্যুনশেন বাভেরিয়া রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। সেই সঙ্গে জর্মনীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও বটে। এর মধ্যে কেবল 'থার্টি ইয়ারস ওয়ার' (১৬১৮-৪৮ খ্রীঃ) এবং স্প্যানিস সাক্সেশন' (১৭০১-১৪ খ্রীঃ) যুদ্ধের সময় সুইডিশ ও অস্ট্রিয়ানরা কিছুকাল এই শহর দখল করে নিয়েছিলেন। ১৮৭১ সালে ম্যুনশেন সহ সমগ্র বাভেরিয়া রাষ্ট্র জর্মন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আমি মাথা নাড়ি। কারণ কিছুক্ষণ আগে শঙ্কর নিজেই একথা বলেছে। কিন্তু আমি কিছু বলতে পারি না। তার আগেই গৌর হঠাৎ বলে ওঠে—শঙ্কুদা, বাঁদিকে তাকিয়ে দেখো, স্টেডিয়াম মানে ম্যুনিক ওলিম্পিক স্টেডিয়াম।

তাড়াতাড়ি বাঁদিকে তাকাই। পথ থেকে খানিকটা দূরে সুবিশাল একটা তাঁবুর মতো, যেমন বড় তেমনি উঁচু। কিন্তু কাপড়ের নয়, ফাইবার গ্লাসের গোলাকার তাঁবু, রোদ পড়ে চিকচিক করছে।

—এটা ম্যুনিকের শহরতলী। গৌর বলে চলে—জায়গাটার নাম ওবের্‌ভিজেন্‌ফেল্ড (Qberwiesenfeld) এখানেই ১৯৭২ সালের ওলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আধুনিক যুগের সেটি ছিল বিংশতিতম ওলিম্পিক।...

—এ যুগে প্রথম ওলিম্পিক কোথায় হয়েছে? জয়া মাঝখান থেকে প্রশ্ন করে.

উত্তর দিই—গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে, ১৮৯৬ সালে।

—অর্থাৎ ওলিম্পিকের দেশ গ্রীস থেকেই আবার ওলিম্পিক শুরু হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—আপনি সে স্টেডিয়াম দেখেছেন শঙ্কুদা?

—হ্যাঁ। এথেন্স শহরের উপকণ্ঠে, সাগরতীরে। মাটি থেকে অনেকটা ওপরে, ছোট কিন্তু ভারী সুন্দর।

—আপনি আর কোন্ কোন্ ওলিম্পিক স্টেডিয়াম দেখেছেন?

—তোমাদের বার্লিন স্টেডিয়াম, ১৯৩৬ সালের আর ১৯৬০ সালের রোম ওলিম্পিক স্টেডিয়াম।

—আমি স্টেডিয়াম দেখব বাবা! হঠাৎ অমৃত বলে ওঠে। ছেলেটা আজ সকাল থেকে একেবারে চুপ করেছিল।

—দেখব বৈকি। নিশ্চয়ই দেখব। শঙ্কর তাকে আশ্বস্ত করতে চায়। বলে—ফেরার পথে আমরা খুব ভাল করে স্টেডিয়াম দেখব। এখন দেখলে দেরি হয়ে যাবে। তুমি তো জানো গৌরজেঠুকে বিকেলে বার্লিনের প্লেন ধরতে হবে।

—না। এখুনি স্টেডিয়ামে চলো।

শঙ্কর প্রমাদ গণে। ছেলে যখন একবার তাল তুলেছে তখন তাকে বাগে আনা শক্ত হবে। কথাটা গৌরেরও অজানা নয়। তাই সে শঙ্করকে বলে—কি আর দেরি হবে? আজ বিকেলে ম্যুনিক থেকে বার্লিনের তিনটে ফ্লাইট রয়েছে আমাদের। না হয়, শেষের-টাই ধরব সাতটা নাগাদ। তাহলেও সন্ধের আগে বার্লিন পৌঁছে যাবো।

—ঐ তো জেঠু বলছেন. দেরি হবে না।

ছেলের কথা শুনে আমরা হেসে উঠি। এবং শেষ পর্যন্ত গম্ভীর শঙ্করকেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হয়। অবশেষে সে বলে—

চলুন, তাহলে স্টেডিয়াম দেখে নিয়েই গার্মিশ্‌ যাওয়া যাক।

অতএব গৌর গাড়ি ঘোরায়। অটোবান ছেড়ে আমরা নেমে আসি নিচে। গাছে ঘেরা ওলিম্পিক উপনগরীর দিকে এগিয়ে চলি। গৌর বলে—এই ওলিম্পিক ভিলেজ ও স্টেডিয়াম ইত্যাদি তৈরি করতে চার বছর সময় লেগেছে, ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ সাল। প্রধান স্টেডিয়াম ও অন্যান্য ক্রীড়াক্ষেত্র সমূহ একসঙ্গে দু'লক্ষ বিশ হাজার মানুষকে বসার জায়গা দিতে পারে। তার মধ্যে স্টেডিয়ামে আশি হাজার, Arena বা মল্লভূমিতে এগারো হাজার ও সুইমিংপুলে ন' হাজার দর্শকাসন রয়েছে আর এই যে অলিম্পিক ভিলেজ দেখছ, এখানে বারো হাজার প্রতিযোগীর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমরা মোটরে এখানে এলাম, কিন্তু তুমি ইচ্ছে করলে রেল, বাস কিম্বা সাবওয়ে করেও আসতে পারতে এখানে।

তুমি জানো, ১৯৭২ সালের সেই ম্যুনিক ওলিম্পিক ছিল এ যুগের বিংশতিতম অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগীরা আশাতীত খারাপ ফল করেন। সমালোচকরা বলেন, প্যালেস্টাইনী সন্ত্রাসবাদীদের নিষ্ঠুরতায় মার্কিন প্রতিযোগীদের মনোবল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে যাই হোক. এই ওলিম্পিকে পুরুষদের প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার ভ্যালেরী বরোজোভ (Valery Borozob) ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে সোনা জয় করেন। পূর্ব-জর্মনীর। ভোল্ফ্যাঙ্গর্নভিগ্‌। (Wolfgang Nordwig) পোল্‌ভল্টে প্রথম হন। ফিন্‌ল্যাণ্ডের লাস্‌ ভিরেন (Lass Viren) ৫০০০ও ১০,০০০ মিটার এবং পেক্কা ভাসালা (Pekka Vasala) ১,৫০০ মিটার দৌড়ে সোনা পেয়েছিলেন। কেনিয়ার প্রতিযোগীরা ১৬০০ মিটার রিলে রেসে জয়লাভ করেন। ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো সিটি অলিম্পিকে ট্রিপলজাম্প্‌ বিজয়ী রাশিয়ান প্রতিযোগী ভিক্টর সান্যেভ (Viktor Saneyev) এখানেও তাঁর কেতাব অক্ষুণ্ণ রাখেন। ৪০০ মিটার হার্ডল্‌স রেসে জয়লাভ করে আকিল-বুয়া (Akil-Bua) তাঁর দেশ উগাণ্ডাকে প্রথম ওলিম্পিক স্বর্ণপদক উপহার দেন।

মেয়েদের প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে সফল হয়েছিলেন পূর্ব ও পশ্চিম জর্মনীর প্রতিযোগিনীরা। পাঁচটি নতুন রেকর্ড সহ পূর্ব-জর্মনীর মেয়েরা ছ'টি সোনা এবং চারটি রেকর্ড সহ পশ্চিম-জর্মনীর মেয়েরা পাঁচটি সোনা জয় করেন। আগের ওলিম্পিকে রাশিয়ার মেয়েরা একটাও সোনা পান নি। কিন্তু এখানে তাঁরা নতুন রেকর্ড করে তিনটি সোনা পান। মেয়েদের অপর স্বর্ণপদক লাভ করেন বৃটেনের মেরী পিটারস (Mary Peters)।

ওলিম্পিক ভিলেজকে পাশে রেখে আমরা স্টেডিয়ামের অংশে এলাম। প্রথমেই কার-পার্ক। বোধকরি এক বর্গ কিলোমিটার বাঁধানো জায়গা নিয়ে। এখন অল্প গাড়ি বলে আমরা স্টেডিয়ামে যাবার পথের সামনেই গাড়ি রাখতে পারলাম! আড়াই মার্ক পার্কিং-ফি দিতে হল। তারপরে একটু এগিয়ে এসে টিকেট কাউন্টার। জনপ্রতি প্রবেশমূল্য এক মার্ক।

টিকেট কেটে গেট পার হয়ে আমরা স্টেডিয়ামে যাবার পথে আসি। অমৃতর আর দেরি সইছে না। সে ছুটতে শুরু করেছে। লাল কাঁকরের ৮/১০ ফুট চওড়া পথ। পথের তুপাশেই লোহার বেড়া। ডানদিকে উঁচু বেড়া, গাছে ছাওয়া ওলিম্পিক ভিলেজ, প্রবেশ নিষেধ। বাঁদিকে কোমর সমান লোহার তারের বেড়া। তারপরে সবুজ মাঠ। বেড়ার ধারে ফুলের বাগান। আর মাঠের শেষে স্টেডিয়াম। সেই ফাইবার গ্লাসের তাঁবু। তুটি অংশে বিভক্ত তুই অংশের মাঝখানে অনেক উঁচু একটা এবং বাইরে বেশ উঁচু কয়েকটি এলুমিনিয়ামের খুঁটি। তাদের সঙ্গেই তাঁবুটিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁবুর ভেতরেও গুটি কয়েক ছোট খুঁটি দেখতে পাচ্ছি! মাঠের মাঝেও কয়েক জায়গায় তাঁবুটিকে বাঁধা হয়েছে।

কিন্তু তাঁবুর চাইতেও যে বস্তুটি বেশি আকর্ষণ করছে, সেটি টেলিভিশান টাওয়ার। দেখে আমার পূর্ব-বার্লিনের টি. ভি. টাওয়ার-টির কথা মনে যাচ্ছে। শঙ্কর বলে—আমাদের সময় নেই। নইলে

আপনাকে ওর ওপরে নিয়ে যেতে পারতাম, লিফট্ আছে। আর আছে রিভলভিং বা ঘূর্ণীয়মান রেস্তরাঁ।

সময় যখন নেই, তখন অদর্শনের জন্য আপসোস করে কি লাভ। অতএব এখান থেকেই ঘূর্ণীয়মান রেস্তরাঁটি আরেকবার দেখে নিয়ে এগিয়ে চলি।

পথটা আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গিয়েছে। এবং পথ মোটেই জনশূন্য নয়। বেশ কিছু দর্শনার্থী যাওয়া-আসা করছেন। অমৃত এখনও ছুটে চলেছে। বাধ্য হয়ে জয়াকে পা চালাতে হয়।

শঙ্করের কথার জের টেনেই গৌর বলে—এখানে এগারোটা চ্যানেলে টেলিকাস্ট এবং রেডিও ব্রডকাস্ট করার ব্যবস্থা রয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা স্টেডিয়ামের ওপরে উঠে আসি। পথটাই এখানে এসে পৌঁছল। এখান থেকে সারা স্টেডিয়ামটাই চমৎকার দেখাচ্ছে। জর্মন বর্ণমালার 'A' থেকে 'T' এবং '1' '2' ও '3' সংখ্যা দিয়ে বর্ণিত মোট তেইশটি ব্লকে বিভক্ত এই স্টেডিয়াম। প্রতি ব্লকের জন্য পৃথক প্রবেশ পথ ও শৌচাগার ইত্যাদি। কম্পিউটার যুক্ত স্কোরবোর্ড ও আলোর ব্যবস্থা। তবে আমরা যারা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন দেখেছি, তাদের কাছে এসব কোন নতুন কিছু নয়। যেটি দেখার সেটি হল, এঁদের রক্ষণাবেক্ষণ। তেরো/চোদ্দ বছর আগে তৈরি হয়েছে অথচ দেখে মনে হচ্ছে যেন সবে নির্মাণকার্য শেষ হল।

মাঝখানে মাঠ—সবুজ ঘাসে ছাওয়া। তার চারিপাশে লাল মাটির স্পোর্টস ট্র্যাক্। এক প্রান্তে 'লংজাম্প,' 'হাই জাম্প,' ও 'পোল ভল্ট' দেবার জন্য নরম জমি।

শঙ্কর বলে—এখানে নিয়মিত খেলাধূলা হয়। বড় বড় ফুটবল ও হকি খেলা তো লেগেই আছে।

কেবল স্টেডিয়াম নয়, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, সুইমিং পুল, স্পোর্টস এ্যারেনা, টেনিস কোর্ট, টি. ভি. টাওয়ার এবং ওলিম্পিক ভিলেজ। আমরা সেই ভিলেজের পাশ দিয়েই এখানে এসেছি। এখান থেকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। গাছে ছাওয়া, বাগানে ঘেরা শান্তির

নীড়। অথচ ওখানেই একদিন চরম অশান্তি দেখা দিয়েছিল। ওলিম্পিক ইতিহাসের জঘন্যতম ঘটনার সাক্ষী ঐ শিবির। সেই কথাই ভাবতে থাকি।

জর্মন কর্তৃপক্ষ ১৯৭২ সালের অনুষ্ঠানের নাম দিয়েছিলেন—'Olympics of Fun and Joy' তাঁরাই এখানে প্রথম ব্যাপক ভাবে ইলেক্ট্রোনিক্স যন্ত্রপাতির সহায়তায় সময় ও দূরত্ব পরিমাপের ব্যবস্থা করেন। আনন্দ ও উত্তেজনার মধ্যে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রতিদিন নানা রকম মজার ঘটনা ঘটতে থাকে। এইভাবে দশদিন অতিবাহিত হয়। কিন্তু তারপরেই সেই নিষ্ঠুর ঘটনা। যে ঘটনা ওলিম্পিকের ইতিহাসকে চিরকালের জন্য কলঙ্কিত করে রেখেছে।

তারিখটা ছিল ৫ই সেপ্টেম্বার, অনুষ্ঠানের একাদশ দিন। সেদিন খুব সকালেই আটজন প্যালেস্টিনীয় গরিলা মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র সহ ইজরেলী শিবিরে হানা দেয়। তারা একজন কুস্তি প্রশিক্ষক ও একজন ভারোত্তলক প্রতিযোগীকে হত্যা করে ন'জন প্রতিযোগীকে বন্দী করে। নিজেদের 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বার' গরিলা বলে ঘোষণা করে। তারপরে দাবী জানায়, ইজরেলী সরকার বিভিন্ন সময়ে ধৃত দু'শ জন প্যালেস্টিনীয় গরিলাকে মুক্তি না দিলে এই ন'জন ইজরেলী প্রতিযোগীকে হত্যা করা হবে।

কর্তৃপক্ষ সেদিনের মতো অনুষ্ঠান বন্ধ রেখে গরিলাদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেন। সারাদিন ধরে নিবপরাধ প্রতিযোগীদের মুক্তির চেষ্টা চলল। কিন্তু গরিলারা তাদের দাবীতে অটল রইল। মধ্যরাত পর্যন্ত আলোচনা চালিয়েও কোন ফল পাওয়া গেল না। অবশেষে সন্ত্রাসবাদীরা দাবী করল, তেল ও চালকসহ তাদের একখানি বিমান দিতে হবে। সেই বিমানে করে তারা মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশে চলে যাবে, সেখান থেকে বন্দীমুক্তির আলোচনা চালাবে।

ওদের অনমনীয় মনোভাব দেখে কর্তৃপক্ষ নতুন মতলব আঁটলেন। প্রস্তাবে সম্মত হবার ভান করে তাঁরা শেষরাতে বন্দীসহ সন্ত্রাসবাদীদের নিকটবর্তী প্রতিরক্ষা-বিমান ঘাঁটিতে (Furstenfeldbruck)

নিয়ে গেলেন। এবং অবশেষে পরিকল্পনা অনুযায়ী শক্তি প্রয়োগ করে তাদের বন্দী করার চেষ্টা করা হল। কিন্তু শেষরক্ষা করা গেল না। সংঘর্ষে সন্ত্রাসবাদীদের পাঁচজন মারা গেল। কিন্তু তার আগেই তারা ন'জন ইজরেলী প্রতিযোগীকেই হত্যা করতে সক্ষম হল। সংঘর্ষে একজন জর্মন পুলিশও নিহত হলেন।

মৃত প্রতিযোগীদের শহীদের সম্মান দেওয়া হল। পরদিন সকালে তাঁদের স্মৃতিতে এখানে এক শোকসভার আয়োজন করা হয়। সারা পৃথিবীর হাজার হাজার মানুষ অশ্রুসিক্ত নয়নে সেই নিরপরাধ ইজরেলীদের আত্মার সদগতি কামনা করলেন।

তারপরে আবার ওলিম্পিক শুরু হল। কিন্তু সে যেন নিয়ম-রক্ষার খেলা। বেশ কয়েকজন প্রতিযোগী সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ম্যুনিক ছেড়ে চলে গেলেন। আর সেই ওলিম্পিকের সর্বশ্রেষ্ঠ সাঁতারু মার্ক স্পিট্জকে (Spitz) পুলিশ প্রহরায় দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হলেও তিনি ছিলেন জাতিতে ইহুদি। তিনি তার আগেই সাতটি স্বর্ণপদক জয় করে নিয়েছিলেন।

তার চেয়েও দুর্ভাগ্যের কথা. ম্যুনিকের পরেও চারটি ওলিম্পিক অনুষ্ঠিত হল, কিন্তু এখনও খেলাধুলা সন্ত্রাসমুক্ত হল না। বোধকরি কোনদিন হবে না। কারণ সন্ত্রাসের শেষ নেই। শেষ নেই ঘৃণার। হিটলারের মৃত্যুর পরে প্রায় পঞ্চাশ বছর কেটে গেল। কিন্তু আজও ইহুদিদের জীবন নিরাপদ হল না। আর তাই ডাখাউ থেকে ম্যুনিক —একই ইতিহাস।

পনেরো

অমৃত যখন স্টেডিয়ামে যাবার বায়না করেছিল, তখন সত্যি বলতে কি মনে মনে খুশি হয়ে উঠেছিলাম। একটা ওলিম্পিক স্টেডিয়ামকে ফেলে রেখে এগিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু এখন মনে

হচ্ছে ফেরার পথে দেখলেই ভাল ছিল। এমন ভারী মন নিয়ে গার্মিশ যেতে হত না।

কিন্তু আমি যে পথিক। পথ চলতে গিয়ে মনকে ভারী হতে দেওয়া আমার সাজে না। তাই তাড়াতাড়ি গৌরকে জিজ্ঞেস করি —তোমাদের কি ম্যুনিকের কথা ফুরিয়ে গেল ?

—না। ম্যুনিককে পেছনে ফেলে এলেও বলার মতো তার আরও অনেক কথা আছে। গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে গৌর উত্তর দেয়।

আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে সোজা দক্ষিণে চলেছি। বলা বাহুল্য অস্ট্রিয়ার দিকে এগোচ্ছি। কিন্তু এটা অস্ট্রিয়া যাবার পথ নয়। কারণ এপথের শেষে আল্প্স পর্বতমালা দুই দেশের সীমান্ত রচনা করেছে। আগেই বলেছি, যে অটোবানটি ধরে ব্ল্যাক-ফরেস্ট থেকে ম্যুনিক পৌঁছি, সেইটে ধরে পুবে এগোলেই আমরা অস্ট্রিয়া পৌঁছে যেতাম। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আমরা সেটি ছেড়ে এসেছি।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে গৌর জিজ্ঞেস করে—তুমি কি সত্যই ম্যুনিকের কথা শুনতে চাও ?

—নিশ্চয়ই।

—তাহলে বলছি শোন। গৌর শুরু করে—ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ম্যুনিককে বলা হয়, প্রদর্শনীর শহর। বছরের যে কোন সময় এখানে এলে তুমি অন্তত দু-চারটি এগজিবিশান, সেমিনার অথবা কনফারেন্স দেখতে পাবেই। এর কারণ ম্যুনিক পূর্ব ও পশ্চিম য়ুরোপের মিলনকেন্দ্র। কার্লশ্রুহে, জালস্‌বুর্গ ও বার্লিন থেকে তিনটি অটোবান এসে মিলিত হয়েছে এখানে।

দূরে আল্প্স দেখা দিয়েছে, সাদা মেঘের মাঝে ধূসর ছায়াপথের মতো। পথের দুদিকেই ঘন বন। এখানে সবুজ, দূরে ধূসর। মনে হচ্ছে ঐ ছায়াপথে গিয়ে মিশেছে।

সহসা শঙ্কর বলে ওঠে—এ বনের কোন আলাদা নাম নেই। একে বাভেরিয়ান ফরেস্ট বলা হয়। এই বনের মধু বিখ্যাত।

আর কাঠ ? আমি মনে মনে ভাবি, এইসব বনের কাঠ দিয়ে

নিশ্চয়ই কাঠ-পেন্সিল তৈরি হয়। যে পেন্সিল আমার এই বাভেরিয়া ভ্রমণের প্রথম প্রেরণা।

শঙ্কর আবার বলে—এখানে খানিকটা দূরে একটা চমৎকার হ্রদ আছে। নাম স্টার্নবের্গ্ (Starnberg)।

ইতিমধ্যে আমরা একটা পুলের ওপরে উঠে এসেছি। এখান থেকে ফেলে আসা বনময় উপত্যকাটি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। বনের ভেতর মাঝে মাঝে ক্ষেত। ক্ষেত নয়, যেন সবুজ দ্বীপ।

সামনের সেই ধূসর ছায়াপথের রঙ ফিরছে। সেও ধীরে ধীরে সবুজ হচ্ছে। এখন তাকে পাহাড় বলে বেশ বোঝা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন আকাশে হেলান দিয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে। ভাবতে ভাল লাগছে আর কিছুক্ষণ পরেই আমি ঐ পাহাড়ে পদচারণা করতে পারব। দু-বছর আগে আমি আল্পসের বুকে পদচারণা করেছিলাম। সেদিন ছিলাম সুইজারল্যাণ্ডে। আজ এসেছি জর্মনীতে, বাভেরিয়ায়। আমি বেলজিয়াম থেকে বাভেরিয়ায় এলাম। গৌরকে ধন্যবাদ। তার জন্যই এ যাত্রা এমন সুন্দর হল।

কিন্তু আল্প্স নয়, গৌর বাভেরিয়ার কথাই বলে চলেছে—বাভেরিয়ার প্রাকৃতিক গঠন মোটামুটি ভাবে দক্ষিণ-জর্মনীর অন্যান্য অঞ্চলেরই মতো। কেবল এর এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে বন আর পাহাড়, আল্প্স পর্বতমালা। পাহাড়ী প্রকৃতি হলেও এখানে প্রচুর সমতল রয়েছে। এবং বাভেরিয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম।

বাভেরিয়া রাইন ও দানিউব নদীর অববাহিকা। রাইন এই প্রদেশকে পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত করেছে। প্রদেশের এক-তৃতীয়াংশ জমিকে সুজলা করে তুলেছে, বাকি দুই-তৃতীয়ংশকে উর্বর করেছে দানিউব।

গৌর থামতেই শঙ্কর যোগ করে—আগেই বলেছি দানিউব এই প্রদেশের উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিতা। বাভেরিয়ায় তার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭০ মাইল। উল্মের কাছে সে বাভেরিয়ায় প্রবেশ করে পাসাউ (Passau) নামে একটা জায়গা দিয়ে অস্ট্রিয়ায় চলে গিয়েছে।…

—হ্যাঁ। আইনস্টাইনের জন্মভূমি উল্ম্‌। নিজের অলক্ষেই কথাটা বেরিয়ে যায় আমার মুখ থেকে।

আর তাতেই বোধকরি কথাটা মনে পড়ে যায় গৌরের। সে বলে ওঠে—তখন কথাটা বলা হয় নি তোমাকে।

—কি কথা? আমি বুঝতে পারি না ওর কথা।

সে বলে—কমরেড ভি. আই. লেনিন কিছুদিন বাস করেছেন ম্যুনিক শহরে।

—সত্যি! জয়া জিজ্ঞেস করে।

—হ্যাঁ। কমরেড লেনিন ১৯০০ থেকে ১৯০২ সাল, তার মানে দু-বছরের কিছু বেশি সময় ম্যুনিকে বাস করেছেন। তিনি 'Iskra' নামে একটি সংবাদপত্র সম্পাদনা করতেন। এবং তার পরেও লেনিনের সঙ্গে বাভেরিয়ার সম্পর্ক ঘুচে যায় নি। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে তিনি ম্যুনিক শহরেই বাভেরিয়ান সোভিয়েত রিপাবলিক নামে এক সামরিক সরকার গঠন করেছিলেন। অর্থাৎ কার্ল মার্কসের জন্মভূমি জর্মনীর ম্যুনশেন শহর রাশিয়ার বিপ্লবে প্রকাশ্য সহায়তা করেছে।

—হাঁ, কি যেন বলছিলাম? গৌর থামতেই শঙ্কর প্রশ্ন করে বসল।

আমি উত্তর দিই—বাভেরিয়ার কথা।

—হ্যাঁ। বলার মতো আর সামান্য কিছু কথাই জানা আছে আমার। তাই বলছি।

—বেশ বলো।

শঙ্কর শুরু করে—বনময় পাহাড়ী প্রকৃতি হলেও বাভেরিয়া খনিজ সম্পদে মোটেই সমৃদ্ধ নয়। বাভেরিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণ যেমন কল-কারখানা, তেমনি কৃষি সম্পদ ও কুটির শিল্প। কৃষি সম্পদের কথা আগেই বলেছি। প্রদেশের এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী কৃষি-খামারে কাজ করেন। এবারে বাভেরিয়ার কুটির-শিল্পের কথা বলছি।

ম্যুন্শেন নগরীর দক্ষিণে এই সুবিশাল পার্বত্য অঞ্চলে বিশ্বের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এইসব উৎপাদিতের মধ্যে কাঠের জিনিসই বেশি। তাদের গায়ে অপরূপ খোদাইয়ের কাজ। হাতে তৈরি কাপড়ের ওপরে হাতে ছাপা টেবল-ক্লথ, বিছানার চাদর ও পর্দা প্রভৃতিও সংগ্রহ করার মতো। তবে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত বাভেরিয়ান মিউজিক বক্স। ছোট একটা সুদৃশ্য কাঠের বাক্স। তার গায়ে রূপকথার কাহিনী খোদিত। বোতাম টিপলে কোন জনপ্রিয় ঘুমপাড়ানী গানের সুর বাজতে থাকে।

এই অঞ্চলের কয়েকটি পরিবার পুরুষানুক্রমে মোম তৈরি করে চলেছেন। মোমগুলির গায়ে নানা রকমের খোদাই কাজ করা আর রঙীন ছবি আঁকা। গির্জা কিম্বা সমাধিস্থলে পবিত্র প্রদীপ রূপে ব্যবহার করা হয় এই মোমবাতি। তাই তৈরি করার কিছু বিশেষ নিয়ম আছে। এবং কেবল মেয়েরাই এগুলি তৈরি করতে পারেন।

বাভেরিয়ার কুটির-শিল্পজাত চামড়ার জিনিসপত্রেরও খুবই সুনাম। নানা রকমের কারুকার্যখচিত ও রঙীন লেডিজ হ্যাণ্ডব্যাগ, জ্যাকেট ও অন্যান্য চামড়ার পোশাক।

থামল শঙ্কর। আমি বাইরে তাকাই। আল্প্স অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। এখন তার গায়ে গাছপালা ও বরফ। বাড়ি-ঘর আর পথগুলি পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। আমি আলপ্সকে দেখতে থাকি।

হঠাৎ বৃষ্টি নামল। গৌর তাড়াতাড়ি গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে দেয়। ১৪০ থেকে ১০০ কিলোমিটার।

বর্ষণ মুখর আল্প্স আমাদের স্বাগত জানায়। আধো আলো আধো ছায়ায় আমরা আল্পস্ পর্বতমালায় আরোহণ করছি।

কিন্তু আল্প্স আর হিমালয়ের দূরত্ব যাই হোক, প্রকৃতিগত পার্থক্য সামান্যই। আর তাই তার আবহাওয়াও হিমালয়ের মতই অস্থির। অতএব অকস্মাৎ বৃষ্টি বন্ধ হল। রোদ উঠল। আল্প্সকে

এখন আরও সুন্দর লাগছে। মনে হচ্ছে 'সাগরজলে সিনান করি সজল এলো চুলে' বসে আছে 'উপল-উপকূলে।'

আগেই বলেছি পাহাড়ী প্রকৃতি সুন্দরী কিশোরীর মতো সদা-চঞ্চলা। তাই আবার বৃষ্টি। এবং কিছুক্ষণ পরে রোদ। মেঘ আর সূর্যের খেলা চলেছে। সেই খেলা দেখতে দেখতে আমরা গার্মিশের পথে চলেছি এগিয়ে।

সহসা শঙ্কর বলে ওঠে—এটা তেইশ নম্বর জাতীয় সড়ক। ম্যুন্‌-শেন থেকে যে রাস্তা ধরেছিলাম, সেটার নম্বর ছিল দুই।

একবার থামে শঙ্কর। তারপরে বাঁদিকে খানিকটা দূরে একটি তুষারাবৃত পর্বতচূড়া দেখিয়ে বলে—অক্রোটেন-খা (Okrotten-K)। ২১৮৬ মিটার উঁচু।

হাসি পায় আমার ! দু-হাজার মিটার উঁচু চূড়ায় বরফ। আমাদের দেশে এই উচ্চতায় শৈলশহর হয়ে থাকে। তাহলেও দেখি। দেখতে ভাল লাগে আমার। অনেক দিন হিমালয়ে যাই না, বরফ দেখি না।

একটা পাহাড়ী গ্রাম। নাম ফ্রাখাণ্ট (Frchant)। উচ্চতা ১৭৮০ মিটার। যেমন সুন্দর, তেমনি উন্নত। রেলপথ রয়েছে। আর মোটরপথের কথা না বলাই ভাল। চোখ বুজে থাকলে বোঝা যায় না যে এত জোরে গাড়ি চলেছে।

গৌর বলে—গার্মিশ এসে গেল বলে।

বুকটা কেঁপে ওঠে আমার। তাহলে তো যাত্রাপথের প্রান্তে পৌঁছে গেলাম। আনন্দ আর উত্তেজনার অবসান আসন্ন। এর পরে শুরু হবে বিদায়ের পালা।

না, জর্মনীর কাছ থেকে বিদায় নয়। শঙ্করদের সঙ্গে আমিও আজ পূর্ব-জর্মনীর ভেতর দিয়ে পশ্চিম-বার্লিন রওনা হব। কাল সকালে পৌঁছব সেখানে। তারপরে সুইডেনে যাবো। কিন্তু এখন বার্লিনে থাকব কয়েকদিন। কাজেই জর্মনীর কাছ থেকে বিদায় নিতে কিছু দেরি আছে। আজ আমি বিদায় নেব বাভেরিয়ার কাছ থেকে। আমার ছেলেবেলার সেই কাঠ-পেন্সিলের দেশ বাভেরিয়া।

আর তাই বোধকরি বুকটা এমন কেঁপে উঠল।

শঙ্করের কথায় বিদায়ের ভাবনা দূর হয়। সে বলে—শঙ্কুদার সঙ্গে গার্মিশের একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক, কি বলেন গৌরদা?

গৌর মাথা নাড়ে। আর আমি ভাবি, তাই ভাল। আরও কিছুক্ষণ বাভেরিয়ার কথা দিয়ে বাভেরিয়ার বিরহ ভুলে থাকা যাক।

শঙ্কর শুরু করে—শৈলশহর গার্মিশ বোধহয় বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ Winter-sports Centre বা শীতকালীন খেলাধূলার কেন্দ্র। ১৯৩৬ সালে এখানেই 'উইণ্টার-ওলিম্পিক' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আপনি সেই ওলিম্পিক স্টেডিয়াম দেখতে পারেন। সেখানকার গ্র্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ডে তিরিশ হাজার দর্শক বসে খেলা দেখতে পারেন।

পাশেই রয়েছে আরেকটা ছোট স্টেডিয়াম। সেখানে আছে এক একর জায়গা জুড়ে কঠিন বরফের স্থায়ী তুষারক্ষেত্র। সারা বছর খেলাধূলা হয়, নানা জিমনাস্টিক, আইস-স্কেটিং ও আইস-হকি প্রভৃতি। সাধারণত রাতেই সেখানে খেলার আসর বসে। কারণ নানা রঙের জোরালো আলোগুলো তুষারক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়ে রাতকে দিনের চেয়ে বেশি আলোকিত আর রমণীয় করে তোলে। এই স্টেডিয়ামের গ্র্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ডে বারো হাজার দর্শক বসতে পারেন।

আরও একটা তুষারাবৃত 'স্কেটিং-রিঙ্ক্' রয়েছে গার্মিশে। সেখানে ছ' হাজার দর্শকাসন রয়েছে।

একবার থামে শঙ্কর। তারপরে আবার বলতে থাকে—সত্যি বলতে কি 'স্কী' করার মনোরম পরিবেশ আর চমৎকার ব্যবস্থার জন্যই গার্মিশ আজ বিশ্ববিখ্যাত। নইলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে গার্মিশ ছিল একটি অখ্যাত পাহাড়ী গ্রাম। এবং গার্মিশের এই অভূতপূর্ব উন্নতির মূলে কিন্তু বিশ্বইতিহাসের সেই অভিশপ্ত মানুষটি। ১৯৩৬ সালে হের হিটলার এখানে উইণ্টার-ওলিম্পিকের আসর বসিয়ে গার্মিশের এই উন্নতির পথ বেঁধে দিয়েছেন।

কিন্তু যাক্ গে হিটলারের কথা, গার্মিশের কথায় ফিরে আসা যাক। ১৯৩৬ সালের আগে খুব কম সংখ্যক পর্যটকই এখানে

আসতেন। যাঁরা আসতেন, তাঁদের অধিকাংশই পর্বতারোহী। সেই পাহাড়-পাগল মানুষগুলির কেউ কেউ গার্মিশ থেকে জর্মন-আল্প্-সের উচ্চতম শৃঙ্গ ৯৭৮২ ফুট উঁচু সুগিস্পিৎসে শিখরে আরোহণ করতে চাইতেন। সবাই যে পারতেন তা নয়, তবে যেসব দুঃসাহসী সফলকাম হতেন, তাঁদের কম করেও দশঘণ্টা ক্লান্তিকর পর্বতারোহণ করতে হত। কিন্তু তখন এ অঞ্চলে একটা প্রবাদ ছিল যে, কেবল উন্মাদরাই সুগিস্পিৎসে শিখরে আরোহণ করে।

—আর এখন? গৌর সহাস্যে প্রশ্ন করে।

শঙ্করও হাসতে হাসতেই উত্তর দেয়—এখন গার্মিশের অনতিদূরে গ্রায়নাউ (Grinau) থেকে কেব্‌ল-কার বা রোপওয়ে চড়ে কয়েক-মিনিটে পৌঁছন যায় ঐ শিখরে।

—আমি যাবো বাবা!

—যাবে বৈকি! নিশ্চয়ই যাবে। আমরা সবাই যাবো। শঙ্কর পুত্রকে আশ্বস্ত করে।

অমৃত আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে।

আমারও তাই ইচ্ছে করছে। কিন্তু বয়সের কথা বিবেচনা করে সে ইচ্ছে দমন করতে হয়। আমি শুধু মনে মনে ভাবি আল্প্‌সকে এঁরা কিভাবে আধুনিক করে তুলেছেন, কেব্‌ল-কার চড়ে একটা দেশের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা যাচ্ছে। সেখানে পৌঁছে কাচে ঘেরা রেস্তরাঁয় বসে গরম কফির কাপ হাতে নিয়ে একই সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া আর জর্মনীকে দেখা যায়। আমরা কি হিমালয়ের কিছু নিচু শিখর কিম্বা উঁচু উপত্যকায় এইরকম কেব্‌ল-কারে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে পারি না? পারলে কিন্তু বিদেশী পর্যটকদের ভিড় জমে যাবে। কারণ হিমালয়ের সীমাহীন সৌন্দর্যের কাছে আল্প্‌স নিতান্তই দরিদ্র।

কিন্তু এসব ভাবনা থাক। কারণ বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? আমাদের দেশে যে এখন পর্যন্ত কোন খনরাড্ আডেনাউর জন্মগ্রহণ করেন নি। তার চেয়ে বরং জিজ্ঞেস করা যাক—গার্মিশ

শহরটি কি স্যুগিস্পিৎসে শিখরের পাদদেশে অবস্থিত ?

—হ্যাঁ। গৌর উত্তর দেয়।—তবে গার্মিশের উপকণ্ঠে আইবজে (Eibsee) হ্রদের অনতিদূরে গ্রায়নাউ হচ্ছে শিখরের নিকটতম সমতল। তাই কেব্‌লকার স্টেশন সেখানেই।

শঙ্কর আবার শুরু করে—গার্মিশ অঞ্চলের পুরো নাম গার্মিশ—পার্টেনকির্শেন্ (Partenkirchen)। জর্মন-আল্প্‌সের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত সমতল। এখানে আপনি অসংখ্য ঝর্ণা ও একাধিক হ্রদ দেখতে পাবেন। তাই বলে স্যুগিস্পিৎসে এ অঞ্চলের একমাত্র পর্বতশিখর নয়। আরও কয়েকটি সুন্দর শৃঙ্গ রয়েছে। যেমন পুবদিকে ৫৮৪০ ফুট উঁচু ভাঙ্ক (Wank), দক্ষিণে ৫৪২০ ফুট ক্রেনৎসেক (Krenzeck)।

—স্যুগিস্পিৎসে কোন্ দিকে ?

—দক্ষিণ-পূর্বে. অস্ট্রিয়া এবং সুইস সীমান্তে।

—আচ্ছা, গার্মিশের এই জনপ্রিয়তার মূলে কি শুধুই অবস্থান ?

—না। আবহাওয়াও অনেকখানি কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। গ্রীষ্মকালে এখানে চমৎকার রোদ, শীতকালেও আকাশ বেশ পরিস্কার থাকে। তাই গার্মিশ শীতকালে যেমন স্কী-করার আদর্শক্ষেত্র তেমনি গ্রীষ্মকালে একটি রমণীয় স্বাস্থ্য নিবাস।

অবশেষে সেই স্বাস্থ্যাবাসে পৌঁছন গেল। শুধু স্বাস্থ্যাবাস নয় স্বপ্নপুরী বলা যেতে পারে। যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তেমনি সুন্দর সুন্দর বাংলো আর ঢেউ খেলানো পথ।

কার-পার্কে গাড়ি রেখে আমরা পথচলা শুরু করি। পথের পাশে কোথাও গাছ-পালা, কোথাও গভীর খাদ কিম্বা প্রশস্ত ফাটল। নিস্তব্ধ প্রকৃতিকে ঝর্ণার কলতান সর্বদা সজাগ করে রেখেছে। তারা নূপুরকলিত ছন্দে চারিদিকে নেচে চলেছে। বাংলোগুলিও কিছু কম আকর্ষণীয় নয়। কাঠ ও কাচের দেওয়াল আর জানলা-দরজা।

প্রতি বাড়িতে ঝুলন্ত ব্যালকনী এবং বাগান, ফুলও ফলের বাগান। তাদের পেছনে আল্প্‌সের হাতছানি।

কাছের পাহাড়গুলি সবুজ, দূরের পাহাড়গুলি ধূসর। একটার পরে একটা পাহাড়ের ঢেউ প্রসারিত হয়ে আকাশে মিশেছে। সেখানে নীলের গলায় সাদা বরফের মালা। কখনও মনে হচ্ছে দার্জিলিঙের 'ম্যাল' দিয়ে হেঁটে চলেছি, কখনও মনে হচ্ছে গুলমার্গে এসেছি।

কেবল স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য নয়, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও স্বনাম-ধন্য এই শৈলশহর। এখানকার লোক-উৎসব অতিশয় ঐতিহ্য-মণ্ডিত। গার্মিশের কাব্যময় পরিবেশ দর্শন করে এবং গার্মিশ-বাসীদের কবিমনের পরিচয় পেয়ে প্রখ্যাত সুরকার রিশার্ড স্ট্রাউস (Richard Strauss) এখানেই তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত করেন। ১৯৪৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর গার্মিশের মাটিতেই তিনি মহাপ্রয়াণ লাভ করেছেন।

আমরা সৌন্দর্যের পূজারী নই, ব্যস্ত পর্যটক। সুতরাং বেশিক্ষণ পায়চারি করার অবকাশ নেই। একটা রেস্তরাঁয় লাঞ্চ সেরে নিয়ে আবার গাড়িতে উঠে বসি। গার্মিশের আঁকাবাঁকা উঁচু নিচু পথ পেরিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলে।

একটু বাদে একটা পুরনো বাড়ির সামনে গাড়ি থামায় গৌর। বলে—এটা 'ওল্ড সেন্ট মার্টিন চার্চ'। ১২৮০ সালে নির্মিত। গির্জাটির বহু অংশ এখনও অক্ষত রয়েছে। তবে এখন আর এখানে উপাসনা হয় না। ১৭৩০ সালে নতুন 'সেণ্ট মার্টিন প্যারিশ চার্চ' নির্মিত হয়েছে।

—তার মানে গার্মিশ অন্তত সাত শ' বছরের প্রাচীন জনপদ?

—নিশ্চয়ই।

আমরা আরেকটি গির্জা দর্শন করি। নাম 'সেন্ট্‌ আন্টোন (Anton) চার্চ'। এটি অষ্টাদশ শতকের গির্জা। ১৭০৪ সালে নির্মিত। তবে গির্জাটি যেরকম ঝক্‌ঝকে তাতে মনে হচ্ছে কিছুকাল আগে সংস্কার সাধন করা হয়েছে।

তারপরে আমরা আসি উনবিংশ শতকে নির্মিত রাজা দ্বিতীয় লুডভিগের (১৮৬৪-৮৬) মৃগয়া নিবাসে। পাহাড়ের কোলে অপরূপ অবস্থান এই বিশ্রাম নিকেতনের। এখন এটি যাদুঘর।

আগেই শুনেছিলাম, লৌকিক নাটকের জন্য গার্মিশের বেশ নাম ডাক আছে। এখানে রয়েছে কয়েকটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ। তারই দুটি নাট্যশালা দেখে আমরা গার্মিশ ভ্রমণ শেষ করি।

নাট্যশালাদুটির নাম ক্লাইন্ কুর্‌ঠেয়াঠের (Kleine Kurtheather) এবং ৎসুম্ রাজেন্ (Zum Rasen)। প্রথমটিতে সারা বছর ধরে সব রকমের নাটক মঞ্চস্থ হয় আর দ্বিতীয়টিতে শুধুই লোক-নাটক।

শঙ্কর আরেকটা খবর দেয়। বলে—এখানে কনগ্রেজ্‌হাউস (Kongreshaus) নামে একটি নাট্যসংস্থা আছে। তাঁরা সারা দেশ ঘুরে ঘুরে এ অঞ্চলের লোক-নাটক মঞ্চস্থ করেন।

—মানে কলকাতার যাত্রাপার্টি আর কি! জয়া মন্তব্য করে।

গৌর বলে—এখানে আরেকটি প্যারিশ চার্চ রয়েছে। কিন্তু বেলা তিনটে বেজে গিয়েছে। আমাকে ম্যুনিক ফিরে বার্লিনের ফ্লাইট ধরতে হবে। আর দেরি করা উচিত নয়। তাছাড়া এখন গ্রায়নাউ যেতে হবে।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। ঘন বনে ছাওয়া আঁকাবাঁকা মসৃণ পাহাড়ী পথ। আমরা আল্‌প্‌সের অন্তরলোকে প্রবেশ করছি। আরও ওপরে উঠছি।

কেবল এই মোটর পথ নয়, পাশে পাশে রেলপথ রয়েছে। অনেকটা দার্জিলিঙের মত। অনেকটা কারণ রেলপথটি কিছু কম বৈচিত্র্যময়। এবং অতো ছোটও নয়। কিন্তু রেলপথ এবং রেল-গাড়ি কোনটাই দার্জিলিঙের মতো অবহেলিত তো নয়ই বরং সযত্নে রক্ষিত ও পরিচালিত। তবে এটাও ছোটগাড়ি, মানে কালকা—সিমলা রেলগাড়ির মতো। চার বগির একখানি গাড়ি সবেগে নিচে নামছে। যাত্রীরা হাত দেখিয়ে আমাদের অভিনন্দিত করছে। আমরাও হাত দেখাই।

সুবিশাল ও সুন্দর একটি হ্রদের তীরে রমণীয় জনপদ আইবজে। হ্রদের তীরে বাড়ি-ঘর আর দোকানপাটের মাঝে চমৎকার একটি বেস্তরাঁ। গৌর বলে—ফেরার পথে এখানে এক কাপ করে কফি পান করা যাবে।

—ফেরার পথে মানে? এখনও কি পর্বতারোহণ শেষ হয় নি আমাদের?

—না। আবও খানিকটা এগিয়ে গ্রায়নাউ। সেখান থেকে কেব্‌ল-কার প্রায় সোজা সুগিস্পিৎসে শিখরে উঠেছে।

তবু গাড়ি থামায় গৌব। হ্রদের ধারে, বাড়ি-ঘর ছাড়িয়ে পাহাড়ের পাশে। আমরা দেখি—হ্রদটি আকারে বেশ বড়। তার প্রায তিনদিকে সবুজ পাহাড় কিম্বা ঘন সবুজ বন অথবা সমতল। আব একদিকে সুগিস্পিৎসে শিখর। হ্রদের জল থেকে সোজা ওপরে উঠে গিয়েছে। বুকভরা টলটলে জল। সেই জলে জলকেলি করছেন পর্যটকরা। কেউ স্পীড-বোট চালাচ্ছেন, কেউ ওয়াটারস্কুটার। কেউ ওয়াটার-স্কি করছেন. কেউ বা প্যারা-সেলিং। আবার সাঁতার কাটছেন কয়েকজন।

জয়া বলে—জল কিন্তু খুবই ঠাণ্ডা।

গৌর গাড়ি ছাড়ে।

শঙ্কর বলে—কেবল 'ওয়াটাব স্পোর্টস' নয়, এখানে কয়েকটি শ্বাস রোধকারী ট্রেকিং বা পদযাত্রা রয়েছে। তার মধ্যে প্রথম হল ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল পায়ে-চলা পথে গার্মিশ থেকে এখানে আসা। পথ চলতে চলতে আপনি আল্প্‌সের অন্তরলোকের অপরূপ রূপ দর্শন করতে পারবেন। দেখতে পাবেন দুটি পাতাল-স্পর্শী খাদ আর একটি মুক্তোর মতো স্বচ্ছ হ্রদ, নাম রিসেরজে (Riessersе)। তার গা থেকে সুগিস্পিৎসে পর্বতের একটা খাড়া দেওয়াল সোজা ওপরে উঠে গিয়েছে।

অন্যদিনের চেয়ে জয়া আজ কম কথা বলছে। কিন্তু আজ তো ওর খুশি হবার কথা। আজই আমাদের যাযাবর জীবন শেষ হবে।

আগামীকাল সকাল থেকেই গৃহকর্ত্রী ঘরের দখল পাবে। তবু সে নীরব কেন? সেও কি আমার মতো বাভেরিয়ায় বিয়োগব্যথায় বিচলিত বোধ করছে?

যে কারণেই জয়া এতক্ষণ নীরবতা পালন করে থাক, এখন কিন্তু কথা বলে সে। বলে—আমরা গাড়ি করে আইবজে এলাম, গাড়ি করেই গার্মিশ ফিরে যাবো। কিন্তু ইচ্ছে করলে আমরা গাড়িটা গার্মিশে রেখে কেব্‌ল-কার কিম্বা রেলে করেও আইবজে আসতে পারতাম। সাধারণত পর্যটকরা তাই করেন। তবে যাঁরা রেলে আসেন তাঁরা কেব্‌ল-কারে ফিরে যান, আর যারা কেবল-কারে আসেন তাঁরা ফিরে যান রেলে চড়ে।

—তাতে লাভ?

—দুটি পথের স্বর্গীয় সৌন্দর্য উপভোগ করা।

—তার মানে আমরা সে সৌন্দর্য দর্শন করতে পারলাম না।

জয়া মাথা নাড়ে। তারপরে বোধকরি আমাকে সান্ত্বনা দেয় —কিন্তু কেবল-কারে করে স্যুগিস্পিৎসে শিখরে আরোহণ করতে পারলে আপনার সে দুঃখ দূর হয়ে যাবে।

দুঃখহরণ সহায় না হলে সংসারের কোন দুঃখ দূর হয় না। যে কোন কারণেই হোক শেষ মুহূর্তে তিনি আজ আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। গ্রায়নাউ পৌঁছে কেব্‌ল-কার স্টেশনে এসেই সেকথা বুঝতে পারলাম।

আমাদের ভাগ্য মন্দ। আকাশে বসে আল্‌প্‌সের অপরূপ রূপ দেখা হল না। দেখা হল না অস্ট্রিয়া আর সুইজারল্যাণ্ড। কারণ একটু আগে যে গাড়িটা চলে গেল, সেটাই আজকের শেষ গাড়ি।

—কিন্তু এখন তো গ্রীষ্মকাল, বিকেল সাতটায় শেষ গাড়ি ছাড়ার কথা। জয়া প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

কর্মচারীটি সবিনয়ে জানান—মাদাম, আজ শনিবার।

জয়া কোন কথা বলতে পারে না। কিই বা বলবে? বেড়াতে বেরুলে যে কারও দিন-তারিখ ঠিক থাকে না।

মনটা খারাপ হয়ে যায়। এ জীবনে সুগিস্পিৎসে শিখরে আরোহণ করা হল না আমার।

মন খারাপ হয়েছে সবারই। কিন্তু সেকথা কেবল প্রকাশ করে অমৃত। সে বলে—বাবা, বলো না ওঁদের। ওঁরা আরেকটা গাড়ি যেতে দিন. মাত্র একটা। একটা গাড়িতেই আমরা সবাই ওপরে চলে যাবো। আমি তোমার কোলে বসব।

না। ছেলের আবদার রক্ষা করার কোন চেষ্টাই করে না শঙ্কর। কারণ দীর্ঘকাল এদেশে বাস করে সে জেনেছে, এখানে নিয়মের ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই।

অতএব ঘোল দিয়ে দুধের স্বাদ মেটাতে হয়। এখান থেকেই আমরা আল্পসের রূপ দর্শন করি। পায়চারি করতে করতে হিমালয়ের হিমেল পরশ অনুভব করি। ভাবি, ধন্য আমার জীবন। হিমালয়ের মতো আল্পসের শীতল করস্পর্শে আজ তা আবার পবিত্র হল, পূর্ণ হল, মধুর হল।

যা দেখা হল না, তার জন্য আপসোস না করে, যা দেখে গেলাম তাব আনন্দেই হৃদয়-মন পূর্ণ করে তোলা যাক্। চাওয়ার তো শেষ নেই এ সংসারে! তাই চাওয়ার কথা না ভেবে পাবার আনন্দেই বিহ্বল হয়ে বাভেরিয়ার কাছ থেকে নেওয়া যাক বিদায়।

শৈশবে সেই সুদূর পূর্ববঙ্গের এক মুদি দোকানে পেন্সিল কিনে যে বাভেরিয়ার নাম প্রথম জেনেছিলাম, প্রৌঢত্বের প্রায় প্রান্তে পৌঁছে আজ সত্যি সত্যি সেই বাভেরিয়া দর্শন করা হল। আমার মতো সৌভাগ্য নিয়ে ক'জন জন্মায় এ সংসারে?

করুণাময় জীবনদেবতাকে পুনবায় প্রণাম জানিয়ে সবার সঙ্গে আমিও এসে গাড়িতে উঠি।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী